বুভুক্ষা

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

প্রভা প্রকাশনী
ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া * নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর * উত্তর ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ ঃ
৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ ঃ
কুমারঅজিত

অক্ষর বিন্যাস ঃ
গঙ্গা মুদ্রণ
৫৪/১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

মুদ্রণ ঃ
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১এ, গড়পার রোড, কলকাতা-৪

উৎসর্গ

প্রয়াত ফণীভূষণ মণ্ডল, প্রয়াত বীরেশ্বর লাহিড়ী (নেড়ুবাবু)

প্রথম পর্ব

এক

একটু ইতস্ততঃ করে নিভা রেশনের দোকানের সামনে লাইনে দাঁড়াল। লাইনে দাঁড়াতে তার একটুও ভাল লাগে না। হরেক রকম লোক দাঁড়ায় লাইনে, যুবা, বৃদ্ধ, শিশু, মধ্যবিত্ত গরীব, মাঝে মাঝে মেয়েরাও দাঁড়ায়। কিন্তু নিভার মতো সুন্দর যুবতীর অস্বস্তি কম নয়। পুরুষগুলো যে বয়সেরই হোক না কেন, যেন তাকে গিলে খেতে চায়। ঠেলাঠেলিতে কেউ কেউ ইচ্ছে করে গায়ে পড়ে। উষ্ণ নিঃশ্বাস পিঠের খোলা অংশটায় জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সামনের লোকটা যেন অন্যমনস্ক হয়ে পিছিয়ে আসে, যুবতীর নরম বুকে ঠেস দিয়ে ক্ষণিক সুখ ভোগ করে নিতে চায়। গা ঘিন ঘিন করে নিভার। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। প্রথম প্রথম সে আপত্তি করত। তাতে লাঞ্ছনা বাড়ত বই কমত না। 'এতই যদি দেমাক তো ঘোমটা দিয়ে ঘরে বসে থাক না।' কথা কাটাকাটি বাড়লে দুটো ফচ্‌কে ছোঁড়া শিস দিত, কেউ আবার দুটো অশ্লীল কথা ছুঁড়ে দিত, যা শুনলে কানে আঙুল দিতে হ'ত। কেউ আবার নকল সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত, ঘামের দুর্গন্ধে বমি উঠে আসত। লালসার তরঙ্গ যৌবনপুষ্ট দেহতটে আছাড় খেত। দেহটাকে সঙ্কুচিত করেও নিভা নিষ্কৃতি পেত না। তার মনে হ'ত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়! কিন্তু পরক্ষণে আবার হয়ত সামনের লোকটা ভদ্রঘরের নিষ্পাপ যুবতীর নিষ্পাপ বুকের উপর চাপ দেবার লোভ সামলাতে পারত না। তবু মাঝে মাঝে রেশনের লাইনে দাঁড়াতে হ'ত। সেদিনও সে লাইনে দাঁড়াল। বাড়িতে তার বাবাই একমাত্র পুরুষমানুষ। মাঝে মাঝে তার মাথার গোলমাল হয়। সেদিন তাঁর পাগলামিটা বেড়েছিল, নিভার মা তাঁকে সামলাতে ব্যস্ত। তাই না চাইলেও নিভাকে লাইনে আবার দাঁড়াতে হল। ঘরে চাল বাড়ন্ত।

লাইনটা বেশ লম্বাই হয়েছিল। গলির মুখে রেশনের দোকান। অনেক নিয়ম-কানুন রেশনের। দোকানদারও তেমন চটপটে নয়। কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে কে জানে? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেজাজও ঠিক থাকে না। ঐ ত নন্দ নন্দী খিঁচিয়ে উঠলো। 'আঃ, দাঁড়াও না, অত ঠেলাঠেলি করছ কেন?'

পিছনের যুবকটি তেরিয়া হয়ে জবাব দিল, 'আমি ঠেলছি? পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে যে।'

নন্দ ব্যঙ্গ করে বলল, 'ধাক্কা দিচ্ছে যে! মাথার উপর পা দিয়ে চলবে? একটু ভদ্রতাও শেখ নি?'

যুবকটি চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখুন মশায়, মুখ সামলে কথা বলবেন।'

'কেন, লবাব খাঞ্জা খাঁ এলে কিনা, যে ভয় করে চলব। এ্যাঁ?'

'নেহাত বয়সে বড়, নইলে—'

'কি?'

'মেরে আকাশ পিদ্দিম করে ঝুলিয়ে দিতুম।'

'কি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমি নন্দদুলাল নন্দী। ছোটলোকীর আর জায়গা পাস নি?'

এবার সামনের লোকের গায়ে 'ছোটলোক' কথাটা যেন চিড়চিড় করে উঠল। সে গর্জে উঠল, 'আমরা ছোটনোক! ভদ্দরনোক তো নাইনে দাঁড়াও কেন? চাকর পাঠাতে পার না? বেশী গোলমাল করলে নাইন থেকে বার করে দেব।'

'নন্দ থামবার পাত্র নয়, সেও চেঁচাল, ইস্। তোর বাপের লাইন?'

'কি বাপ তোলা?' সামনের লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে মারমুখী হয়ে তেড়ে উঠল।

কে একজন বলল, 'নারদ, নারদ।'

অন্যজন বলল, 'কেন গোলমাল করছেন, দাদু চলুন, লাইন আগে বাড়ছে।'

কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে যাওয়া গেল। গরম একটু কমল, আবার মেজাজ দপ করে কখন ফেটে পড়ে কে জানে?

নিভাদের বাড়িওয়ালা নন্দদুলাল নন্দী। শহরে খানদুয়েক বাড়ির মালিক, বড়বাজারে স্টেশনারী দোকান আছে। তবু তার লাইনে দাঁড়ান চাই, নিজের হাতে বাজার করা চাই। হাড়-কঞ্জুস লোকটা।

লাইন আবার একটু এগুল।

একটা ভিখারী পরিবার, স্বামী স্ত্রী আর আট দশ বছরের ছোট ছেলে, লাইনের কাছে ভিক্ষে চাইতে এল। স্ত্রীলোকটি ময়লা ছেঁড়া কাপড়টায় ঘোমটা টেনে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করছিল, ছেলেটার হাত-পা কাঠির মতো, পেট ফোলা। লোকটার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পাঁজরাগুলো গোনা যায়। এদের ভিক্ষে চাইতে যেন কিছু সংকোচ। এরা পেশাদার ভিখারী নয়।

লোকটা অস্ফুট স্বরে বলল, 'বাবা কিছু খাতি দেও। আজ তিন দিন প্যাটে কিছু পড়েনি, বাবা, বৌ বেটা তিন দিন অনাহারে, বাবা।'

'যা যা, দিক করিস নে।' কে একজন খিঁচিয়ে উঠল।

লোকটা বলল, 'পয়সা চাইনে বাবা, এক মুঠো চাল, এক টুকরো রুটি।'

এবার নন্দ ঝংকার দিল, 'ও সব হবে না, ও সব হবে না। দেখছিস না নিজেরাই খেতে পাচ্ছি না, ঘণ্টা ভোর লাইনে দাঁড়িয়ে?'

লোকটা অবুঝের মতো বলল. 'বাবা কিচ্ছু খাতি দেও। তিন দিন প্যাটে কিছু পড়েনি। সোনার দ্যাশ শ্মশান হইয়ে গেল। কোথাও একমুঠো অন্ন জোটে না। গাঁ থেকে এনু শহরে। বড় বড় কোঠা বাড়ি। এখানেও কেউ খাতি দেয় না।'

নন্দর গায়ে লাগল কথাটা। যেন তাকেই হুল ফুটিয়ে কথাটা বলা হয়েছিল। সে মুখ ঝামটা দিল, 'হাঁ, হাঁ বড় কোঠাবাড়িই দেখেছিস্ ব্যাটা। ইট কাঠ চিবিয়ে খাবি? চাল, চাল চাই, চাল নেই।'

সামনের কে একজন বলল, তোমার তো দু-দু'খানা বাড়ি, নন্দদা। দাও না লোকটাকে দু'চার পয়সা।'

'বললেই হল।' নন্দ খিঁচিয়ে উঠল, 'পয়সা জোটে কোত্থেকে, এ্যাঁ? হতভাগা ভাড়াটেগুলো কি আজকাল এক পয়সা ভাড়া গোঁজে? বললেই চোখ রাঙিয়ে আইন দেখায়. এদিকে বাড়িওয়ালা ট্যাকস না দিলে শালার চোরপোরেশন ঘটি বাটি ক্রোক করে।'

লোকটা আবার ভিক্ষে চাইতে লাগল। নিভার কষ্ট হল পরিবারটিকে দেখে। আহা, এরা নিভাদের চেয়েও আরও দুঃখী। নিভা ডাকল, 'এই, শোন।'

লোকটা উৎসুক হয়ে নিভার কাছে এল. নিভা আঁচলের গেরো খুলে কটা পয়সা লোকটার হাতে দিল। লোকটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল, 'বেঁচে থাক মা, সুখে থাক, রাজরানী হও।'

হাসি পেল নিভার। 'রাজরানী হও!' হঠাৎ খেয়াল হল সে আঁচলের সব কটা পয়সা দিয়ে বসে আছে। কটাই বা পয়সা! ওতে আজকের রেশন তোলা যেত না। দোকানী বলেছিল, আর ধার দেবে না। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবেই। ঘরে চাল বাড়ন্ত। 'রাজরানী হও!' হাসি পেল নিভার।

আর একজনের কাছে হাত পাততেই লোকটা বকুনি খেল, 'যা যা, ঐ তো ভিক্ষে পেয়েছিস, রানী ভবানী আমাদের হয়ে দানছত্তর খুলে ভিক্ষে দিল।'

'যা বলছি,' একজন খেঁকিয়ে উঠল. 'আর বিরক্ত করলে তোদের পুলিসে দেব. জেলে পাঠাব।'

'তাই দেও বাবা, তাই দেও। জেলে গেলি ত দু'মুঠো খাতি পাব। চলরে মনু, চলরে মনুর মা, অন্য কোথাও দেখি।'

তারা চলে গেল।

এতক্ষণে নিভাকে নিয়ে লাইন সচেতন হয়ে উঠল। একটি ছোকরা আধখানা ঘুরে নিভার দিকে লোলুপ দৃষ্টি হেনে বলল. বেড়ে বলেছ দাদা. রানী ভবানী।'

আরেকটি হিস হিস করে সিটি মেরে বলল. 'কি খুবসুরৎ মাল মাইরি, ঠিক যেন ফিলিম একট্রেস দেবযানী।'

এবার নন্দ নন্দী বিরক্ত হল। নিভা তারই ভাড়াটে পরেশবাবুর মেয়ে। তাকে দেখলে নন্দবাবুর নিজেরই লোভ জাগে। মনে হল তারই বাড়া ভাতে কে যেন ছাই দিতে চাচ্ছে। নন্দ রেগে বলল, 'জিভ দিয়ে নাল গড়িয়ে পড়ল যে, এ্যাঁ? ভদ্দরলোকের মেয়েদের সম্বন্ধে কি করে কথা বলতে হয় জান না? নিজেদের ঘরে মা বোন নেই?'

'তাতে আপনার কি? তখন থেকে বুড়ো কেবল ফ্যাচ ফ্যাচ করছে।'

'কি বললি? আমি বুড়ো, দেখেছিস আমার হাতের গুলি, এই বয়সে এমন রাম রদ্দা দেব যে প্যাংলা ছোঁড়া মায়ের পেটে সেঁধিয়ে যাবি।'

'খবরদার' মুখ সামলে কথা বলুন, নইলে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।'

আবার হাতাহাতির উপক্রম। একজন শান্ত করার জন্য বলল, 'আহা থামুন তো সব, দেখছেন না লাইন আর এগোচ্ছে না; বোধ হয় চাল ফুরিয়ে গেল?'

অনেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'চাল ফুরিয়ে গেল।'

'চালাকি নাকি! এর মধ্যে চাল ফুরল। আজ আমার রেশনের দিন।'

'ঐ দোকানদার ব্যাটার কারসাজি। শালা ভেতরে ভেতরে চাল সরায়, ভিজে চাল দিয়ে ওজন বাড়ায়।'

'লুঠ করব, খুন করব।'

'পুলিসে ধরবে।'

'ধরুক পুলিসে।'

একজন চাল নিয়ে আসছিল। সে বলল 'না, না, চাল ফুরোয়নি।'

'সত্যি! বাঁচালে দাদু।'

'কে বলল তবে চাল ফুরিয়েছে?'

'আমি ত বলিনি।'

'আমি ত বলিনি।'

'এখন সবাই বোবা সাজছে। ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেব অমন অলুক্ষণে কথা বললে।'

'আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে?'

'ও দাদু, এগোও না।'

'কোথায় এগোব? চুলোয়?'

'চুলোই ভাল।'

বিনয়কে দেখে নন্দবাবু আশ্বস্ত হল। বিনয় নন্দ নন্দীর আর এক ভাড়াটে। চাকরি-বাকরি করে না। কি ছাইপাঁশ লেখে কে জানে? চেহারাটা বেশ কাত্তিক-কাত্তিক। মনটাও মিষ্টি। কিন্তু ঐ এক দোষ, কিছুতেই সময়ে ভাড়া দেবে না। বিনয় রেশনের চাল তুলেছে,

থলিটাও ভারে ঝুলে পড়েছিল।

নন্দ বলল, 'এই যে বিনয় ভায়া, তোমার ত বরাত ভাল, চাল পেয়েছ। আমাদের কত দেরি?

'চাল নেই।'

'চাল নেই?'

'সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ল লাইন, চাল নেই!'

'সত্যি চাল নেই। কোথায় লরির স্ট্রাইক হয়েছে হঠাৎ, পুরো চাল আসেনি।'

'থামুন থামুন, দালালি করতে হবে না।'

'নিজে চাল পেয়েছে কি না। তাই চাল মারছে।'

'খুন করব, লুঠ করব।'

লাইন ভেঙ্গে দিয়ে দোকানের সামনে ক্রেতারা জটলা করল। চিৎকার, শোরগোল। কাঠের পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে নিভা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। বিনয়কে দেখে সে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি চাল নেই?'

বিনয় বলল, 'সত্যি নেই। দোকানীর কি দোষ? হঠাৎ কোথায় না বলে কয়ে লরি ধর্মঘট হয়েছে। কালকের সাপ্লাই আসেনি। যা ছিল, তাই আমাদের দিয়েছে।'

এতক্ষণে নন্দ নন্দী ফিরে এল, 'ব্যাটা আগে বলিসনি কেন, তাহলে এতক্ষণ ধরে জেরবার হতে হ'ত না।'

নিভা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল, 'সত্যি চাল নেই? তাহলে কি হবে? খালি হাতে বাড়ি ফিরলে বাবা আমাকেই খেয়ে ফেলবে।'

বিনয় বলল, 'দেখুন' কিছু যদি মনে না করেন ত আমার ভাগটা নিতে পারেন তাতে ত কিছুদিন চলবে।'

'না না, তা কি করে হয়?' নিভা সলজ্জকণ্ঠে বলল।

'লজ্জা করবেন না। আমি বলছি, থলিটা ধরুন।'

নন্দ নন্দী ঝংকার দিয়ে উঠল, 'ইস খুব যে লবাব হয়েছ, বিনয়! একদম দাতা কর্ণ! বলি নিজের যে হাঁড়ি চড়বে না।'

নিভা বলল, 'না, থাক তবে।'

'আপনি নন্দবাবুর কথায় কান দেবেন না। আমি একা মানুষ। দু-চার বেলা ভাত না খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। চিঁড়েমুড়ি খেয়েই চালিয়ে নেব। নিন, থলিটা ধরুন। না না, আপনার থলি নয়। আমার থলিটা নিয়ে যান পরে ফেরত দেবেন।'

নিভা অনিচ্ছাসত্ত্বেও থলিটা নিল। বলল, 'দাম?' নিভা আঁচলে খোঁজার ভান করল। শূন্য আঁচল, জানা কথা। তবু মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরিয়ে গেল, 'ঐ যাঃ পয়সা কোথায়

পড়ে গেছে দেখছি।'

'পয়সা ছিল ত?' নন্দ নন্দী বিদ্রূপ করল।

'আপনি থামুন ত নন্দবাবু।' বিনয় ধমক দিল, তারপর নিভাকে বলল, 'পয়সার জন্যে ভাবতে হবে না, পরে দেবেন, আমরা কেউ কারুর অপরিচিত নই ত।'

'সত্যি আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব?'

নন্দ নন্দী গজগজ করতে লাগল, 'ইস্ লাটসাহেবি দেখ না। মুখের গেরাস বিলিয়ে দেওয়া হল, মেয়েছেলে দেখেছে কি না, অমনি গলে গেল? বলি বিনয়, আমার ভাড়াটা কবে দেওয়া হবে? দু'মাসের বাকি পড়েছে, মনে আছে?'

'তা জানি নন্দবাবু, আপনার ভাড়া আমি ঠিক চুকিয়ে দেব।'

'ফি মাসেই ত তাই বল। কাপ্তেনি করলে ভাড়া মিটাবে কি করে?'

'একে আপনি কাপ্তেনি বলেন? পরেশবাবুর পরিবারের অবস্থা দেখে আপনার একটুও দয়া হয় না?'

'তোমার কাছে বক্তিমে শুনতে আসি নি। আমার ভাড়া ফেলে দেবে, পরে অন্য কথা।'

রেশনের দোকানের সামনে ততক্ষণ যেন খণ্ড প্রলয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। দোকানি ক্রেতাদের ভয়ে তাড়াতাড়ি দরোজা বন্ধ করে দিল। তাতেও নিস্তার নেই। দুম-দাম ধাক্কা পড়তে লাগল দোকানে, দু-একটা ইটও এদিক-ওদিক চলল।

'সরে আসুন, সরে আসুন,' বিনয় নিভাকে ব্যগ্র হয়ে বলল. 'ওদিকে দারুণ গোলমাল হচ্ছে। চলুন, বাড়ি চলুন।'

'আগুন! আগুন!' এদিক থেকে কার যেন গভীর কণ্ঠ শোনা গেল।

বিনয় আর নিভা থমকে দাঁড়াল।

'আগুন! আগুন! আবার চিৎকার।

'কোথায় আগুন? তবে কি ওরা দোকানে আগুন দিল?'

দোকানের সামনে ভিড়টা যেন একটু হকচকিয়ে গেল। 'কোথায় আগুন?' কোথায় আগুন?' সকলের উৎসুক প্রশ্ন!

নন্দ নন্দী চিৎকার করল, 'দমকল, শীগগির দমকল ডাক।'

ছুটতে ছুটতে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল, 'আগুন আগুন।'

'কোথায় আগুন? কোথায় আগুন?'

ভদ্রলোকটি বলল, 'দাউ দাউ করে জ্বলছে. জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।'

অনেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় বলুন না?'

প্রৌঢ় বললে, 'জানো না?' তারপর নিজের পেটের ওপর হাত চাপড়ে চিৎকার

করে উঠল. 'এই পেটের মধ্যে। আগুন আগুন! জ্বলে গেল. পুড়ে গেল!'

নিভা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল. 'বাবা. তুমি আবার পথে বেরিয়েছ? এত করে বারণ করলুম। তুমি আবার পথে বেরিয়েছ?'

এক ঝটকায় মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে পরেশ চৌধুরী বলল. 'পথে বেরিয়েছি, আমরা সবাই পথে বেরিয়েছি। এ বড় ভয়ানক পথ। সাপ, বিছে. বাঘ, ভালুক. কিলবিল করছে, ছোবল মারছে. ঘাড় মটকে রক্ত শুষে নিচ্ছে।'

একজন অচেনা লোকের কাঁধ ধরে পরেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে ফিসফিস করে উঠল, 'দেখছ না, সব ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দেখ গায়ে এক ফোঁটা রক্ত-মাংস নেই। দেখ, দেখ।'

অচেনা লোকটি ভয় পেয়ে পরেশের হাত ছাড়িয়ে পিছিয়ে গেল। জনতা পরস্পরের মধ্যে ইশারায় সংকেত করল. ভদ্রলোক বদ্ধ পাগল।

নিভা ব্যাকুল হয়ে বলল, 'বাবা,, তুমি বাড়ি চল।'

পরেশ হুঙ্কার দিল, 'বাড়ি? কোথায় বাড়ি? দেখছিস না. এ ভয়ানক পথ, এখানে বাড়ি নেই. ঘর নেই. শুধু জঙ্গল, গভীর জঙ্গল! বাঘ সিংহরা ওৎ পেতে আছে, রক্ত শুষে নেবে, কিছুতেই ছাড়বে না। হাঃ হাঃ হাঃ. কিছুতেই ছাড়বে না।'

এদিকে দোকানের সামনে ভিড় তখন পাতলা হয়ে এল। সকলের দৃষ্টি এবার পরেশের দিকে নিবদ্ধ। তাকে ঘিরে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে উঠছিল। অনেকেই মজা দেখতে লাগল, কেউ কেউ হাসাহাসি করতে লাগল। নিভা নিজেকে ভারী অসহায় বোধ করল। সে কাতর হয়ে আবার অনুরোধ করল, 'বাবা, বাড়ি চল।'

পরেশ আপন ভাবের ঘোরে বিভোর। নিভা বিব্রত হয়ে অনুনয় করল. 'বিনয়বাবু, নন্দবাবু, বাবাকে ধরে ঘরে নিয়ে চলুন।'

'চলুন.' বিনয় বলল।

নন্দ নন্দী বিরক্ত হয়ে গজগজ করল, 'চল, চল। আচ্ছা ভাড়াটে জুটিয়েছি বাবা, বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।'

ওরা একটু অগ্রসর হল। পিছনে পিছনে ভিড়ও চলতে লাগল। একজন সুবেশ সুদর্শন যুবক ঐ ভিড়ের মধ্যে যোগ দিল সবার অলক্ষ্যে। একটা দামী মোটরগাড়ী থামিয়ে সে একটু দূরেই নেমেছিল। পাঞ্জাবী শোফার গাড়ির দরজা খুলে ধরেছিল। যুবকটি বেশ লম্বা. চটপটে, চালচলনে আভিজাত্য, ঠোঁটের ওপরে পাতলা গোঁফ মুখটাকে যেন উদ্ধত করে তুলছিল। তার রঙ বেশ ফরসা কিন্তু ঈষৎ ভ্রূকুটি যেন মনের কুটিলতাকে প্রকট করে দিচ্ছিল।

যুবকটি একজন লোককে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে এত ভিড় কিসের?'

'ভারী মজা. পাগলা ক্ষেপেছে!' সে বলল।

পরেশের কানে কথাটা যেতেই সে সুর করে বেসুরো গেয়ে উঠল. 'আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।' হঠাৎ পেট চেপে ধরে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে সে চিৎকার করল, 'উঃ জ্বলে গেল. পুড়ে গেল। আগুন আগুন!'

নিভা ব্যাকুল হয়ে বলল, 'কিছু হয় নি বাবা। তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ি চল।'

নবাগত যুবকটি নিভার কাছে এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে, বলল, 'একি, নিভা? কাকাবাবু, আপনি এখানে?'

নিভা কোন জবাব দিল না। বিরক্তিতে তার ঠোঁট কঠিন হয়ে উঠল। চঞ্চল রায় এই বেগতিক অবস্থায় আবার এখানে এসে হাজির হল। নিভা ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বাবার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল, যেন তাকে সঙ্গে করে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে।

কিন্তু পরেশ চঞ্চলকে চিনতে পারল। আর চিনতে পারবে নাই বা কেন? যখন অবস্থা আরও ভাল ছিল, পরেশ ওদের পাশের বাড়ি থাকত। অভিজাত ধনীর সন্তান চঞ্চল কত সময় পরেশের বাসায় আসা-যাওয়া করত, নিভার সঙ্গে গল্পগুজব করত, খাওয়া-দাওয়া করত। কিছুদিন হল পরেশ বাসা বদল করেছিল।

হঠাৎ পূর্বস্মৃতি পরেশের মনে ঝলক মেরে উঠল। সে চঞ্চলের কাঁধ ধরে সাগ্রহে বলল, 'কে চঞ্চল, চঞ্চল?'

'হাঁ কাকাবাবু' চঞ্চল বলল, 'আপনাকেই তো দেখতে আসছিলুম।'

পরেশ বলল, 'বেশ বেশ। চঞ্চল, পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব—আর কি, আর কি—হাঁ, কাটলেট, কারি—চঞ্চল, পোলাও খাব, কালিয়া খাব।'

ক্ষুধার্ত শিশুর মতো আকুল হয়ে উঠল পরেশ। নিভা যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইল, সে কান্না চেপে বলল.'বাবা বাড়ি যাবে চল।'

পরেশ রাগত কণ্ঠে বলল. 'না-না। আমি কোপ্তা খাব, কাবাব খাব।'

নিভা পাগলকে ভোলাবার জন্যে ছলের আশ্রয় নিল, 'বেশ ত. বাড়ি গিয়ে আমি রেঁধে দেব।'

আশ্বস্ত হয়ে পরেশ বলল, 'তুই রেঁধে দিবি. মা, তুই রেঁধে দিবি?'

নন্দ নন্দী আর ধৈর্য ধরতে পারল না। সে বিরক্ত হয়ে উঠল, 'উঃ কি যন্ত্রণায় পড়েছি বাবা, চলুন বাড়ি চলুন পরেশবাবু. আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলামি করতে হবে না।'

চঞ্চল বলল. 'চল. নিভা. আমি তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দি। দরকার হয় ত আমার শোফারকে ডাকছি। তাকে ত তুমি ভালই চেন।'

চঞ্চল ডাকল, 'সুদর্শন সিং, সুদর্শন সিং।'

মোটর ছেড়ে পাঞ্জাবী শোফাব ছুটে এল। অভিবাদন করে বলল, 'জী হুজুর?'

লম্বা চওড়া পাঞ্জাবীকে দেখে জনতা একটু সমীহ্ করল। ভীড় কিছু পাতলা হয়ে গেল।

নিভা বাবার হাত ধরে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। মেয়ের কাবাব কারি রান্নার লোভে পরেশ অনুগত বালকের মতো শান্তভাবে এগিয়ে চলল। চঞ্চল নিভার খুব কাছাকাছি ঘেঁষে চলতে চাইল। নিভা যেন তার সংস্পর্শ এড়াতে ব্যস্ত। একহাতে নিজের শাড়িটা সামলে নিয়ে সে যেন সংকুচিত হয়ে উঠল। সে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে চঞ্চলকে বলল, 'না' তোমায় আর আসতে হবে না, চঞ্চলদা। আসুন বিনয়বাবু।'

চঞ্চল বিনয়ের দিকে কটমট করে চেয়ে নিভাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার এই ভদ্রতার মানে জানতে পারি কি, নিভা?'

নিভা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'সে কথা ত তোমায় আগেই জানিয়েছি। আমি চাই না, তুমি আবার আমাদের বাড়িতে পা দাও। আসুন বিনয়বাবু।'

এত লোকের সামনে অপমানিত হয়ে চঞ্চল কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। একবার নিভা আর একবার বিনয়ের দিকে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হানল। ততক্ষণ পরেশকে নিয়ে ওরা গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু নন্দ নন্দী সঙ্গে গেল না। কি মনে করে আবার চঞ্চলের কাছে ফিরে এল।

একজন লোক কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে মশায়? মেয়েটা ও-রকম ফোঁস করে উঠল কেন?'

আর একজন জানতে চাইল, 'আপনার আত্মীয় বুঝি?'

চঞ্চল বিরক্তিতে ফেটে পড়ল, রেগে বলল, 'আচ্ছা লোক ত আপনারা, পরের কথায় কথা কইতে আসেন কেন? ওরা চোদ্দপুরুষেও আত্মীয় নয়, হল ত।'

চঞ্চল মোটরের দিকে হনহন করে ফিরে আসছিল। নন্দ নন্দী তার পিছু পিছু ধাওয়া করল। 'শুনুন, স্যার,' নন্দ চঞ্চলকে ডাকল।

'আপনি আবার কি বলতে চান?' চঞ্চল বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু মনে করবেন না, স্যার,' নন্দ বলল, 'বলুন ত মেয়েটা আপনার ওপর অমন তেরিয়া হয়ে আছে কেন? ইস্, বলে কি না আপনাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না।'

'দেখলেন ত ভদ্রতা!' চঞ্চল প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, বিনয়বাবুটি কে?'

'আমারই ভাড়াটে, স্যার। লেখক। কি ছাই পাঁশ লেখে, বই বিক্রি হয় না। একদম গরীব, সময়মত ভাড়া দেবার মুরদ নেই।'

'শেষ পর্যন্ত একটা চালচুলোহীন লোকের ঘাড়ে চাপল নিভা?'

'তার মানে? ব্যাপারটা কি খুলে বলুন ত।'

'আপনার অত খবরে দরকার কি, মশায়?'

'আমি ওদের বাড়িওয়ালা।'

'ও।' চঞ্চল সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, 'একই বাড়িতে ওরা থাকে? আচ্ছা ওদের উপর একটু নজর রাখবেন।'

তারপর সে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'বাড়ি ঢুকতে দেবে না? মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়া হল। আচ্ছা, এ তেজ কতদিন থাকে আমিও দেখে নেব। অনেক মেয়েকে টিট করেছি আমি।'

সুদর্শন সিং মনিবের জন্যে মোটরের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। চঞ্চল মোটরে উঠল। সুদর্শন দরজা বন্ধ করে দিয়ে শোফারের সিটে বসল।

নন্দ নন্দী দারুণ কৌতূহলে মোটরের জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে প্রশ্ন করল, 'যাবার আগে সবটা খুলে বলুন না, স্যার, দোহাই আপনার।'

চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'অত কথা বলবার সময় নেই আমার। নিজের চোখে সবই দেখবেন, দু'দিন যাক না। আচ্ছা নমস্কার।'

চঞ্চলের মোটর দ্রুত গতিতে চলে গেল।

নন্দ নন্দী ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা ত সুবিধের নয়। নিভা মেয়েটি সুন্দরী, তার ওপর নন্দর নিজেরই লোভ হয়। বয়স বাড়লে কি হবে, মেয়েটি তার বুকে দোলা দেয়। গৃহিনী অসুস্থ, রোগা, খিটখিটে। তার পাশাপাশি নন্দ যখন মনে মনে ভাড়াটের মেয়েটিকে বসায়, এই বয়সেও চিত্তে পুলক জাগে। বসতবাড়ির খানিকটা অংশ ভাড়া দিয়েছে নন্দ। দোতলা থেকে নন্দ পরেশের অংশটা দেখতে পায়। দিনরাত ঘরোয়া কাজকর্মে যুবতী মেয়েটি ব্যস্ত থাকে। সময় অসময়ে তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে বেশ ভাল লাগে নন্দর। ঢলঢলে মুখ, দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, চিকন চর্ম, পুষ্ট যৌবন, হালকা গায়ের রঙ, উন্নত বুক, নন্দ কতবার লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখেছে। তার মনে হয়েছে বয়সটা যদি আরও কম হ'ত, হয়ত কাছাকাছি নিবিড় করে দেখবার সুযোগ নিত নন্দ। তবু দূর থেকে দেখতেও ভাল লাগে। মেয়েটা কলঘরে গামছা কাঁধে নাইতে যাচ্ছে, ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে; কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, রান্না করা সবই এক চিলতে বারান্দায় সারছে। মাকে গৃহকর্মে সাহায্য করছে, পাগল বাপের সেবা করছে, আবার আটপৌরে শাড়ি পরে সেজেগুজে বাড়ির বাইরে যাচ্ছে, এসব দেখে নন্দ মনে মনে খুশি হ'ত। ক'মাস রয়েছে ওরা। কিন্তু মেয়েটার কোন বেচাল দেখেনি। মেয়েটার ওপর যেন তার একটা অলিখিত স্বত্ব জন্মে গিয়েছিল। আজ ঐ চঞ্চলবাবুর কথায় মনে মনে সন্দেহ জাগল। মেয়েটা কোথায় যেন তাকে ঠকাচ্ছে। নন্দ মনে মনে ভাবল, 'নাঃ ব্যাপারটা ত সুবিধের নয়। যেন একটা জালিয়াতির গন্ধ পাচ্ছি। যাই একবার গিন্নীকে খবর দিয়ে আসি।'

দুই

হৈমবতী সিঁথিতে সিঁদুর লাগাল বেশ চওড়া করে, আয়নায় সেটা জ্বলজ্বল করতে লাগল। শাঁখাতেও একটু সিঁদুর লাগান তার বরাবরের অভ্যাস। সেই কতকাল আগে তার বিয়ে হয়েছিল, এর হিসাব সে আজকাল করে না। বিয়ের তিন বছরটাক পরে নিভা পেটে এল। মেয়ে যখন জন্মাল, হৈম খুশী হয়নি, সে চেয়েছিল একটি ছেলে হোক, বংশধর। কিন্তু পরেশের আনন্দ উপচে পড়ত। নাই বা হল ছেলে, এমন ফুটফুটে মেয়ে ক'জনের ঘর আলো করে আসে! তাছাড়া এই ত প্রথম সন্তান, বয়স ত পালিয়ে যাচ্ছে না। ছেলে কোলে আসতে কতক্ষণ? কিন্তু সে ক্ষণ আর হৈমর এল না। অরও দুবার গর্ভে সন্তান এসেছিল কিন্তু তারা কেউ জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হয়নি। ডাক্তার বলেছিল কোলে আর সন্তান আসবে না। হৈম এজন্য দুঃখ করে না। নিভা চোখের সামনে ডাগর হয়ে উঠল, রাজরানীর মতো রূপ। কিন্তু হৈমর দুঃখ, এখনও নিভার কপালে বর জুটল না। এ নিয়ে হৈম স্বামীর ওপর কত রাগারাগি করেছে, কিন্তু এখন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাউকে সে দোষ দেয় না। স্বামী ত থেকে থেকে পাগল হয়ে যান, কাজের বাইরে বললেই চলে। সুরূপা মেয়ের ভরা যৌবন বৃথাই যাচ্ছে বরের অভাবে, হৈমর ভাবলেও কষ্ট হয়।

তার নিজের বিয়ে হয়েছিল, তখন কতই বা বয়স। মফস্বল শহরে ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে, সবে মাত্র যৌবন এসেছে, সেই সময় বিয়ের ফুল ফুটল, সম্বন্ধ এল। কলকাতার কোন সদাগরী অফিসের কেরানী মেয়ে দেখতে এল। একবার দেখেই পছন্দ করল। তার অল্প ক'দিনের মধ্যে মালাবদল, চার চোখের চাওয়া। স্বামী হৈমর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। কিন্তু এখন হৈমকে দেখলে এ কথা কেউ বিশ্বাসই করবে না। আয়না প্রতিদিন জানিয়ে দিচ্ছে হৈম অকালে বুড়িয়ে গেছে। মাথার চুলে পাক ধরেছে, চোখের কোণে কালি, রঙটাও মলিন হয়েছে, গাল দুটো বসে গেছে। আগে কিন্তু এমন ছিল না। হৈমর গড়নপেটন ভালই ছিল। নয় ত এক নজরেই স্বামী তাকে পছন্দ করত না।

সে সব দিন কোথায় গেল? স্বামীর-সুখ ত হৈম প্রাণভরে ভোগ করছিল। সদাগরী অফিসের কেরানী, মাইনেও বেশী নয় কিন্তু তখন সস্তাগণ্ডার কাল ছিল, ওর মধ্যেই হৈম গুছিয়ে সংসার করত, কিছু জমিয়েছিল, দু'চারটে সোনার গয়নাও গড়িয়েছিল। তখন সোনার ভরি কত কম ছিল। স্বামীও ছিল আমুদে লোক। তাস-পাশা খেলা, থিয়েটার করা—এই সব ছিল বাতিক। কত সময় আপিসের কাজের পর ক্লাবে মহলা দিয়ে রাত করে ঘরে ফিরত, হৈম একা অভিমান করে গোমড়ামুখে বসে থাকত। স্বামী ঘরে ফিরে

হেমর মান ভাঙ্গাত। শাহাজাদী, সম্রাট্‌-নন্দিনী ইত্যাদি কত কি মিষ্টি কথা সুরেলা গলায় বলে স্বামী তাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় মুখ চোখ ভরিয়ে দিত। আরও কত মধুর স্মৃতি হেমর মনে পড়ে। থিয়েটারে স্বামীকে যা মানাত! বিশেষ করে যখন ঐতিহাসিক কি পৌরাণিক পালা হ'ত, ঝকমকে সাজপোশাকে তার স্বামীকে দেখলে কে বলবে সে রাজা মহারাজা, নবাব-বাদশা নয়?

কিন্তু আজ? ভাবতেও বুক কেঁপে ওঠে। কোথা দিয়ে কি ওলটপালট হয়ে গেল সারা দেশে। হেম বোঝেও না, বুঝতেও চায় না, কিন্তু এটা হাড়ে হাড়ে বোঝে নিজেদের সেই সৌভাগ্য আর নেই। 'বন্দে মাতরম্‌', 'জয় হিন্দ', 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'আমাদের দাবী মানতে হবে', 'চলবে না, চলবে না', 'চলছে চলবে'—কত আওয়াজ হেমর কানে এসে পৌঁছয়, কত মিছিল, আন্দোলন, উত্তেজনা, ইট ছোড়া, লাঠি মারা, গুলি—হেমর চোখে পড়েছে, কিন্তু শেষ অবধি কি লাভ হল হেমর? দিনের পর দিন দাম বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া, চাল, ডাল, নুন, তেল জোটানোই ভার। তবু কিছু মাইনে বাড়া, মাগগিভাতা, বোনাস নিয়ে সংসারের হাল ধরেছিল হেম, কিন্তু এখন নৌকা ডুবুডুবু যখন স্বামীর চাকরি চলে গেল হঠাৎ, আপিসে ধর্মঘট, ঘেরাও, মারপিট, থানাপুলিস, সালিশ, শেষ পর্যন্ত আপিস উঠেই গেল। মালিকেরা আর কারবার চালায় না, ব্যবসা গুটিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে গেল। তারপরই বেকারি, যেখানে হাজার হাজার শিক্ষিত জোয়ান ছেলেরা কাজের জন্যে হাপিত্যেশ করছে, সেখানে অল্প-শিক্ষিত প্রৌঢ় বেকারকে কে কাজ দেয়? তবু ক্লাবে থিয়েটারের খাতিরে অনেকের সঙ্গে জানাশোনা ছিল, এখানে ওখানে খাতা লেখা, কেনা বেচায় দালালি করা—এইসব অনিশ্চিত আয়ের ওপর কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলতে লাগল। কিন্তু দুঃখের ভরা তখনও ত পূর্ণ হয়নি।

মেয়েটা বড় হল। লেখাপড়ায় ভালই ছিল। কিন্তু পয়সার অভাবে তাকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হল। হেম ভাবত, একটা যদি তার ছেলে থাকত সে হয়ত রোজগার করে আনতে পারত। তাই বা কি করে বলা যায়? হেম শোনে হাজার হাজার নওজোয়ান বেকার, হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েটা বলে, 'মা, মনে কর আমি তোমার ছেলে। আমি চাকরি করব।' হেম রাগ করে। মেয়েছেলে, স্বামীর ঘরই তার আশ্রয়, স্বামীর সংসারে সে লক্ষ্মী। আপিস কাছারিতে কি তাকে মানায়? কিন্তু চাইলেই বা চাকরি দেয় কে?

চঞ্চল ছেলেটির ওপর হেমর অনেক আশা ছিল। পাশের বাড়িতে থাকত সে। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, 'কাকাবাবু, কাকীমা' বলে আসত, নিভার সঙ্গে খুব মেলামেশা করত, অবশ্য কোন বেচাল হতে দেয়নি হেম, নিভা সেরকম মেয়েই নয়। হেম ভেবেছিল চঞ্চল নিভাকে ঘরে নেবে কুললক্ষ্মী করে। কিন্তু তা আর হল না। খুব জাঁকজমক করে

লিলিব সঙ্গে চঞ্চলের বিয়ে হল। লিলি বড়লোকের মেয়ে। এ বিয়ে ত হতেই পারে। তবু চঞ্চল ওদের পুরানো বাসায় আসা-যাওয়া ছাড়েনি, তার পুরানো মিষ্টি ব্যবহারেরও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু যা হবার নয় তা কি করে হবে? চঞ্চলকে ত আর কোনদিন জামাই করা যাবে না। অন্য কোন সম্বন্ধেরও ত লক্ষণ নেই। আর কেই বা সম্বন্ধ করে? স্বামী ত এখন পাগল।

স্বামী পাগল! ভাবতে পারে না হৈম। অমন আমুদে লোক কি করে পাগল হয়। বেকার জীবন, অনিশ্চিত আয়, মেয়ে বৌ-এর ভবিষ্যৎ—এ সব আর কতদিন ধরে পুরুষমানুষ ভাবতে পারে? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কটা টাকা নিঃশেষ হল, মাগগিগণ্ডার বাজারে, হৈমর গয়নাগুলো এক এক করে বিক্রি হয়ে গেল। একদিন বাড়ি ফিরে স্বামী পুরানো থিয়েটারের লাইনগুলো বলতে লাগল চিৎকার করে। হৈমর বিরক্তি লাগল। এই কি হাসিঠাট্টার সময়! হৈম মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, তখন কে জানত স্বামী বোধগম্যির বাইরে? কে জানত সে পাগল হয়ে ঐ সব বুলি আওড়াচ্ছে? যে সব থিয়েটারী লাইন শুনলে হৈম পুলকিত হ'ত, এখন তা কানে গেলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হৈম ঠাকুরের কাছে কাঁদে আর বলে—ঠাকুর, কি পাপ করেছি, কেন এমন হল?

ঠাকুর-দেবতার প্রতি ভক্তি হৈমর দিন দিন বেড়ে চলেছিল। শিব, কালী. রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর ছবি বা প্রতিমা ঘরের এক কোণে আশ্রয় পেয়েছিল। হৈম সময় অসময়ে পুজো প্রার্থনা নিয়ে শান্তি পেত। স্বামী সন্তানের মঙ্গল কামনা করত।

সেদিন নিভা তার ছেঁড়া ব্লাউজটা সেলাই করছিল। হৈম তেল হলুদ মাখা কাপড় পরে ঘরে ঢুকতেই মেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার রান্না হয়ে গেছে মা?'

'হাঁ, যা হোক শাকচচ্চড়ি ভাত রাঁধলুম। গরীবের ঘর। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। কখন যে উনি পোলাও কালিয়া খাবার বায়না ধরবেন কে জানে?'

'বাবার মাথার অসুখটা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। ক্ষেপে গিয়ে কাল তোমায় খাবারের বাটিটা ছুঁড়ে মেরে দিল। আর ত ফেলে রাখা যায় না। ভাল ডাক্তার দেখান দরকার।'

'সবই ত বুঝি, মা। ডাক্তার বদ্যি ওষুধপথ্যের জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লাগবে। এদিকে পেটের ভাতই জুটছে না, তায় আবার চিকিচ্ছে! সবই অদৃষ্ট! তিনি যা করবেন তাই হবে।'

কোথাও একটা বাঁধাধরা কাজ পেলে হয় ত বাবার মাথার গোলমালটা সেরে যেতে পারে।'

'চাকরি গিয়েই ত মাথার গোলমাল শুরু হল। এই বয়সে নতুন চাকরিই বা কে দেয়? হাতের শেষ সোনাটুকুও সেদিন বেচে দিলুম। বড় সাধ করে সেই বালাজোড়া

রেখেছিলুম তোর বিয়েতে দেব বলে, তাও খোয়াতে হল। এদিকে সবই বাড়ন্ত। চাল ডাল তেল অগ্নিমূল্য।'

নিভা জানে সব। বুদ্ধিমতী মেয়ে। নিজের চোখে সবই দেখছে, অথচ কিচ্ছু করবার উপায় নেই।

মা বলল, 'একটা কথা বলব, রাগ করবি না, বল্?'

নিভা বলল, 'কি কথা বল, মা?'

'একবার চঞ্চলকে খবর দি?'

'না, মা।'

'তুই অবুঝ হসনি মা। পরের ছেলে, কাকীমা বলে এল, আমাদের জন্যে সব সময় আকুল। কিন্তু তুই যে কেন বেঁকে বসলি, ওর কাছ থেকে এক কুটোও সাহায্য নিতে দিস না। তা ত জানি না।'

'না জেনে ভালই করেছ, মা। ওকে খবর দিতে পারবে না। আমরা দোরে দোবে ভিক্ষে করি সেও ভাল, তবু ওর কাছে হাত পাতবে না।'

'তাতে দোষ কি? ভালবেসে কেউ যদি কিছু দেয়, তা ফিরিয়ে দেওয়া কি উচিত? এমন ত লোক নিয়েই থাকে। চিরদিন কারুর সমান যায় না। আবার চাকা ঘুরলে, ওর টাকা না হয় শোধ করে দেওয়া যাবে।'

নিভা প্রবল আপত্তি করল, 'সে কিছুতেই হতে পারে না, মা। তুমি যদি ওর কাছে একটা আধলাও চাও ত আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।'

মা বিরক্ত হয়ে বলল, 'জানি না, বাবা, তোর খেয়াল। তার কাছে হাত না পাতিস তবে উপোস করে শুকিয়ে মর্।'

পরেশ চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল, 'নিভার মা, নিভার মা।'

মেয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটির ফলে হৈমর মেজাজটা এমনিতেই একটু গরম হয়ে ছিল। ঝাঁঝালো সুরে সে সাড়া দিল, 'কি'?

'বলি গিলতে টিলতে দেবে? পরেশ আরও জোরে চেঁচাল।

'চল তোমায় ভাত বেড়ে দি।' একটু নরম হয়ে হৈম বলল।

'ভাত? ভাত কে খাবে? বললুম, পোলাও রাঁধ, কালিয়া রাঁধ। কথা গ্রাহ্যি হয় না?'

'নবাব-বাদশার সংসার! পোলাও কালিয়া বসে আছে তোমার জন্যে।' হৈম আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারল না।

'কি বললি? নবাব-বাদশা? আমি নবাব সিরাজ, আমি বাদশা বাবর!' থিয়েটারী ধরনের পোজ দিয়ে পরেশ হুকুম করল, 'কাঁহা পোলাও, লে আও পোলাও।'

নিভার মা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'পাগলামি করার আর জায়গা পেলে না? ষাঁড়ের

মতো চিৎকার করছ কেন?'

ধমক দিয়ে উঠল পরেশ, 'চোপরও বাঁদী, গোস্তাকি মৎ। লে আও পোলাও, লে আও কাবাব।'

এবার হার মেনে কপাল চাপড়াল হৈম, 'উঃ কি অদৃষ্ট যে করেছি!'

নিভা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দেখছিল বাবার পাগলামি। সে আর স্থির থাকতে পারল না। আঘাতে আঘাতে মার মেজাজও খিটখিটে হয়েছে, বাবার রাগও ধাপে ধাপে বাড়ছে। ওদের ঠাণ্ডা করার জন্যে একটা কিছু করা দরকার। নিভা বলল, 'তুমি একটু চুপ কর ত মা।' তারপর খুব আবদারের সুরে পরেশকে ডাকল, 'বাবা—।' সে কাছে গিয়ে বাবার হাত ধরল।

ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিয়ে পরেশ গর্জন করল, 'হঠ্ যাও, হঠ্ যাও কৌন্ বাবা? আমি বাদশা বাবর। কুর্নিশ কর, কুর্নিশ কর!'

নিভা বাবার ঐতিহাসিক থিয়েটার আগে দেখেছে। কেমন করে কুর্নিশ করতে হয় সে তা জানত। সে করুণ অভিনয় শুরু করল, কুর্নিশ করতে করতে সে আবার ডাকল, 'বাবা?'

পরেশ হুকুম করল, 'জাঁহাপনা, বল্ জাঁহাপনা।'

নিভার কান্না এসে গেল। অতি কষ্টে কান্না চেপে নাটুকে সুরে সে বলল, জাঁহাপনা, বল্ জাঁহাপনা।'

নিভার কান্না এসে গেল। অতি কষ্টে কান্না চেপে নাটুকে সুরে সে বলল, 'জাঁহাপনা, আপনার পোলাও, কাবাব খানার ঘরে আছে। চলিয়ে জাঁহাপনা।'

পরেশ মহাখুশি হয়ে বলল, 'হাঃ হাঃ হাঃ, চল্ বাঁদী, চল্। কুর্নিশ করতে করতে চল্।'

কুর্নিশ করতে করতে নিভা দরজার দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল। পরেশ আভিজাত্যের সঙ্গে এগিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল চঞ্চল। তার হাতে একটা বড় প্যাকেট। সে পিতাপুত্রীর ঐ সব কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর নিভার মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি ব্যাপার?'

হৈম হতাশ হয়ে বলল, 'সবই অদৃষ্ট।'

চঞ্চলের গলা শুনেই নিভা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরেশের সে ঘোরটা কেটে গেছে। সে চঞ্চলকে দেখে মহোৎসাহে বলল, 'কে চঞ্চল? মাই গুড্ বয়! পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব?'

চঞ্চল হাতের প্যাকেটটা দেখিয়ে বলল, 'কাকাবাবু, আপনার জন্য গরম গরম কাটলেট এনেছি চীনের হোটেল থেকে।'

কাটলেটের নাম শুনে পরেশের জিভ দিয়ে যেন জল পড়তে লাগল। সে দ্রুত এগিয়ে এসে লুব্ধস্বরে বলল, 'কই কাটলেট, কোথা কাটলেট?' প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে দেখল, খুশীমনে, আবার বলল, 'কাটলেট! হাঃ হাঃ হাঃ কাটলেট।' গভীর লোভের সঙ্গে একটি কাটলেট সে গপ গপ করে গিলতে লাগল।

নিভা বাবার উৎকট লোভ দেখে পীড়িত হল, তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বলল, 'বাবা, চল খাবে চল।'

পরেশ অনেকটা শান্ত হয়ে বলল, 'চল্ মা। এসব আমার, তুই কাটলেট পাবি না, খেতে চাইলেও পাবি না। কেঁদে মাথা খুঁড়লেও পাবি না।'

নিভা কান্না চেপে আশ্বাস দিল, 'আমার কাটলেট চাই না, তুমি চল।'

'চল্ তবে চল্।' পরেশ সাগ্রহে কাটলেট খেতে খেতে নিভার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চঞ্চল দরদী গলায় বলল, 'কি হয়েছে, কাকীমা?'

'আমার কপাল পুড়েছে বাবা, আমার কপাল পুড়েছে! মেয়ে বড় হল, ওঁর মাথায় ব্যামো। এক আধলা আর নেই। কেমন করে যে সংসার চলছে বাবা, সে আর তোমায় কি বলব?'

চঞ্চল সহানুভূতির ভান করে বলল, 'আমায় বলেন না কেন কিছু? আমি আপনার ছেলের মতো।'

'সে তো জানি বাবা। আমার কি অসাধ? কিন্তু নিভাই ত বেঁকে বসে! তোমায় কিছু বলতে দিতে চায় না।'

'ও ছেলেমানুষ। বোধহয় ওর লজ্জা করে। ওর কথা ছেড়ে দিন, কাকীমা।'

'আমিও ত তাই ভাবি বাবা। কিন্তু ও যে-সব কথা বলে, তাতে মায়ের বুক কেঁপে ওঠে।'

চঞ্চল ঈষৎ সন্ত্রস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'নিভা আপনাকে কি বলেছে? আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধে। তুমি রাগ কর না বাবা।'

'কি, কি বলেছে সে?' সন্দিগ্ধ হল চঞ্চল।

'বলে তোমার কাছে হাত পাতলে সে গলায় দড়ি দেবে।'

'কেন? কারণ বলেছে?'

'না কিছু না, খেয়াল, সব খেয়াল।'

এবার আশ্বস্ত হয়ে চঞ্চল বলল, 'আপনি ওর কথায় কান দেবেন না, কাকিমা। ও একদম ছেলেমানুষ।'

'তা যা বলেছ, বাবা।'

'দেখুন কাকীমা, আমার কাছে কোন লজ্জা করবেন না। ছেলেবেলা থেকে আপনাকে কাকীমা বলেছি, আমি আপনার ছেলের মতো।'

'বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক।' হৈম গদগদ হয়ে বলল, 'এমন সোনার চাঁদ ছেলে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা! রূপে গুণে ঐশ্বর্যে কটা জুড়ি মেলে তোমার?'

'আমায় লজ্জা দেবেন না, কাকীমা।'

'না বাবা। হৈমর পুরানো স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল, 'আমার মনে পড়ছে লিলির সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা। ওঃ কি ঘটাই না হয়েছিল। তা বৌমা ভাল আছে ত? সে বুঝি গরীব কাকীর বাড়িতে একবার পা দিতে পারে না?'

'না, তা নয়। সে সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে। সেই ত বাড়ির গিন্নী।'

'আহা, লক্ষ্মী বৌ।'

চঞ্চল আশপাশ সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে চুপি চুপি হৈমকে বলল, 'ও সব থাক, একটা কাজের কথাই বলি, কিছু মনে করবেন না।

'বল বাবা, ছেলের কথায় আবার মনে করব কি?'

চঞ্চল সহানুভূতির সুরে বলল, দেখুন আমিও ত সব জানি আপনাদের অবস্থা। কাকাবাবু অভাবে পড়ে পাগল হতে চলেছেন। ভাবলুম আমি যদি মাসে মাসে কিছু টাকা দিই, কিছু মনে করবেন না ত?

'তোমায় কি বলে যে আশীর্বাদ করব, বাবা?' হৈম বিশেষ খুশি হয়ে বলল, পরক্ষণেই মেয়ের আপত্তির কথা মনে পড়তেই কিছুটা ইতস্ততঃ করে বলল, কিন্তু নিভা—'

চঞ্চল বলল, তার কথা শুনবেন না, কাকীমা, তাকে জানাবার দরকার কি? আমি লুকিয়ে দিয়ে যাব। এই নিন কাকীমা। শ'খানেক এখন দিচ্ছি,' চঞ্চল মানিব্যাগ থেকে খানকয়েক নোট বের করে হৈমর হাতে গুঁজে দিল।

'সত্যি আমি যে কি বলে তোমায়—' হৈম কথাটা শেষ করল না, ইতস্ততঃ করে টাকাটা নিল। সেই মুহূর্তে নিভা ঘরে ঢুকে ব্যথিত কণ্ঠে ডাকল, 'মা'—

হৈম তাড়াতাড়ি টাকাটা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল, মুখে তার অপরাধের ভাব। কিছু বলতে পারল না সে।

নিভা বলল, 'মা, বাবা তাড়িয়ে দিল। বলল, আমি নাকি তার কাটলেটে নজর দিচ্ছি। বলল ভাগ্।'

নিভার কাছ থেকে পালাতে পারলেই যেন হৈম বাঁচে। এই একটা বেশ সুযোগ পাওয়া গেল। সে বলল, 'সব খেয়াল, সব খেয়াল। যাই একবার দেখি গে।' ত্রস্তপদে সে বেরিয়ে গেল।

মা চলে যেতেই নিভা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। চঞ্চলের দিকে ভ্রূকুটি করে বলল, 'এখানে আসতে তোমার লজ্জা করল না?'

চঞ্চল কথাটাকে উড়িয়ে দিল, 'পুরুষমানুষের আবার লজ্জা?'

নিভা বলল রাগতকণ্ঠে, 'আচ্ছা, কেন তুমি এখানে বার বার আসো?'

চঞ্চল প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'নিভা, তোমার রাগ আমার খুব ভাল লাগে। জানো মনস্তাত্ত্বিকেরা বলে, রাগ থেকে অনুরাগে যেতে বেশি সময় লাগে না। আমি তোমার আশা এখনও ছাড়িনি, নিভা। ডার্লিং, তুমি যত বিরূপ হচ্ছ, তোমায় পাবার কামনা আমার তত বেড়ে যাচ্ছে। তোমার শত গঞ্জনার গরল পান করে আমি নীলকণ্ঠ হয়ে উঠছি।'

'থামো। নিভা দৃঢ়স্বরে বলল, 'তুমি যা আশা করেছ, তা কোনও কালে পুর্ণ হবে না। আমি তোমায় কোনদিন ভালবাসিনি আর ভালবাসব না। আমি তোমায় ঘৃণা করি, আমরণ ঘৃণা করব।'

'কেন বল তো'?

'জানো না, চরিত্রহীন কাপুরুষ। তুমি ভেবেছ তোমার রূপ আর ঐশ্বর্যের বিনিময়ে মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে? খেলনার মতো নিত্য নূতন মেয়ের দেহমন ক্ষত-বিক্ষত করে আঁস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলবে?'

'এসব মিথ্যা অভিযোগ, নিভা, ডার্লিং।'

'মিথ্যা অভিযোগ? নিভা বলল।'

চকিতে তার মনের পটে এক একটি টুকরো ঘটনা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে চঞ্চল নিভাদের বাড়ি যাওয়া-আসা করত। বড়লোকের ছেলে। বাবা-মা তাকে একটু সমীহ করত। নিভা তাকে একটু তফাতেই রাখতে চাইত। কিন্তু চঞ্চল তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, তার পিছনে লাগত, হয়ত বেণী টেনে দিত, গাল টিপত, চিমটি কাটত। যেমন পিঠোপিঠি ভাইবোনের মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু বয়সের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলের ব্যবহার অন্য রূপ নিতে লাগল। নবযৌবনের উদ্‌গমে নিভার শারীরিক আকর্ষণ বৃদ্ধি র সঙ্গে সঙ্গে নিভার দেহের দিকে চঞ্চলের নজর পড়তে লাগল। শুধু কি নজর! নিভৃতে নিভার উদ্ভিন্ন বুকের ওপর সে যখন হাত রাখত, সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠত নিভার। একলা পেলে প্রায়ই চঞ্চল নিভাকে জড়িয়ে ধরতে যেত। কয়েকবার তো চুমুও খেয়েছিল। এসব নিভার ভালোই লাগত। সুপুরুষ যুবককে নিকটে পাওয়ার আনন্দে নিভা বিভোর হয়ে উঠেছিল। সে মনও দিয়েছিল চঞ্চলকে। যদিও সে আজ বলল, তোমাকে কোনদিন ভালবাসিনি. কথাটা সত্যি নয়। চঞ্চলকে নিভা ভালবাসত, চঞ্চলকে দেখতে চাইত, কাছে পেতে চাইত, জড়াতে চাইত, চুমু খেতে চাইত। কিন্তু

প্রথম আঘাত পেল যেদিন নিভা জানল চঞ্চল শুধু নিভাকে নয়, নিভার স্কুলের বন্ধু মাধবীর সঙ্গেও ঐ রকম প্রেম করে! নিভা চাপা মেয়ে, সে চঞ্চলের সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠতার কথা কাউকে মুখ ফুটে বলত না। কিশোরীর প্রেম গোপনেই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মাধবীর জাঁক করাই স্বভাব। সে একদিন টিফিনের সময় নিভাকে শোনাল চঞ্চল তার জন্যে কতখানি পাগল। নিভা প্রথমটা বিশ্বাস করেনি। চঞ্চলের সঙ্গে দেখা হতে এই নিয়ে অভিমানভরে প্রশ্ন করেছিল। চঞ্চল সব জিনিসটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে আবার চুমু খেয়েছিল। কিন্তু নিভার সন্দেহ গেল না। সে একটু সতর্ক রইল। নিজের দেহটাকে সে সরিয়ে রাখতে চাইল। তার সন্দেহের প্রমাণ মিলল অপর কোনও এক মেয়ে লিলির প্রেমপত্র থেকে। চঞ্চলকে লেখা সেই প্রেমপত্র। গোটা গোটা অক্ষর, কত না আবেগ-উচ্ছ্বাস। চঞ্চলের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল চিঠিটা। চঞ্চল জানতেই পারেনি যে সেটা নিভার হাতে পড়েছিল। নিভা লুকিয়ে লুকিয়ে সেটা বার বার পড়ল। চিঠিটা সে ফেরত দিল না মালিককে, নিজের কাছেই রেখে দিল। কিন্তু মালিক চিঠিটার কোন সন্ধান করল না, কারণ একদিন চিঠির লেখিকাকেই সে বিয়ে করে ঘরে তুলল। নিভা আঘাত পেলেও ভেঙ্গে পড়ল না। কারণ তার মনটা আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। সে জানত চঞ্চল তার একার নয়, একার হতে পারে না। তা ছাড়া লিলিও সুন্দরী। বড়লোকের মেয়ে। তার সঙ্গে নিভার কোন অংশেই তুলনা হয় না। তাই নিভার মনে আঘাত লাগলেও সে শক্ত হয়ে রইল। ভাবটা দেখাল যেন তার কিছুই হয় নি। এমন কি সে চঞ্চলের বিয়ে উপলক্ষে তাদের বাড়িতে গিয়ে উৎসবের কাজকর্মে হাত লাগাল। বিয়ের পরে কিছুদিন চঞ্চল নিভাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা কমিয়ে দিল। লিলিকে নিয়ে সে মেতে উঠল, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াল পরে কিন্তু আবার চঞ্চল নিভাদের বাড়ি প্রায়ই যাতায়াত শুরু করল। আবার নিভার যৌবনোচ্ছল দেহের ওপর তার লোভ দুর্বার হয়ে উঠল। নিভা নিজেকে যতই সরিয়ে রাখতে চাইল, চঞ্চল ততই তাকে টেনে নিতে চেষ্টা করল। বিবাহিত পরপুরুষের এই নির্লজ্জ লোভ নিভাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল, কৈশোরের আনন্দ শিহরণের জায়গা নিল অজানা আতঙ্ক। কি মতলব চঞ্চলের? একদিন প্রকাশ করল চঞ্চল নিজেই। সে করুণকণ্ঠে স্বীকার করল, লিলিকে বিয়ে করে সে ভুল করেছে, সে নিভাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। নিভাকে না পেলে তার জীবন বৃথা হয়ে যাবে। নিভা কি চঞ্চলদাকে দয়া করবে না, নিজেকে চঞ্চলদার কাছে পুরোপুরি ধরা দেবে না? ভয় কিছু নেই। কোনও ভাল হোটেল, কি অন্য কোন নিভৃত জায়গা—। নিভা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল চঞ্চলের কুপ্রস্তাব। লিলি কাঁদতে কাঁদতে নিভার কাছে চঞ্চলের আরও কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস করে দিয়েছিল। কত মেয়ের নাম। মনেও থাকে না ছাই। নিভা মনে রাখতেও চায়না। ঐ কামুক লম্পটটার

জাল ছিঁড়ে সে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছে এজন্যে সে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয়। কিন্তু চরিত্রহীন পুরুষটা জোঁকের মতো তার দেহের সঙ্গে লেগে থাকতে চায়। একদিন আর একটু হলেই বোধহয় সর্বনাশ হয়ে যেত। অসুস্থ লিলিকে দেখে নিভা বাড়ি আসছিল। এর মধ্যেই তারা বাসা বদল করেছিল। নতুন বাসাটা কিছু দূরে। ভালই হয়েছিল, চঞ্চলের সান্নিধ্য থেকে যতটা দূরে থাকা যায়। লিলি চিঠি লিখে দেখা করতে বলেছিল। অনেক দুঃখের কথা শোনাল। মনটা ভাল ছিল না। লিলি শোফার সুদর্শন সিংকে হুকুম দিল নিভাকে মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে। কিন্তু মোটরে উঠে নিভা দেখে সুদর্শন সিং-এর বদলে চঞ্চলই শোফারের সিটে বসে আছে। নিভা মোটর থেকে তখনই নেমে আসতে চাইল, কিন্তু চঞ্চলের ভৃত্যদের সামনে কোন সিন করা পছন্দ করল না। সে স্তব্ধ হয়ে পিছনের সিটে বসে রইল। চঞ্চল মোটর চালিয়ে নিয়ে গেল. মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলতে লাগল। নিভার নিষ্প্রাণ উত্তর আবহাওয়াকে কঠিন করে তুলল। একটা অজানা আশঙ্কায় নিভা যেন বিব্রত হল। রাস্তার চৌমাথায় মোটর থামলে নিভা দরজা খুলে নেমে যেতে ইচ্ছা করল, কিন্তু শেষ অবধি পারল না। পারলেই হয়ত ভাল হ'ত।

নিভৃত আবছায়া জায়গায় মোটরটি হঠাৎ থেমে গেল। নিভা সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল? গাড়ি থামালে কেন?'

চঞ্চল বলল, 'আপনিই থেমে গেল গাড়িটা, নিশ্চয় কিছু খারাপ হয়েছে, কারবুরেটরে গোলমাল। সুদর্শন হয়েছে মহা ফাঁকিবাজ, কিছুতেই এঞ্জিনটা টিপটপ কন্‌ডিশনে রাখবে না।'

'তাহলে কি হবে?' নিভা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল।

'ভয় কি? চঞ্চল বলল, 'তুমি তো আর জলে পড়নি। আমি একটু নেড়েচেড়ে দেখি, এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চঞ্চল সামনের সীট থেকে নেমে বনেট খুলল, এঞ্জিনে খুটখাট আওয়াজ করল। নিভা খানিকটা আশ্বস্ত হল। তাহলে সত্যিই মোটর বিকল হয়েছে।

চঞ্চল বলল, 'এত অন্ধকার! ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না। তুমি একটা কাজ করবে নিভা?'

'কি?'

'আমার দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে একটু ধরবে এঞ্জিনটার ওপর। ঐ আলোতে তাড়াতাড়ি ঠিক করতে পারব।'

নিভা অগত্যা নেমে এল। এখান থেকে যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল।

চঞ্চল নিভার হাতে দেশলাইয়ের বাক্স দিল। নিভার হাতটা অন্ধকারে একটু বেশিক্ষণ ধরে থাকতে চাইল। কিন্তু নিভা হাত সরিয়ে নিল।

নিভা দেশলাইটা জ্বালতেই চঞ্চল বলল, 'বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়, নিভা। অল্প আগুনের আলোয় তোমার মুখটা আরো মিষ্টি লাগছে! কারবুরেটর দেখব, না তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকব বুঝতে পারছি না।'

দেশলাইটা নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল নিভাকে জড়িয়ে ধরল। নিভা বিরক্ত হয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল, 'রাগ করে বলল, 'এই রকম করলে এখান থেকে আমি হেঁটেই চলে যাব।'

'আচ্ছা, গো, আচ্ছা, আর দুষ্টুমি করব না। নাও আর একটা কাঠি জ্বাল।'

নিভা আর একটা কাঠি জ্বালল। চঞ্চল গাড়িটার এঞ্জিন নাড়াচাড়া করে বলল, 'নাঃ, যন্ত্রপাতি বার করতে হবে। তুমি আর একটু এসিস্ট্ কর না।'

'কি করতে হবে?'

'এমন কিছু নয়। এস গাড়িতে ভিতরের সীটটা আমি তুলছি, তুমি একটু ধরে থাক। আমি যন্ত্রপাতি বার করে নিই।'

নিভা রাজী হল। চঞ্চল মোটরের দরজা খুলে বলল, 'তুমি এক কাজ কর। ভেতরে উঠে পড়। আমি সীটটা তুলছি, তোমার ধরবার সুবিধা হবে।'

নিভা নিঃসংশয়ে মোটরের ভিতরে উঠল।

তখন কে জানত চঞ্চলের কুমতলবের ফন্দি। নিভা ভেতরে ঢুকতেই চক্ষের নিমেষে চঞ্চল উঠে এসে পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরল, পলকের মধ্যে তাকে উল্টে শুইয়ে ফেলল সীটের গদির ওপর, দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন সময় নিভা চিৎকার করল, তীব্র আর্ত চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছোট্ট জায়গায় প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিতে লাগল চঞ্চলকে। নিভার চিৎকার শুনে হৈ হৈ করে দু'তিনজন লোক আলো নিয়ে ছুটে এল। বেগতিক দেখে চঞ্চল চট্ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। নিভার কেশবেশ বিস্রস্ত। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে ঠিক করে নিল।

চঞ্চল আগন্তুকদের সামলাবার জন্যে মিথ্যে কথা ফেঁদে বসল, 'অন্ধকারে গাড়িটা খারাপ। আমার স্ত্রী দেশলাই ধরেছিল, আমি গাড়ি ঠিক করছিলুম। এমন সময় পায়ের ওপর দিয়ে কি একটা সরসর করে চলে গেল। তাই ভয় পেয়ে আমার স্ত্রী চিৎকার করে উঠেছে।'

কি নির্লজ্জ মিথ্যে বলতে পারে চঞ্চল। আবার বলে কি না স্ত্রী? অমন লম্পট চরিত্রহীনের স্ত্রী হতে বয়েই গেছে! নিভা একবার ভাবল লোকগুলোর কাছে সমস্ত কথা ফাঁস করে দেয়। কিন্তু লাঞ্ছনার প্রচণ্ড লজ্জায় সে নীরবে ফুঁসতে লাগল।

একজন লোক বলল, 'না, মা ভয়ের কিছু নেই। এখানে সাপ বেরোয় না। তবে বিছেটিছে থাকতে পারে।'

নিভা বলল, 'দেখুন, কাছাকাছি কোথাও বাস কি ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?'

'ঐ ত, ওধারের রাস্তা দিয়ে ঘন ঘন বাস যায়, মা।'

'চলুন না, আমায় একটা বাসে তুলে দিন না।'

চঞ্চল বলল, 'বাস কি হবে ডার্লিং? আমাদের মোটর ত ঠিক হয়েই গেছে।'

নিভা কোন কথা না বলে মোটর থেকে নেমে এগিয়ে চলল। আগন্তুকেরা পিছু পিছু গেল। চঞ্চলও ছাড়ল না। সে বলতে লাগল, 'দেখুন ত, আমার স্ত্রী কি ভীতু, একটা কি পোকা দেখেছে আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবে না।'

আগন্তুক বলল, 'আহা, মা লক্ষ্মী ভারী ছেলেমানুষ।'

পোকা! নরকের পোকা! নিভা মনে মনে সিঁটিয়ে উঠল। এই পোকা তার সমস্ত শরীরে কিলবিলিয়ে চলে বেড়াচ্ছে। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই। নিভা হন হন করে এগিয়ে গিয়ে বাস ধরল। দেখল চঞ্চলের মোটর বাসের পাশ দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। মোটর তবে ঠিকই ছিল। সবই তবে চঞ্চলের ছলনা।

সেই দিন থেকে চঞ্চল যতবার তাদের নতুন বাসায় ঢুকতে গেছে, নিভা সশব্দে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আজ আর পারল না। বাবার পাগলামির সুযোগ নিয়ে চঞ্চল আবার এই বাড়িতে ঢুকেছে, আবার কি ফন্দি আঁটছে নিভার দেহটাকে নিয়ে লোফালুফি করবে বলে, কে জানে?

নিভা আবার চঞ্চলকে দর্পিতকণ্ঠে বলল, 'মিথ্যে অভিযোগ? আমার বরাত ভাল, সেদিন তোমার মধ্যে পশুটাকে আমি চিনে নিয়েছি, তোমার কেলেঙ্কারির কথাও আমি জেনে ফেলেছি। তোমার ভেতরের কদাকার বীভৎস চেহারা দেখে আমি পালিয়ে এসেছি।'

চঞ্চল ব্যঙ্গ করে বলল, 'বাঃ, বাঃ, ঠিক লিলির মতো কথা! লিলি তোমার কানে সব কথাই তুলেছে দেখছি। যাক্ তুমি এখন কি করবে শুনি।'

'আমি কিছুই করব না, শুধু তোমায় উপেক্ষা করব।'

'পারবে?'

'নিশ্চয় পারব। তোমায় বুঝিয়ে দেব শুধু রূপ আর ঐশ্বর্য দেখিয়ে সব মেয়ের মন পাওয়া যায় না। দেখিয়ে দেব এমন মেয়েও জগতে আছে যে এসব তুচ্ছ করে প্রকৃত মানুষকে চিনতে পারে।'

'না, না, নিভা, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। বিশ্বাস কর আমি সত্যি তোমায় ভালবাসি।'

'এই সত্যি তুমি কত মেয়ের কাছে করেছ?'

'নিভা আমি তোমায় চাই। প্রয়োজন হলে আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি।'

'বাঃ, চমৎকার!' নিভা বিদ্রূপভরে হেসে উঠল।

'কেন, এতে হাসির কি আছে? মানুষ কি একবারের বেশী বিয়ে করতে পারে না?'

'থাক্, বিয়ে পবিত্র সম্পর্ক। তোমার নোংরা মুখে বিয়ের কথা উচ্চারণ করে তাকে অপবিত্র কর না। তোমার সঙ্গে আর কথা বাড়াতে চাই না, তুমি কি এখন এখান থেকে যাবে?'

'যদি না যাই, জোর করে তাড়াবে?'

'তা কি হয়? তুমি বাবা মার আদরের অতিথি। তোমায় কখনও তাড়াতে পারি। অগত্যা আমাকেই চলে যেতে হবে।'

'না, না, আমিই যাচ্ছি। কিন্তু আবার আসব। এসে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাব।'

চঞ্চল প্রস্থানোদ্যত, এই সময় পরেশ ঘরে ফিরে এল, পিছনে নিভার মা।

পরেশ খুশী মনে বলল, 'চঞ্চল, চঞ্চল, খাসা কাট্‌লেট! আঃ!' হেঁউ করে সে একটা ঢেঁকুর তুলল। তারপর আবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'এরা—এরা আমায় খেতে দেয় না, রাক্ষুসীরা সব নিজেরাই গেলে। এত করে বলি পোলাও রাঁধো। কিছুতেই কি রাঁধবে? চঞ্চল তুমি আমায় কাবাব খাওয়াবে, গরম গরম কাবাব, শিক-কাবাব, মোগলাই কাবাব?'

'বেশ ত কাকাবাবু। পরশু আপনার নেমন্তন্ন রইল আমাদের ওখানে। কি খাবেন?'

পরেশ উল্লসিত হয়ে ফিরিস্তি দিল, 'পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব, কারি, কাটলেট—আর—আর চপ্—'

চঞ্চল আশ্বাস দিল, 'বেশ ত সব রকম করব। পরশু। মনে থাকে যেন। আমি আমার কার্ পাঠিয়ে দেব। কাকীমা আর আপনি যাবেন।' তারপর একটু থেমে অর্থপূর্ণভাবে বলল,' আর নিভাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

নিভা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'না, না, আমি যাব না।'

পরেশ ধমক দিয়ে উঠল, 'আলবৎ যাবে! আলবৎ যাবে। ওর বাপ যাবে আর ও যাবে না? চঞ্চল মনে থাকে যেন পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব—'

'আচ্ছা, কাকাবাবু, চঞ্চল বলল, এখন আসি, কাকীমা। আপনি নিভাকেও সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।'

হৈম বলল, 'না, না, বাবা। ভুলব কেন?'

চঞ্চল নিভার দিকে একটু বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ হেনে বেরিয়ে গেল। পরেশ আর হৈম সন্তুষ্ট হয়ে তার গতিপথের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু নিভা নিঃসহায়ের মতো মাথায় হাত দিয়ে তক্তপোশের ওপর বসে পড়ল। তার দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, 'না, না, আমি কক্ষণও যাব না।'

সে হঠাৎ ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল, যেন বিষাক্ত হাওয়া থেকে বেরিয়ে দম নেবার জন্যে।

ছোট্ট মিছিলটা এগিয়ে যাচ্ছিল থানার দিকে। লোক খুব বেশি ছিল না, শ'দেড়েক হবে। তার মধ্যে কিছু স্ত্রীলোক কিছু ছোট ছেলে। তারা দু'জন দু'জন করে চলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু অনেকেই পারছিল না। দু'এক জন স্বেচ্ছাসেবক লাইন ঠিক করে দেবার চেষ্টা করছিল। ওদের শ্লোগান বৈপ্লবিক নয়। ওরা চিৎকার করে বলছিল, 'কালোবাজারী রুখতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে', 'সস্তা দরে রেশন চাই পেটভরে ভাত খেতে চাই।' মিছিলের পুরোভাগে যারা ছিল, তাদের মধ্যে বিনয়ই মাতব্বর। পাড়ার ছেলেরা এসে ধরল, 'দাদা, একটা কিছু করা চাই। চোখের ওপর কালোবাজারী আর সহ্য হয় না।' বিনয় ওদের কথায় সায় দিয়েছিল। ওরা খুশি হয়ে বলল, 'আপনি দাদা পরিচিত লেখক। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন থানায় বিক্ষোভ জানাব। আপনি গেলে আমাদের ওজন বাড়বে।' বিনয় প্রথমটা রাজী হয় নি। সে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে থাকতে চায়। কিন্তু ছেলেদের এ আবদার সে এড়াতে পারল না। ছেলেরা তখন চেপে ধরল, 'আপনি তাহলে আমাদের হয়ে আবেদন লিখে দিন। এক কপি সরকারকে পাঠাতে হবে, আর এক কপি দারোগার হাতে দেব। ওরা সত্যি কিছু করছে না। রেশনের দোকানে নিয়মিত চাল মেলে না অথচ পথে ঢেলে চাল বিক্রি হচ্ছে। নিশ্চয় পুলিশের সঙ্গে যোগসাজস আছে। নইলে এত চাল আসে কোত্থেকে?'

বিনয় ফলাও করে একটা আবেদন লিখেছিল।

সেদিন বিনয় মিছিলের সামনে চলেছিল, হঠাৎ দূর থেকে চোখ পড়ল নিভার দিকে। নিভা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মিছিলটা দেখছিল। বিনয় ডাকল, 'আসুন না, মিছিলে যোগ দিন।' নিভা ইতস্ততঃ করছিল। ছেলের দলের কেউ কেউ বলল, 'আসুন না দিদি, মিছিলে যোগ দিন, এ ত আপনাদেরই মিছিল।'

নিভা আর সরে থাকতে পারল না। সে মেয়েদের কাছাকাছি গিয়ে মিছিলে ভিড়ে পড়ল। বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়েছিল নিভা, মনের বোঝা তখন থেকে হালকা করতে পারছিল না, কিন্তু মিছিলে নিজেকে মিলিয়ে দিতেই কোথায় সরে পড়ল তার ব্যক্তিগত সমস্যা? অন্য সকলের সঙ্গে সেও চিৎকার করতে লাগল, 'কালোবাজারী রুখতে হবে।'

একটু পরে বিনয় লাইন ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিভা কাছাকাছি আসতে চুপি চুপি বলল, 'এইমাত্র খবর পেলুম, আজ একটা গোলমাল হবে।'

'কি রকম? পুলিসে মারধর করবে নাকি?'

'সত্য তা ঠিক বলতে পারল না. তবে সে শুনেছে আজ একটা কিছু হবে। কাত্তিক সা'র গুণ্ডার দল আজ মিছিল ভেঙ্গে দেবে।'

'কেন, তাদের রাগ কিসের?'

'বাঃ, আপনি কিছুই জানেন না? ওদের রোজগারে হাত পড়বে যে! এই যে যারা কালোবাজারে চাল বেচছে, কতজনকে তাদের বখরা দিতে হয় তা জানেন?'

'আমি আর কি করে জানব?'

'দেখুন, আমিই আপনাকে মিছিলে ডেকে আনলুম। আমার ত একটা দাযিত্ব আছে। যদি গোলমাল হয় ত আপনি বিপদে পড়বেন। তার চেয়ে যদি—'

'আপনি আমায় চলে যেতে বলছেন? কেন বলুন ত? এতগুলি লোকের চেয়ে আমার প্রাণ কি বেশি মূল্যবান্?'

'তাহলে আপনি যাবেন না?'

'না।'

'আমায় দোষ দেবেন না কিন্তু।'

'সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

মিছিল এগিয়ে চলল। বিনয় আবার পুরোভাগে। থানার কাছাকাছি মিছিলটা আসতেই, যা আশঙ্কা করেছিল বিনয়, তাই ঘটল। এপাশ ওপাশ থেকে ধাঁই ধাঁই করে ইট পড়তে লাগল। শোরগোল, চিৎকার। দুমদাম করে আশেপাশের দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা অনেকে আর্তনাদ করে উঠল। মিছিল ছত্রভঙ্গ। মিছিলের কয়েকটা ছেলে ইটপাটকেল যা হাতের কাছে পেল ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু শত্রু কোথায়? কারুর গায়ে ত চিহ্ন নেই শত্রুপক্ষের। এলোপাতাড়ি ইষ্টকবৃষ্টিতে জায়গাটা রণক্ষেত্র হয়ে উঠল। এদিক-ওদিক শার্সি শো-কেসের কাচ ভাঙল, দু'চার জন বোধ হয় আহত হল। এমন সময় পুলিশের আবির্ভাব।

পুলিশ দেখে এপাশের ভিড় যেন একটু পাতলা হল। আশপাশের গলি থেকে ইট পড়তে লাগল। একজন পুলিশ আঘাত পেয়ে বসে পড়ল। পুলিশবাহিনী মরিয়া হয়ে তেড়ে এল। যাকে সামনে পেল তাকে বেটন পেটা করল। বিনয় আগেই দাঁড়িয়েছিল, সে পালায়নি, তাকে সামনে পেয়ে পুলিস এক ঘা বসিয়ে দিল। তার হাতের প্রতিবাদ লিপিটা খসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, হাওয়ায় সেটা উড়ে গিয়ে পাশের নর্দমার জলে ভাসতে লাগল। বিনয় হাতের যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে গেল। বিনয়কে পড়ে যেতে দেখে ভাঙ্গা মিছিলের ছেলেরা দ্বিগুণ উৎসাহে ইট ছুঁড়তে লাগল। আবার দু'চার জন পুলিস ইটের আঘাতে ঘায়েল হল। একজন সাব-ইন্‌সপেক্টরের কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। তারপর দুম দুম করে কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফেটে পড়তে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। বিনয়ের হাতে যন্ত্রণা. তার

ওপর চোখ জ্বালা। সে কোনবকমে কষ্টেসৃষ্টে পাশেব একটা সরু গলিতে আশ্রয় নিয়েছে।

এতক্ষণে নিভার কথা তার মনে পড়ল। কোথায় গেল মেয়েটি? অভিভাবকের মতো সে চিন্তিত হয়ে উঠল। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে সে সরু গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়ল। ওদিকটা এখন শান্ত, রণক্লান্ত। এদিক-ওদিক কিছু লোক জটলা করে ছিল। একটা পুলিশ ভ্যান গর্জন করে বেরিয়ে গেল। পথের বেশ খানিকটা ইটের গুঁড়োয় লাল হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো টুকরো, কোথাও আবার কাচের গুঁড়ো। বিনয় নিভাকে দেখতে পেল না।

হঠাৎ নারীকণ্ঠে কে যেন ডাকল, 'বিনয়বাবু, বিনয়বাবু,—এই যে, এদিকে।'

বিনয় দেখল নিভা পথিপার্শ্বে টিউবওয়েলের হাতলটা ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে নাড়ছে, আর কিছু ছেলেমেয়ে জল চোখে-মুখে দিচ্ছে।

নিভা বলল, 'আসুন, চোখ জ্বলে গেল টিয়ার গ্যাসে। আপনি চোখে জলের ঝাপটা দিন।'

মন্দ বলেনি মেয়েটি। বিনয় এগিয়ে গেল। এক হাতে তখন যন্ত্রণা হচ্ছিল, সে অন্য হাতে আঁজলা করে জল দিল চোখে-মুখে।

নিভা বলল, 'দু'হাত ভরে দিন।'

'কি করে দেব? এ হাতে লেগেছে বেশ!'

'তাই নাকি? আহা, আচ্ছা, আমি দিচ্ছি আপনার চোখে জলের ঝাপটা। বিপিন ভাই, তুমি একটু জল তুলে দাও ত।'

বিপিন নামে ছেলেটি হাতল নাড়তে লাগল।

নিভা দু'হাতে আঁজলা ভরে জল দিতে লাগল বিনয়ের মুখে-চোখে। নিভার চোখে তখন অপূর্ব দীপ্তি। এমনিতেই চোখ দুটি রোদনরত ছিল।

বিনয় বলল। 'থাক, হয়েছে।'

নিভা জিজ্ঞাসা করল, 'হাতে লাগল কোথায়?'

বিনয় দেখাল। নিভা জিজ্ঞাসা করল, 'ভাঙ্গে টাঙ্গেনি ত?'

'কি জানি? বোধহয় না।'

'চলুন ডাক্তারের কাছে।'

'ফি দেবার পয়সা নেই।'

'হাসপাতালে চলুন।'

'দরকার হবে না। মনে হয় না, তেমন কিছু হলে এতক্ষণে আরও কষ্ট হ'ত।'

'তবে বাড়ি চলুন, আপনার হাতে চুন হলুদ লাগিয়ে দি। টোটকা ওষুধ। অব্যর্থ। স্কুলে আছাড় খেয়ে ব্যথা হলে মা কত সময় লাগিয়ে দিত।'

চার

পরদিন কথা হচ্ছিল বিনয়ের ঘরে।

বিনয় বলল, 'দেখুন বারবার এত করে কৃতজ্ঞতা জানালে আমি লজ্জা পাই।'

নিভা বলল, 'সত্যি আপনার ঋণ শোধ করবার নয়। সেদিন আপনার মুখের ভাত কেড়ে নিলুম, এখনও তার দাম দিতে পারলুম না। আপনার কাছে মুখ দেখাতে আমার সংকোচ হয়।'

'না, না, এতে সংকোচের কি আছে? বিপদের সময় মানুষ কি মানুষের কাছে সাহায্য নেয় না? এই যে, কাল যে কাণ্ডটা হল। আপনি এগিয়ে এসে আমার হাতের সেবা করলেন, নইলে যন্ত্রণা কত বেড়ে যেত।'

'এ আর আমি কি করেছি?' নিভা বলল।

'আমারও ঐ একই কথা। আপনারা যে বিপদের মধ্যে পড়েছেন, তা দেখে সত্যি আমার কষ্ট হয়। কত সময় ভাবি এগিয়ে গিয়ে আপনাদের কাজে লাগি, কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না, জানেন, আমি বড়ো গরীব।'

'সে কথা আমায় কেন বলছেন?'

'সত্যি বিশ্বাস করুন। সব দিন আমারও আহার জোটে না। বই লিখে এদেশে টাকা রোজগার করা শক্ত, বিশেষ করে আমাদের মতো লেখকের পক্ষে।'

নিভা বলল, 'আপনার লেখা আমি দেখেছি মাসিকপত্রে।'

'সত্যি! দেখেছেন? পড়ে দেখেছেন? কেমন লাগে আপনার?'

'বেশ ভাল।'

'সত্যি, ভাল লাগে? না—না, আমার সামনে বলছেন, আসলে হয়ত—'

'সত্যি বলছি ভাল লাগে। কিন্তু আপনি বড় করুণ লেখেন। ট্র্যাজেডি।'

'কি করি বলুন! কলম দিয়ে হাসির কথা বার হয় না। কত সময় নিজের জীবনের কথাই কালির আঁচড়ে ফুটে ওঠে।'

'আপনার জীবনের কাহিনী কি খুব করুণ?'

'নয় ত কি! ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ি মানুষ হলুম, মারধোর, গালাগালি, অর্ধেক দিন অনাহার, পালিয়ে এলুম। এখানে সেখানে টুকিটাকি কাজ করে লেখাপড়া শিখলুম, পাসও করলুম। লেখার নেশায় পেয়ে বসল, ভাবলুম সমাজকে পালটে দিতে হবে। যারা সমাজের ওপরে বসে সমাজসেবীর ভেক ধরে নিজেদের

স্বার্থ চরিতার্থ করছে তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। কিন্তু এসব লেখা ছাপে ক'জন? এসব বই লিখলে বিক্রিই বা কটা হয়? আমার অবস্থা দেখে এমন কি আত্মীয়-স্বজনেরাও সব ত্যাগ করেছে।'

'আপনি তাহলে এখন একা?'

'হ্যাঁ, বেশ আছি। কোন বন্ধন নেই। নিজের ব্যাপারে আজকের দিনটা নিয়েই থাকি, কাল কি হবে সে জন্যে মাথা ঘামাই না। দেখেছেন আমার কাণ্ড!'

'কি হল?'

'দেখছেন না, আমি শুধু নিজের কথাই বলে চলেছি। আপনি যে অতিথি, শুধু অতিথি নয়, নার্স, আপনার অভ্যর্থনা দরকার, সে কথা ভুলেই গেছি। কি খাবেন বলুন, চা?'

'চা? আচ্ছা।'

'ঐ যাঃ চা ত নেই, ফুরিয়ে গেছে। মুড়ি আছে, মুড়ি খাবেন?'

'বেশ ত দিন না।'

'দেখুন হয়ত মিইয়ে গেছে।'

বিনয় একটা টিনের কৌটো থেকে মুড়ি বার করে দিল। নিভা একমুঠো চিবিয়ে বলল, 'না, এখনও মিইয়ে যায়নি।'

মুড়ি খেতে খেতে নিভা বিনয়ের ঘরটা ভাল করে দেখতে লাগল। যদিও একই বাড়িতে ওদের বাস, বিনয়ের ঘরটা বাড়ির বাইরের দিকে। আসতে যেতে সে ঘরটা দেখেছিল, কিন্তু কোনও দিন ভেতরে ঢোকেনি। ছোট্ট ঘর। মেরামতের অভাবে চুনবালি খসে পড়েছিল। তার মধ্যে নড়বড়ে তক্তাপোষ, টিনের সস্তা র‍্যাক। দেয়ালে টাঙ্গানো আলনা, আয়না। গোটাদুয়েক বাক্স তোরঙ্গ। একটা সস্তা টেবিল আর চেয়ার, বেত-ছেঁড়া মোড়া। সর্বত্র একটা অগোছাল ভাব।

নিভা চারিদিক দেখে বলল, 'এই তাহলে আপনার ঘর?'

বিনয় হেসে বলল, 'হাঁ আমার হোল্ড্ অল্। এটা একাধারে বৈঠকখানা, পড়ার ঘর, শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর।'

নিভা ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'রান্নাঘর? মানে—?'

'ওঃ, আমার গুণের কথা আপনাকে সব খুলে বলিনি। জানেন, আমি হলুম জ্যাক অফ্ অল ট্রেডস্।'

'অর্থাৎ?'

'ঐ যে দেখছেন তক্তাপোষের তলায় বাসনকোসন, স্টোভ। ঐ দিয়ে আমি নিজের হাতে রাঁধি। সস্তা হয়। পয়সাও বাঁচে।'

'বা রে, তাহলে আপনার হাতের রান্না একদিন খেয়ে দেখতে হবে ত!'

'তবেই হয়েছে! সে আর মুখে তুলতে পারবেন না। এতদিন রাঁধছি, নুন বেশি হয় ত মসলা হয় না, মসলা হয় ত নুন দিতে ভুলে যাই।

'কিছু যদি মনে না করেন ত আমি আপনার জন্যে রেঁধে দিতে পারি। গেরস্ত ঘরের মেয়ে, ঐ জিনিসটাই ভাল করে শিখেছি।' বলতে বলতে নিভার মুখটা যেন ঈষৎ লাল হয়ে গেল।

নিভার এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে বিনয় খুশী হল। সে ভাবতেই পারেনি যে অনাত্মীয় এই মেয়েটি এমন একটা কাজের প্রস্তাব করবে। সে সানন্দে বলল, 'দেবেন রেঁধে? খুব ভাল কথা! কিন্তু সময় পাবেন ত? আপনার মা-বাবা রাগ করবেন না ত?'

নিভা বলল, 'না না, ওঁরা কিছু বলবেন না।'

'সত্যি, এবার ত আমার ডবল করে ধন্যবাদ জানাবার পালা। তবে আমার জন্যে আপনাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন আমার স্টোভে আগুন জ্বলে না। পয়সা জোটে না—তাই।'

অপ্রিয় কথা এড়াবার জন্যে নিভা টিনের র‍্যাকে বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে প্রশ্ন করল, 'এগুলো বুঝি আপনার বই?'

'হ্যাঁ, সুবিধে হলেই সস্তায় পুরানো বই কিনি।'

'আমায় পড়তে দেবেন? আবার ফিরিয়ে দেব।'

'নিশ্চয়।'

'আমার পড়ার খুব ঝোঁক ছিল। কলেজে যেতুম, মাইনে দিতে না পারায় এক বছর কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।'

'ও, আপনি যত খুশি এখান থেকে বই নিয়ে যেতে পারেন।'

নিভা বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল, 'ইস্ বেজায় ধুলো। এসব ঝাড়েন না কেন?'

'কে এসব করে?'

'আমিই পরিস্কার করে দিচ্ছি।' এই বলে নিভা নিজের আঁচল দিয়ে বই ঝাড়তে লাগল।

বিনয় বারণ করল, 'আহা হা, করেন কি? কাপড়টা যে ধুলোয় ময়লা হল।'

নিভা বলল, 'হোকগে, তাতে আর কি হয়েছে? বই আমার খুব ভাল লাগে।'

বই খুব বেশী ছিল না। পরিষ্কার করে গোছাতে নিভার বেশিক্ষণ সময় লাগল না। বিনয় তারিফ করে বলল, 'দেখেছেন আপনার হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘরটা যেন নিমেষে হেসে উঠল। লক্ষ্মী না হলে লক্ষ্মীশ্রী আসে কোত্থেকে বলুন।'

বিনয়ের সরল স্তুতিতে নিভা অকস্মাৎ রক্তিম হয়ে উঠল। সে টেবিল থেকে

কলম তুলে নিয়ে বলল, 'ইস্ নিবটায় এত কালি জমে আছে। এ দিয়ে লেখেন কেমন করে?'

বিনয় মাথা চুলকে বলল, 'ক'দিন লেখা হচ্ছে না। কাগজের যা দাম হয়েছে। কিনতে পয়সা নেই অথচ না লিখলেও টাকা জুটবে না। এদিকে নন্দবাবু ভাড়ার জন্যে খেয়ে ফেলছেন।'

বাড়িওয়ালার নাম করতেই নিভা যেন দপ করে জ্বলে উঠল। লোকটাকে তার মোটেই পছন্দ হয় না। সে এমন নির্লজ্জের মতো চোখ পাকিয়ে নিভাকে দেখে, যেন গিলতে আসছে। আবার টাকার জন্যে বিরামহীন তাগিদ। হাড়-কঞ্জুস। নিভা বিরক্ত হয়ে বলল, 'লোকটা অর্থপিশাচ।'

বিনয় নন্দবাবুর পক্ষ নিয়ে বলল, 'ওঁরই বা দোষ দিই কি করে বলুন। ওঁর ঘর দখল করে বসে আছি, ভাড়া না দিলে ওঁর চলে কি করে?'

'আপনি বলতে চান এসব ঘরের ন্যায্য ভাড়া আপনি দেন?'

'ভাড়া হয় ত একটু বেশী। বাড়তি ভাগ হল আসল ভাড়ার সুদ। আমরা ক'জন ঠিক সময়ে ভাড়া দিই বলুন ত?'

এবার নিভা হেসে ফেলল, বলল, 'নন্দবাবু আপনাকে উকিল রেখেছেন বুঝি?'

বিনয় বলল, 'তাহলে উনি নির্ঘাৎ হারবেন। যাই বলুন লোকটা মন্দ নয়। টাকাকড়ির ব্যাপারে কঞ্জুস হলেও, অন্যান্য ব্যাপারে দারুণ বোকা। ওঁকে নাচাতে আমার ভারী ভাল লাগে।'

'কি রকম?'

'ধরুন, যদি বলি নন্দবাবু, আপনাকে হীরো করে গল্প লিখেছি, উনি আনন্দে ফেটে পড়েন। সেদিন ভাড়া চাইতে ভুলে যান। বলেন, সত্যি ভায়া? ছাপান হলে দিও। গিন্নীকে দেখাব। গল্পের হীরো হবার আশ্বাস পেয়ে হয়ত আমায় এক কাপ চা খাইয়েই দিলেন।'

'সত্যি! ভারী মজার ত!' নিভা বলল, 'কিন্তু দেখলে ত মনে হয় না। আমার ধারণা উনি বেজায় খিটখিটে।'

বিনয় বিজ্ঞের মত বলল, 'বাইরেটা দেখে কজন মানুষকে চেনা যায় বলুন।'

হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল নন্দ নন্দী। খুব রাগত কণ্ঠে বলল, 'এসব চলবে না, এসব চলবে না।'

বিনয় বিস্ময়ে বলল, 'কি সব চলবে না, নন্দবাবু?'

'শেষে বাড়ির দুর্নাম হবে, ভাড়াটে জুটবে না।' নন্দর রাগ আরও চড়ে গেল।

বিনয় আশ্বাস দিয়ে প্রশ্ন করল, 'হল কি? আপনি এত ক্ষেপে উঠলেন কেন?'

'ক্ষেপব না, আলবৎ ক্ষেপব। আমার বাড়িতে এসব চলবে না।'

'কি চলবে না, তাই বলুন।'

'আধ ঘণ্টা! গিন্নী বললে, আধ ঘণ্টা হল সেই যে ঘরে ঢুকেছে, দরজা বন্ধ করেছে, আর বেরোবার নাম নেই?'

'কে কার ঘরে ঢুকল?' বিনয় প্রশ্ন করল।

'তোমার ঘরে, আবার কার ঘরে?' নন্দ বিরক্ত হয়ে নিভার দিকে কটমট করে চাইল, তারপর বলল, 'আধ ঘণ্টা ধরে দরজা বন্ধ করে গুজুর গুজুর। তারপর একটা কেলেঙ্কারি হোক্, শেষে ভাড়াটে জুটবে না।'

নিভা স্পষ্ট অভিযোগে রেগে উঠল, 'নন্দবাবু, কি বলছেন যা তা?'

'হক কথা বলছি, বুঝলে, হক কথা বলছি। তোমরা সব একেলে মেয়ে। কেলেঙ্কারিকে থোড়াই কেয়ার কর, কিন্তু আমরা ভয় পাই।'

নিভা বিরক্ত হয়ে বলল, 'বিনয়বাবু, আমি যাই।'

বিনয় চুপি চুপি নিভাকে বলল, 'দাঁড়ান না, রাগ করছেন কেন? বুড়োকে নিয়ে একটু মজা করা যাক্।'

'ইস্, সাহস দেখ!' নন্দ গর্জে উঠল, 'আমারই সামনে ফিসফিস করে কথা হচ্ছে! গিন্নী ত তাহলে ঠিক বলেছে। বলি ওহে ছোকরা, কানে কানে কি কথা হচ্ছে?'

বিনয় ভান করে বলল, 'শুনলে আপনি নিশ্চয় রাগ করবেন।'

'শুনব, আমি নিশ্চয় শুনব। বল কি কথা হচ্ছিল।'

'বলব? কিন্তু আপনি রাগ করবেন না ত?'

'সে কথা পরে হবে। এখন বল শীগগির, নইলে—'

'আসুন, কানে কানে বলব।'

'বল'। নন্দ কান বাড়িয়ে দিল। বিনয় চুপি চুপি নকল গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'উনি বলছিলেন বিয়ে যদি করতে হয় ত আপনার মতো লোককেই করা উচিত।'

নন্দ তাজ্জব হল! বিনয় বলে কি? সে বিনয়ের কানে কানে বলল, 'বিয়ে?' মানে— আমার মতো—'

'হ্যাঁ আপনার মতো—আপনার কি বা বয়েস, আর কি তাজা শরীর! এ বয়সে একটা কেন, দশটা মেয়েকে বিয়ে করা যায়।'

'যাঃ—,' নন্দ পুলকিত হল, 'সত্যি সত্যি?'

'আলবৎ সত্যি! উনি বলছিলেন—'

'কি— কি বলছিলেন?' নন্দর শিশুসুলভ আনন্দ।

'বলছিলেন, আপনার গিন্নী আপনাকে যত্ন করে না। দিনরাত পাড়া কাঁপিয়ে কেবল বকেন, ওঁর ভারী কষ্ট হয়।'

নন্দর পারিবারিক অশান্তি ফাঁস হয়ে গিয়েছে। দোষটা গৃহিণীর ওপর পড়ায় সে আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'তা যা বলেছ, তা যা বলেছ।'

বিনয় আর এক ধাপ মিথ্যা রঙ চড়াল, বলল, 'উনি বলছিলেন, উনি আপনাকে ভালবাসেন।'

নিজের কানকে নন্দ বিশ্বাস করতে চাইল না। এতদিন কত লুব্ধ দৃষ্টিতে সোমত্ত মেয়েটিকে সে দেখেছে। প্রকাশ্যে গোপনে। কত কামনার সুড়সুড়ি এই পৌঢ় বয়সেও তাকে উত্তপ্ত করে তুলেছে, আর কিনা যুবতী মেয়েটি নবযুবককে ছেড়ে নন্দর প্রতি আসক্ত। সে বিনয়ের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'ভালবাসেন? এ্যাঁ বল কি? আমায় 'লব' করেন?'

'হাঁ, হাঁ।'

নিভা এতক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল। সে জানতে চাইল, 'আপনারা কি বলাবলি করছেন?'

বিনয় গম্ভীরভাবে বলল, 'সে আপনি পরে শুনবেন।'

নিভা বলল, 'আচ্ছা, আমি এখন তাহলে যাই। কাজ আছে।' নিভা চলে গেল।

নন্দ নন্দী তার দিকে লুব্ধভাবে চেয়ে বলল, 'চলে গেল? আহা আহা, খাসা মেয়ে! যেন ডানাকাটা পরী! কী বললে তোমায়? আমায় 'লব্' করে?'

বিনয় বলল, 'হাঁ, দেখলেন না—লজ্জায় আপনার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।'

'তাই ত! বিনয়, ঠিক বলেছ। আহা, খাসা মেয়ে! কিন্তু বিনয়, আমায় ত মুসকিলে ফেললে ভায়া। আমি ত জানি না আজকালকার 'লব্'। কেমন ক'রে করে?'

'সে অতি সহজ। আমি শিখিয়ে দেব আপনাকে।'

'তা বেশ, তা বেশ। আচ্ছা, কি করে ভায়া 'লব্' করে?'

বিনয় নন্দ নন্দীকে নিয়ে মজা করতে লাগল। সে বলল, 'চকোলেট খাওয়াতে হয়, মোটরে নিয়ে বেড়াতে হয়, সিনেমা দেখাতে হয়।'

ফর্দটা মনঃপুত হল না নন্দর, সে বলল, 'তাতে অনেক পয়সা খরচ হয়?'

'না, এমন আর কি বেশী?'

'সত্যি? বেশী খরচ হয় না? বিনয় তুমি বড় ভাল ছেলে। গিন্নীর কথায় আজ তোমাদের অনেক কুকথা শোনালুম। কিছু মনে কর না ভায়া।'

'না, না, মনে আবার করব কি?'

নন্দ কিছু আশ্বস্ত হল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যুবতী প্রেমিকা ক্ষুণ্ণ হয়নি ত। সে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, উনি কিছু মনে করলেন না ত?'

বিনয় চিন্তার ভান করে বলল, "তা কেমন করে বলি? আবার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা

করতে হবে। কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথা বললে, আপনার গিন্নী আমার ওপর আবার রাগ করবেন না ত?'

'না, না, তুমি যত পার কথা কও, বিনয়। আমি গিন্নীকে ঠাণ্ডা করবো! হ্যাঁ দেখ বিনয়, 'লব্' করতে কত খরচ হয়, তার যদি একটা ফর্দ করে দাও তবে বড় ভাল হয়।'

'নিশ্চয়। সেজন্য ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'দেবে? খুব ভাল খুব ভাল। হাঁ, দেখ, তোমার বাকি ভাড়াটা পরে দিলেও চলবে। ও জন্যে তাড়া নেই, বুঝলে?'

নন্দবাবু চলে যেতে বিনয় প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

একটা সরকারী বাগানের রেলিং-এ ছেঁড়া চট টাঙ্গিয়ে তাঁবুর মতো করে নিয়েছে সহায়রাম। একটু আব্রু ত চাই। সে নিজে না হয় ফুটপাথে আকাশের নীচে শোবে, কিন্তু বৌ সদু আর ছেলে মনু কেমন করে খোলা জায়গায় থাকে। গাঁয়ে আকাল পড়ল। জমি ফেটে চৌচির। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। ক্ষেতমজুরের কাজ জোটে না। কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত না গিললে পেট ভরে না। গরীবের জন্যে নুন ভাত ছাড়া আর জোটে কি? ক'দিন মুগকলাই সেদ্ধ করে খেল। তাও বাড়ন্ত। দলে দলে গরীব লোক সব শহরে চলে আসছিল। সহায়রামও সপরিবারে চলে এল। গাঁয়ের মায়া আর কি? ভিটে বলতে ত পরের জমির ওপর ছাদফুটো মাটির ঘর। তাই অনেক আশা নিয়ে শহরের দিকে ছুটে এল। কিন্তু এখানেও দেখল হাহাকার। অবশ্য বড়লোকদের জন্যে নয়, যাদের পয়সা আছে তাদের জন্যে নয়। এখানে দু চার পয়সা ভিক্ষে যদি বা মেলে ত চাল মেলে না। অথচ গলির মুখে রাস্তায় ঢেলে ঢেলে চাল অজস্র বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু ছোঁয় কার সাধ্যি? যা আকাশছোঁয়া দাম! তবু পেটের জ্বালায় ঐ বেশী দাম দিয়ে কম চালই কিনতে হয় ভিক্ষের টাকায়। তাতে পেটের জ্বলুনি কমে না।

সদুর মুখ দিয়ে আজকাল চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বেরিয়েছে। ঘরের বৌ বলে কি না, 'ঘোমটা দিয়ে ভিক্ষে মাগলে পয়সা জুটবেনি। দেখনি রাস্তার মোড়ে ঐ মেয়েছেলেটা বাচ্চা শুইয়ে ভিক্ষে মাগে কিন্তু ঘোমটার ফাঁকে তার মুখটা দেখা যায়, ছেঁড়া কাপড়ের মাঝখান থেকে বুকটাও। টপাটপ পয়সা পড়ে কাঁসির ওপর।'

'আ মর,' সহায়রাম বলে, 'ওরা হল পেশাদার ভিখারী। আমরা কি তাই? আমি চাষার পো, নেহাত পেটের দায়ে ভিক্ষে করতে এসেছি। আকাল ফুরুলে আবার গাঁয়ে ফিরে যাব। এই শহরে মনিষ্যি থাকে?'

একটা গাড়িবারান্দার তলায় সহায়রাম ক'দিন ছেলে-বৌকে নিয়ে রাত কাটাত।

কিন্তু রাত কি আর কাটতে চাইত? ঐ বারান্দার তলায় আরও কত লোক শুতে আসত। ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা, ছোটোখাটো দোকানদার। ঘুমের ঘোরে সদুর গায়ের কাপড় সরে যেত, আর লোকগুলো যেন প্যাট প্যাট করে গিলতে আসত। সহায়রাম নিজের হাতে কাপড় দিয়ে বৌ-এর বুক ঢেকে দিত। একটু আব্রু না হলে চলে?

তাই সহায় একটু আব্রু করেছিল, ঐ চট টাঙ্গিয়ে। অল্প জায়গা, তবু লজ্জা শরম কিছুটা বাঁচান যায়। ওর মধ্যেই দু'চারখানা মাটির বাসন, তোবড়ান গেলাস, ভাঙ্গা কুঁজো যোগাড় করে সহায়রাম সদুকে নিয়ে ঘরকন্না পেতেছিল। দুটো ইট রেখে ফেলে দেওয়া ঝুড়ির কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সদু রেঁধে দিত। দু'চার দিন কাটল মন্দ না।

কিন্তু বিপদ হল সদুকে নিয়ে। ও যেন কেমন বদলে যাচ্ছিল শহরের ছোঁয়াচ লেগে। সেদিন ওরা একটা গলিতে ভিক্ষে করতে ঢুকেছিল। দিনের বেলায় দেখে অনেকগুলো মেয়েছেলে সেজেগুজে দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পথ দিয়ে যে সব লোক ভাল জামাকাপড় পরে যাচ্ছে, তাদের দিকে লক্ষ্য করে হাসি ঠাট্টা করছে। সদু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখছিল। সহায়রাম ধমক দিয়ে উঠল, 'চল্, মনুর মা, এখান থেকে পালিয়ে চল্।'

'কেন?' সদু জানতে চাইল।

'ওরা সব নষ্ট মেয়েছেলে। দিনের বেলায় দাঁড়িয়ে নাগর ধরতিছে। পালা, পালা, এই পাপ রাস্তা থেকে।'

সদু কিন্তু বারবার দেখছিল, কেমন সাজগোজ করেছিল মেয়েছেলেরা। কি সুন্দর রঙীন শাড়ি, হাওয়ার মতো, ভিতরের জামা আর সায়া দেখা যাচ্ছিল, ঠোঁটে গালে আলতা, কপালে টিপ, চুল এলিয়ে পড়েছে এক ঝাঁক।

সদু স্বামীর পিছু পিছু চলে এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ বলে ফেলেছিল, 'আমার কিন্তুক অমন একটুক শাড়ি পরতি বাসনা হয়।'

'চুপ কর্, হারামজাদি,' সহায়রাম ধমক দিয়েছিল, 'ওসব নোংরা কথা বলবি নে। মেরে মুখ ভেঙ্গে দেব।'

'ইস, মার নি দেখি। মারলেই হল?' সদু মুখ ঝামটা দিল, 'ভাত দেবার মুরদ নি, কিল মারবার গোঁসাই! এ্যাই মনু হতচ্ছাড়া ছেলে, মেঠাই-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? চলে আয়, হতচ্ছাড়া।'

সদু মনুটাকে চটাস চটাস করে চড়িয়ে দিল। সে কেঁদে উঠল। সহায়রাম তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'না বাপ, কেঁদ নি কেঁদ নি।'

সেদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ অল্পই হল।

ছয়

চঞ্চল তার বাগানবাড়ির বৈঠকখানায় ছটফট করছিল। একবার সে ঘড়ি দেখছিল, আবার জানলা দিয়ে বাইরে লক্ষ্য করছিল, একবার সোফায় বসছিল, আবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

সেকেলে বাড়ি ঘর, পুরানো ধরনের আসবাব পত্রে সাজান। মেহগনি কাঠের তৈরী ঢাউস সোফা, মারবেলটপ টেবিল, গদিওয়ালা চেয়ার, কারুকার্য করা সোনালী ফ্রেমে বাঁধান বড় বড় আয়না, দেয়াল আলমারি, পোর্সিলেনের ফ্লাওয়ার বোল, পিতলের ভারী ফুলদানি, দেওয়ালে দেওয়ালে মেমসাহেবের নগ্ন চিত্রের সুরঞ্জিত প্রিণ্ট্—সমস্ত কিছু যেন বিগত দিনের বিলাস বৈভবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। ঘরের মধ্যে পুরু গদিওয়ালা একটি বিরাট খাট। বেমানান হলেও ইঙ্গবঙ্গ সংস্কৃতির অসম-সহাবস্থানের পরিচায়ক কতকগুলি অত্যাধুনিক আর্ট বুক, বিবসনা নারীদেহের রঙীন চিত্র-সম্বলিত।

বাগানবাড়িটা—শুধু বাগানবাড়ি কেন, সমস্ত বিষয়-আশয় চঞ্চলের পুরুষানুক্রমিক। চঞ্চলের বাবার সরকারী খেতাব ছিল। একমাত্র পুত্র বিপথগামী দেখে তিনি একটি ট্রাস্টডিড্ করেন যাতে সম্পত্তিতে চঞ্চলের মাত্র জীবনস্বত্ব ছিল, তাও যদি সে বিবাহ করে। চঞ্চলের অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি তার পুত্র-পৌত্রেরা স্বত্বলাভ করবে, এই ছিল দলিলের শর্ত। চঞ্চল লিলিকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু পুত্র কেন কোন সন্তানই হয়নি। আর হবার সম্ভাবনাও নেই, বিখ্যাত চিকিৎসকেরা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছে যে চঞ্চলই সন্তানোৎপাদনে অক্ষম। এই রায় একদিকে তাকে আতঙ্কিত করেছিল, অন্যদিকে তার সাহস বাড়িয়েছিল। আতঙ্কের কারণ এই যে চঞ্চলের মৃত্যুর পর সম্পত্তি জনসেবায় ব্যয়িত হবে। আর সাহসের কারণ, গর্ভোৎপাদনের দুশ্চিন্তা না করেই সে অবাধে নারীসঙ্গ করতে পারবে। আতঙ্ক অবশ্য বেশিদিন তাকে পীড়িত করতে পারেনি, তার মৃত্যুর পর সম্পত্তির কি হবে সে নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। কিছু দানবিক্রির ক্ষমতা না থাকায় প্রাচুর্যের মধ্যেও চঞ্চল প্রায়ই অর্থকৃচ্ছ্রতায় ভুগত। কারণ তার বদখেয়ালীর খরচ দিন দিন বেড়ে চলেছিল।

তার স্ত্রী ধনীর কন্যা। লিলির নিজস্ব আয় ছিল। বরং অলঙ্কারাদি স্ত্রীধন ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হিসাবে নগদ অর্থের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা স্বামীর চেয়ে স্বচ্ছল ছিল বলা যেতে পারে।

চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে বিবসনা নারীদেহ চিত্র দেখতে লাগল। কিন্তু ঐ নিষ্প্রাণ সৌন্দর্য

তাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না। সে আবার ঘড়ি দেখল, আবার উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল। একটা পদশব্দ হতে সে দ্রুত দরজার কাছে এগিয়ে গেল। ঘরে ঢুকল হরিচরণ, চঞ্চলের বয়স্য, বহু দুষ্কার্যের গোপন সঙ্গী। হরিচরণের পোশাকে বনেদী-আনার ছাপ পরিস্ফুট। সাদা ধবধবে আদ্দি পাঞ্জাবী, নরুনপাড় কোঁচান ধুতি, কলপ লাগান চকচকে চুল মাথার মাঝখানে দু'ভাগ করা, মোম লাগান দীর্ঘ সরু গোঁফ, পায়ে চীনাবাড়ির পাম্পশু তাকে বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছিল।

চঞ্চল চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'সাড়ে বারোটা বেজে গেল, সুদর্শন সিং এখনও ওদের নিয়ে এল না কেন, হরিচরণ?'

হরিচরণ মিষ্টি হেসে হাত কচলে বলল, 'এখনি এসে পড়বে, স্যার। মেয়েদের কাণ্ড! সাজগোজ করতে কত সময় লাগে!'

'কথাটা ঠিক বলেছ, কিন্তু নিভা আবার কি সাজগোজ করবে? তার ভাল পোশাক-আশাক আছে নাকি? কতবার ভাল শাড়ি পেজেণ্ট করতে গেছি, কিছুতেই নেয় না।'

আপনার কথামত হীরামলের বাড়ি থেকে একটা সুন্দর বেনারসী শাড়ি নিভা-দেবীর জন্যে কিনে এনেছি। দেখবেন সেটা দেখে এত পছন্দ হবে যে আপনার সামনেই তিনি শাড়ি বদলে নেবেন।' বলতে বলতে হরিচরণের চোখ চকচক করে উঠল।

'তোমার আর সব বন্দোবস্ত ঠিক আছে ত?'

'আজ্ঞে স্যার, বিলকুল ঠিক।' সেজন্যে চিন্তা করবেন না।'

'দেখো কাজ হাসিল হয় যেন, ফ্যাসাদ না বাধে, শেষে থানা পুলিস হলে একটা কেলেঙ্কারি!'

'আপনি ভাবছেন কেন স্যার। ভদ্রলোকের মেয়েছেলে। থানা পুলিশ করতে সাহস হবে না।'

'বলা যায় না। এ মেয়েকে তুমি চেন না হরিচরণ, সেদিন মোটরে চিৎকার করে আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে দিল। এ বড় শক্ত মেয়ে। আর সেই জন্যেই ত ওকে পাবার জন্যে আমি এত ব্যস্ত হয়েছি।' চঞ্চলের কথার মধ্যে ব্যগ্র কামনা ফুটে বের হল।

হরিচরণ আশ্বাস দিল, 'আজ যা ফাঁদ পাতা হয়েছে, দেখবেন একেবারে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়বেন নিভাদেবী।'

'দেখো, আজ শেষরক্ষা হয় যেন।'

'নিশ্চয় হবে, আলবৎ হবে। হরিচরণের মতলব কখনও ভেস্তে গেছে, স্যার? চন্দনাদেবীর বেলায় আমার প্ল্যানই ত শেষ অবধি খাটল। বিমলা বৌঠানকে কে ভুলিয়ে এনেছিল এ বাগানবাড়িতে?' হরিচরণ গর্বিতকণ্ঠে বলল।

'তা ঠিক।' চঞ্চল বলল, 'আমি ত বিমলার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। কিন্তু এবারে

একটু মুশকিল আছে। নিভার সঙ্গে যে বাপ-মা আসছে।'

হরিচরণ প্রতিবাদ করল, 'মুশকিল কি? বলুন সুবিধে। লোকের কোন সন্দেহ হবে না।'

'কিন্তু মেয়েটাকে একলা পাব কি করে?'

'সে জন্যে চিন্তা করবেন না। কত্তাগিন্নীর সরবতে এমন ওষুধ মিশিয়ে দেব যে খেলেই তারা ঘুমিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু মেযেটা যদি চিৎকার করে?'

'ওই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা তিন চার ঘণ্টার আগে ভাঙ্গছে না।'

'তিন চার ঘণ্টা।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'কিন্তু ওরা ধরতে পারবেন না যে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল?'

'হরিচরণ অত কাঁচা কাজ করে না, স্যার।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। জানি তুমি খুব কাজের লোক।' চঞ্চল তারিফ করে বলল।

সেই সুযোগে হরিচরণ দাবি করল, 'আমার বকশিশটা?'

'বেশ ত, দিয়ে দেব। কত চাই?'

'পাঁচ হাজার।'

'পাঁচ হাজার! বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে হরিচরণ?'

'আর পুঁটি মাছের দর করবেন না স্যার। এ হল টাটকা তাজা, তেজী কুমারী। একেবারে তিন ঘণ্টার জন্যে আপনার কোলের ওপর তুলে দিচ্ছি। এ কাজে কত বিপদ্, সে ত আপনি জানেন স্যার।'

'কিন্তু হাতে অত টাকা নেই, হরিচরণ।'

'আপনি রাজামানুষ, গরীবকে ও কথায় লজ্জা দেবেন না, স্যার।'

'আমায় বিশ্বাস কর, অনুপমার ব্যাপারে অনেক টাকা বেরিয়ে গেল।'

'ও কথা বললে শুনছি না, স্যার। এই করেই গরীবের অন্ন' হরিচরণের কণ্ঠে দাবির জোর ছিল।

চঞ্চল এখনকার মতো অপ্রিয় আলোচনা এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল, 'আচ্ছা কাজ হাসিল হোক। তোমায় নিশ্চয় খুশি করে দেব! কিন্তু একটা বাজতে চলল, সুদর্শন সিং এখনও এল না কেন? কোথাও এ্যাকসিডেণ্ট বাধাল না ত?'

হরিচরণ ভরসা দিল, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, স্যার। ওঁরা এসে পড়লেন বলে।'

এমন সময় বাইরে মোটর কারের আওয়াজ হল। গাড়িটা মোরামের রাস্তার উপর এসে দাঁড়াল।

হরিচরণ তুড়ি মেরে বলল, 'দেখছেন স্যার, সুদর্শন ব্যাটা নাম করতে করতেই

এসে গেল। শালা অনেক দিন বাঁচবে।'

চঞ্চল সাগ্রহে বলল, 'চল, হরিচরণ। ওদের নিয়ে আসি।'

কিন্তু ওরা বাইরে যাবার আগেই বৈঠকখানা ঘরে ঢুকল লিলি, চঞ্চলের স্ত্রী। সুন্দর আনন কিন্তু ম্লান। তার চেহারায় একটা স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ফুটে বার হচ্ছিল।

অপ্রত্যাশিতভাবে লিলির উপস্থিতি চঞ্চলকে চমকে দিল। সে বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'একি, লিলি, তুমি এখানে?'

হরিচরণও একটু দমে গেল। সে অবাক্ হয়ে বলল বৌমণি!'

লিলি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমায় এই বাগানবাড়িতে আশা করনি, না? আমি রবাহুতের মতো তোমার নিমন্ত্রণে যোগ দিলুম।'

চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'হরিচরণ, সুদর্শন সিং কি তবে যায়নি?'

লিলিই জবাব দিল, 'না, আমিই তাকে যেতে বারণ করেছিলুম। আমিই তোমার গাড়ি নিয়ে বাগানবাড়িতে চলে এলুম।'

ওদের অলক্ষ্যে হরিচরণ ওখান থেকে সরে পড়ল। সে সুদর্শনের সঙ্গে মোটর নিয়ে পালিয়ে গেল বাগান থেকে।

চঞ্চল রাগতকণ্ঠে বলল, 'লিলি, তোমায় বারবার বলেছি, আমার কোন ব্যাপারে তুমি মাথা গলিও না। তবু তুমি শুনবে না।'

'তোমার ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে আসিনি। কিন্তু তুমি যে একটির পর একটি করে ভদ্রঘরের মেয়ের সর্বনাশ করবে, সে আমি কিছুতেই আর হতে দেব না।'

'বার বার এক কথা।' তোমার মুখে কি নতুন কথা নেই?'

'তোমার কুকাজেও ত কোন নতুনত্ব নেই। চন্দনা, অনুপমা, বিমলার তুমি সর্বনাশ করেছ। এখন নিভা হয়েছে তোমার শিকার। কিন্তু জেনে রাখ তোমার আশা সফল হবে না। আজ আর তারা আসছে না।'

ক্রুদ্ধ আক্রোশে চঞ্চল চাপা গর্জন করল, 'আমার ইচ্ছে করছে তোমায়—'

'কেটে ফেলি? তাহলে ত শান্তি পাই।'

'শোনো লিলি,' চঞ্চল একটু শান্ত হয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা খোলা কথাবার্তা হয়ে যাক্। তুমি কি চাও? আমি ত তোমায় স্বাধীনতা দিয়েছি। বলেছি তুমি যা ইচ্ছে তাই কর। আমি কোনদিন বাধা দেব না, কৈফিয়ৎ তলব করব না। শুধু তুমি আমায় মুক্তি দাও। আমায় জড়িও না।'

'তোমায় ত আমি জড়াতে চাই না।' লিলির স্বর ভারাক্রান্ত হল, 'আর জড়াতে চাইলেই বা পাব কি করে? যে বাঁধনে তুমি নিজে আমায় বেঁধেছিলে—'

'আমি বাঁধতে চাইনি,' চঞ্চল বাধা দিয়ে বলল, 'বাবা জোর করে বিয়ে দিলেন।

বিয়ে না করলে তিনি বিষয় সম্পত্তিতে আমায় কোন অধিকার দিতেন না।'

আহত হয়ে লিলি গুমরে উঠল, 'ও, টাকা পাবার জন্যে তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে?'

'হ্যাঁ. কতকটা তাই।'

'তবে এক বছর তুমি আমায় নিয়ে কেন দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ালে? কেন প্রেমের অভিনয় করলে? কেন?—'

'থামাও তোমার সস্তা অভিমান।'

লিলি চোখ মুছে বলল, 'না—না, অভিমান নয়। তোমায় এমনি জিগ্যেস করছি।'

'যদি বলি খেয়ালে পড়ে?'

'তোমায় বিশ্বাস করব। কিন্তু তোমার খেয়ালের নিষ্পেষণ থেকে আমি অন্য নিরীহ মেয়েদের রক্ষা করব।'

'কি করবে?'

'তোমায় বাধা দেব। তাদের কাছে তোমার স্বরূপ তুলে ধরব।'

'পারবে?'

'চেষ্টা করব।'

'আচ্ছা, লিলি, তুমি ত আমার স্বরূপ জানো, তবু তুমি আমায় ভালবাসো কেন?'

'আমার দুর্ভাগ্য বলে।'

'এমনি দুর্ভাগ্য যদি অন্য মেয়ের হয়?'

লিলি কোনও সদুত্তর দিতে পারল না। সে কাতরভাবে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তুমি এত হৃদয়হীন কেন?'

চঞ্চল বাগাড়ম্বর শুরু করল, 'কে বলে আমি হৃদয়হীন? আমার উদার হৃদয়। আমি একসঙ্গে কতজনকে ভালবাসতে পারি বলো ত? তোমাদের মন সঙ্কীর্ণ। শুধু একজনকে নিয়েই পড়ে থাক।'

হঠাৎ সুর ঘুরিয়ে চঞ্চল লিলির কোমর জড়িয়ে বলল, 'যাক্. এস, বস। আজকের পার্টি যখন মাটি করেই দিলে, তখন তোমার সঙ্গেই একটু প্রেমালাপ করা যাক্।'

লিলি স্বামীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল, অভিমানভরে বলল, 'আমায় উপহাস করতে তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না?'

'উপহাস?' চঞ্চল তপ্ত ভাবাবেগে বলল, 'না—না,—লিলি মাই সুইট্, আই লাভ্ ইউ!'

লিলি কানে আঙুল দিয়ে কাতর অস্ফুট উক্তি করল, 'উঃ!'

নকল বিস্ময়ের সঙ্গে চঞ্চল বলল, 'হাউ স্ট্রেঞ্জ! প্রেমালাপও তোমার ভাল লাগছে না? ক্ষিদে পেয়েছে? খাবে? হরিচরণ—হরিচরণ—সাড়া নেই। কোথায় যে যায়?

এখনি এসে পড়বে। এস ডার্লিং খাটের উপর বস। বিছানা ত পাতাই আছে। কি ব্যাপার, তুমি কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েই থাকবে? হরিচরণ—হরিচরণ—'

বাইরে আবার মোটরের শব্দ। মোটরটি এসে থামল। হরিচরণ প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'স্যার, ওঁরা এয়েচেন।'

চঞ্চল আনন্দে বলে উঠল, 'ওঁরা এসেছেন?'

লিলির কাতর আর্তনাদ, 'ওঁরা এসেছেন?'

হরিচরণ হাসিমুখে জানাল, 'হাঁ স্যার, আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে এলুম। সুদর্শন শালাও যা জোরে গাড়ি হাঁকাল। নইলে এত কষ্ট করে সব রান্না হল, নষ্ট হবে?'

চঞ্চল উচ্ছল হয়ে বয়স্যের পিঠ চাপড়ে বলল, 'সাবাস, হরিচরণ। হাঁ, দেখ তোমার বৌমণিও এখানে খাবেন। তুমি যে কি নতুন ধরনের সরবৎ করেছ, সেটা তোমার বৌমণিকে খাওয়াতে ভুল না।'

হরিচরণ ইঙ্গিতটা ধরে ফেলল, বলল, 'সে আর আমায় বলতে হবে না, স্যার। আমার নিজের হাতের তৈরি সরবৎ, বৌমণিকে না খাওয়ালে আমার মনে শান্তি পাব না।'

এর মধ্যে সপরিবারে পরেশ বৈঠকখানায় প্রবেশ করল। সে ঘরে ঢুকেই চেঁচাতে লাগল, 'চঞ্চল, চঞ্চল, তুমি ছোটলোক, হাড়হাবাতে, বদমাশ।'

হৈম তাকে শান্ত করার জন্য বলল, 'আঃ চুপ কর না।'

পরেশ দ্বিগুণ জোরে বলল 'চুপ করব কেন? নেমন্তন্ন করে ফাঁকি দেবার মতলব? আগুন জ্বলছে, পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে, কোথায় খাবার—?'

চঞ্চল সবিনয়ে বলল, 'দেখুন আমার দোষ নেই। আপনার বৌমা?'

লিলি বিব্রত হয়ে ইশারা করল চঞ্চলকে থামাবার জন্যে।

পরেশ লিলিকে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে বলল, 'বৌমা? হাঁ, বৌমাই ত? তুমি রাঁধতে পারো? খাওয়াতে পারো?'

লিলি মিষ্টি করে বলল, 'হাঁ, কাকাবাবু। চলুন, খাবেন চলুন খাবার ঘরে।'

ভারী খুশী হল পরেশ লিলির মিষ্টি আমন্ত্রণ পেয়ে। সে হি হি করে হেসে বলল, 'চঞ্চল, তুমি ভাল, তোমার বৌ আরও ভাল।'

এতক্ষণে হৈম কথা বলল, 'সত্যি! আমি ভাবছিলুম, বাড়ি যাব বলে তোমাদের লোক এই বাগানবাড়িতে নিয়ে এল। তা বৌমা স্বয়ং এখানে আছে, বেশ হয়েছে।'

চঞ্চল বলল, 'আজ্ঞে কাকাবাবুর জন্যে অনেকরকম রান্না হয়েছে। বাড়িতে ওসব সুবিধে হবে না বলে এইখানেই ব্যবস্থা করেছি। কেমন লাগছে বাগান? কি নিভা, তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন? লজ্জা কি? ঘুরে ফিরে দেখ। তোমার বৌদি সব দেখাবে কেমন?'

নিভা চঞ্চলের কথায় কোন সাড়া দিল না।

বাগান কথাটা কানে যেতেই পরেশের ভাব বদলে গেল, সে করুণকণ্ঠে বলল, 'বাগান? "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল, আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।" বড় শক্ত মাটি, ইট পাথর, খাঁ খাঁ করছে রোদ্দুর! কোথাও গাছপালা নেই, এতটুকু ছায়া নেই!'

হঠাৎ তার যেন সম্বিৎ ফিরে এল, সে চঞ্চলের হাত ধরে সহজ মানুষের মতো অনুনয় করল, 'চঞ্চল, আমায় একটা কাজ দিতে পার? কাজ। নিভার মা বলছিল, কাজ না করলে খেতে পাব না। বেকার থাকলে খেতে পাব না। সত্যি খেতে পাব না?'

আবার তার সহজ ভাব কেটে গেল, মাথার মধ্যে উদরচিন্তা তোলপাড় করল, সে চিৎকার করে বলল, 'কোন্ শালী বলে খেতে পাব না? আলবৎ খেতে পাব। কোথায় খাবার, কোথায় খাবার?'

চঞ্চল বলল, 'চলুন কাকাবাবু। হরিচরণ, তোমার সব তৈরী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমি সব ঠিক করে রেখেছি।'

'লিলি, তুমি এদের নিয়ে গিয়ে খেতে বসাও। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। আমার জন্যে বসে থেকো না। আমার নিজের মোটে খিদে নেই। তুমিও ওদের সঙ্গে খেতে বস। খাওয়ান কাজটা মেয়েরাই ভাল পারে। কি বলুন কাকীমা?'

'সে তো একশোবার, হৈম বলল, 'তাছাড়া এমন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বৌ!'

লিলি বলল, 'চলুন, কাকীমা, আসুন কাকাবাবু। এস ভাই নিভা।'

লিলি ওদের নিয়ে চলে গেল। চঞ্চল হরিচরণকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'সাবাস, হরিচরণ, তোমার বুদ্ধি র তারিফ করছি। আমি ত ভেবেছিলুম, তোমার বৌমণি বুঝি সব ভেস্তে দিল।'

'আজ্ঞে, না স্যার,' হরিচরণ গর্বভরে বলল, হরিচরণ যখন কাজে হাত দিয়েছে, মেয়েটাকে আপনার কোলে তুলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্দি।'

'ওরা ত খেতে বসেছে,' চঞ্চল চুপি চুপি প্রশ্ন করল ' তোমার ওষুধ তৈরী?'

হরিচরণ পকেট থেকে একটি ছোট শিশি বার করল। সেইটা দেখিয়ে সে বলল, 'এরই তিনটে করে ফোঁটা—ব্যস্!' হরিচরণ ঘুমের অভিনয় করল।

চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'পরেশবাবু, নিভার মা আর—আর লিলি, কেমন? দেখো নিভার গ্লাসে ওষুধ দিও না যেন! ও ঘুমিয়ে পড়লে সব আমোদ মাটি হয়ে যাবে।'

'সে আর আমি জানি না, স্যার?'

'হরিচরণ, তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ দেব?'

'তার আর দরকার নেই স্যার, একখানা শুধু পাঁচ হাজার টাকার চেক, ব্যস।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমার যা আনন্দ হচ্ছে। একবার অন্ততঃ একবার যদি ওকে নিজস্ব করে পাই।'

'পেয়ে গেছেন ধরে নিন না, স্যার।'

'হরিচরণ, লিলি বলছিল, আমি হৃদয়হীন, কিন্তু নিভাকে আমি এত ভালবাসি! ওকে পাবার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠেছি।'

'সে ত দেখতে পাচ্ছি স্যার। কিন্তু একে নিয়ে বেশিদিন পড়ে থাকবেন না, স্যার। তাহলে এই গরীবের পেট চলবে না।'

চঞ্চল হরিচরণের বাস্তব ভাষণে কান দিল না। সে স্বপ্নজাল রচনা করে বলল, 'আচ্ছা হরিচরণ, ধর, আমি যদি নিভাকে বিয়ে করি?'

'ঝামেলা বাড়বে স্যার। এক বৌমণিকে নিয়ে কত ফ্যাসাদ, তার ওপর ডাইভোর্স, আবার বিয়ে—'

'তা যা বলেছ।' চঞ্চলের সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সে বলল, 'বিয়ে করে কি হবে? হ্যাঁ, দেখ আমি খাবার ঘরে মোটেই যাব না, বুড়ো কেবল বকাবে, আমার মুডটা নষ্ট হয়ে যাবে, আমি এখানে আছি। তুমি সরবতের ব্যবস্থা কর।'

'আজ্ঞে, আচ্ছা, স্যার।' হরিচরণ খাবার ঘরের দিকে গেল।

চঞ্চল বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখতে লাগল। খুশীতে ঝলমল করছিল তার মুখ। চোখ দুটি প্রত্যাশ্যায় অস্থির। সে মাথার চুলটা আঁচড়ে নিল। রুমাল দিয়ে মুখটা ঘষল। নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে নিজেই স্মিতহাস্য করল। দেয়াল আলমারি খুলে একটা বোতল বার করে এক পেগ দামী মদ গিলে ফেলল। এখন সে নিজেকে একটু চাঙ্গা বোধ করল। সে একবার বিছানায় এসে বসল, শুল, উঠে গদিটা চাপড়াল, আবার দাঁড়িয়ে উঠে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কান পেতে শুনতে লাগল ওদের খাওয়ার পর্ব শেষ হল কি না। সে পর্দার পাশ দিয়ে দেখল হরিচরণ নিজের হাতে সরবৎ পরিবেশন করলে। চঞ্চল খুশী মনে সোফায় এসে বসল, নগ্ন নারীর চিত্রগুলি দেখতে লাগল। এই সময় লিলি বৈঠকখানায় ফিরে এল। নিভা তার পিছনে ঘরে ঢুকল।

চঞ্চল বলল, 'এ কি এরই মধ্যে তোমাদের খাওয়া হয়ে গেল?'

লিলি বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওঁদেরও খাওয়া শেষ হয়েছে?'

'প্রায় হয়ে এল। কাকীমা নিভাকে আর আমাকে উঠে পড়তে বললেন। তুমি খাবার সময় একবারও গেলে না?'

'না, মানে, এই যে যাই। কি খাওয়া হল দেখতে পেলুম না। তোমরা সরবৎ খেয়েছ? হরিচরণের স্পেশাল—'

'না খেয়ে উপায় আছে? হরিচরণ নাছোড়বান্দা।'

'কেমন লাগল?'

'ভালই, বেশ নতুন ফ্লেভার!'

'আচ্ছা, আমি যাই। তোমরা গল্প কর। একটু রেস্ট নাও। রোদেব তাত আসছে। জানলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাব?'

'থাক, দরকার হবে না।'

'আচ্ছা, আমি যাই।'

চঞ্চল একটু চিন্তিত হয়ে চলে গেল। চিন্তার কারণ, নিভাকে এখন একলা পাওয়া যায় কি করে?

লিলি নিভাকে বলল, 'এস, ভাই বসি।'

দুজনে সোফায় বসল। লিলি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজ এত গম্ভীর কেন ভাই?'

'না, এমনি। শরীরটা তেমন ভাল নেই। তাছাড়া অনেক খাওয়া হয়ে গেল।'

'কি আর এমন খেলে? সবই ত পড়ে রইল। হরিচরণবাবু সরবৎটা বেশ তৈরী করেছিল, না?'

'হাঁ।'

'তোমার সঙ্গে কতদিন বাদে দেখা। মনে করি যাব তোমাদের নতুন বাসায়, কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারি না।'

'না গিয়ে ভালই কর ভাই।'

'কেন?'

'বাবার মাথার গোলমাল দিনদিন বেড়েই চলেছে, এত ভয়ে ভয়ে থাকি। কখন যে কি করে বসেন তার ঠিক নেই।'

'কোনও রকম চিকিৎসা করাও না কেন?'

নিভা ম্লান হেসে বলল, 'যে চিকিৎসায় ও রোগ ভাল হবে, তা কি আমাদের সামর্থ্যে কুলোয় ভাই!'

'কিছু মনে কর না, একটা কথা জিগ্যেস করব?

'কর।'

'তোমাদের চলে কি করে?'

'সে কথা নাই বা শুনলে। চাকরি খুঁজছি, কি বা এমন যোগ্যতা আছে? কেই বা দেয় চাকরি। তুমি বলতে পার কোথায় চাকরি পাওয়া যায়?'

'চাকরি কেন করতে যাবে? তোমার যখন যা দরকার পড়ে আমাকে জানালেই পার।'

'না, ভাই, নিজেব পায়ে নিজে দাঁড়ানোর চেয়ে বড় আর কি কিছু আছে?'

'তা হয় ত ঠিক। তবু দরকার পড়লে আমায জানাতে সঙ্কোচ কর না, ভাই। আমরা দুই বন্ধু পরস্পরের বিপদে সাহায্য করব, কেমন?'

এতক্ষণে হরিচরণের দেওয়া ঘুমের ওষুধে কাজ আরম্ভ করল। লিলি হাই তুলল।

নিভা তা লক্ষ্য করে বলল, 'তোমার ঘুম পাচ্ছে বুঝি?'

'অনেক খাওয়া হয়েছে কি না। তাই কেমন চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে।'

'বেশ ত শোও না।'

'না, না, তার চেয়ে দুজনে বসে বসে গল্প করি।'

'তাই ভাল।'

আবার হরিচরণ ঘরে ঢুকল। বিনয়ে গদগদ হয়ে বলল, 'বৌমণি, স্যার আপনাকে ডাকছেন।'

'কেন হঠাৎ?'

'তা তো জানি না, বৌমণি।'

নিভা বলল, 'যাও ভাই।'

লিলি বলল, 'তুমি এখানে বস ভাই, আমি এখনই ঘুরে আসছি।'

লিলি চলে গেল। নিভা হরিচরণের দিকে একবার দেখল। তার হালচাল মোটেই ভাল বলে মনে হল না। সময় কাটাবার জন্যে নিভা আর্ট পত্রিকা একটি তুলে নিল, নগ্ন নারীচিত্র চোখে পড়তেই সে বইটি নামিয়ে রাখল, হরিচরণ আপন মনে নিজের কাজ করে যেতে লাগল। কাজটি আর কিচ্ছু না. ঘরের জানলা দরজাগুলি বন্ধ করা। ঘর ক্রমশ অন্ধকার হয়ে এল।

নিভা সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল, 'একি! আপনি দরজা জানলা সব বন্ধ করছেন যে?'

নির্লিপ্তভাবে হরিচরণ বলল, নইলে রোদের তাত লাগবে যে! এই ঘরে বিশ্রাম করবেন স্যার, তাঁর হুকুম ঘরটা ঠাণ্ডা করে রাখতে।'

'তোমার বৌমণি এখনও ফিরল না কেন?'

'আমি ডেকে দিচ্ছি গিয়ে।' হরিচরণ বেরিয়ে গেল। আধ অন্ধকারে ঘরে নিভা চুপ করে বসে রইল। পিছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি ঢুকল চঞ্চল। সন্তর্পণে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। নিভা আগন্তুকের উদ্দেশ্যে বলল, 'লিলি ফিরে এলে ভাই। আমায় এত ভয় করছিল। তোমাদের ও লোকটার হাবভাব মোটেই ভাল নয়।

চঞ্চল পিছন থেকে সন্তর্পণে এসে নিভার চোখ টিপে ধরল।

চমকে উঠে নিভা ত্রস্তস্বরে বলল, 'কে? কে তুমি? ছাড়ো চোখ।'

চঞ্চল চোখ ছেড়ে দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'আমি যে লিলি নই, তা ত বেশ দেখতে পাচ্ছ।'

নিভা ভয় পেল। সে কাতরকণ্ঠে বলল, 'তুমি? একি, কি চাও তুমি?'

'তোমায় চাই, নিভা।' চঞ্চলের ব্যাকুল আগ্রহ।'

'নিভা চিৎকার করে উঠল, 'লিলি, লিলি—!'

চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'মিথ্যে চিৎকার করছ। আজ আর কেউ শুনতে পাবে না। কেউ তোমার ডাকে সাড়া দেবে না। তারা সবাই সরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, এখন তারা আর কেউ উঠবে না।'

'আমি তাদের কাছে যাই!' নিভা ত্রস্তপদে যেতে গেল।

চঞ্চল পথ আগলে দাঁড়াল, 'বলল, 'কোথায় যাবে? সব দরজা জানলা ভাল করে বন্ধ। হরিচরণ কাঁচা কাজ করে না।'

নিভা নাচার হয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি—তুমি আমায় জোর করে পেতে চাও?'

'না, নিভা, আমি তোমায় ভালবাসা দিয়ে, আদর দিয়ে জয় করতে চাই।' চঞ্চলের স্বর কামকোমল।

নিভা ঘৃণাভরে বলল, 'থাম তুমি।'

কামার্ত চঞ্চল ডাকল, 'নিভা।' সে নিভার দিকে এগিয়ে যেতে গেল। নিভা ধরা গলায় বলল, 'দাঁড়াও ওখানে, কাছে এস না।'

চঞ্চল দাঁড়িয়ে গেল। চঞ্চল মিষ্টি করে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, নিভা ডার্লিং, কেন তুমি আমার ওপর এত নির্দয় হলে? আগে ত এত কঠোর ছিলে না। মনে পড়ে যখন আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতে?'

কাতর স্বরে নিভা বলল, 'দোহাই তোমার সে সব কথা আর তুলো না। আমার দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে।'

'দুঃস্বপ্ন, না সুখস্বপ্ন?'

'দুঃস্বপ্ন! উঃ! তোমার মুখে মিষ্টি কথা শুনে অন্ধবিশ্বাসে আমি কোন্ পথে চলেছিলুম? তখন তোমায় চিনতে পারিনি, এখন তোমায় চিনেছি।'

'কি চিনেছ?'

'চিনেছি তোমার রূপের আড়ালে লুকোনো শয়তানকে, জেনেছি তার মধ্যে কতখানি জঘন্য নীচতা আছে লুকিয়ে। তুমি কি মানুষ? তুমি পশুরও অধম।'

চঞ্চল ঈষৎ ব্যঙ্গভরে বলল, 'তোমার এই অভিমান আমার খুব ভাল লাগছে নিভা। তুমি যত বেশী রাগ করছ, মনে হচ্ছে আমায় তত বেশী ভালবাসছ। বাইরে দেখাচ্ছ আমায় ঘৃণা কর, কিন্তু তোমার মন আমায় পাবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে।'

'ও তোমার মিথ্যে অহঙ্কার। তোমায় আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি।' নিভার ধরা গলায় ঘৃণা ফুটে উঠল।

'একদিন ত করতে না। সেদিন ত আমায় মনে-প্রাণে চাইতে।'

'আমার সৌভাগ্য যে সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে।'

চঞ্চল কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, নিভা, আমার কাছ থেকে কি পেলে সেদিন আবার ফিরে আসতে পারে?'

'সেদিন আর ফিরবে না। তোমার সাধ্য কি আমার কামনা তুমি মেটাও। সে রূপেও মেটে না আর ঐশ্বর্যেও মেটে না।'

'কি চাও তুমি ? জানতে পারি কি ?'

নিভা স্বপ্নালু স্বরে বলল, 'একখানি ছোট্ট বাসা—আমাদের একান্ত, নিজস্ব। স্বামী যার বুকঢালা নিবিড় অবিচল প্রেম জীবনের শত ঝঞ্ঝা, উপেক্ষা করতে শেখাবে। আর সন্তান—সব সুস্থ সুন্দর, যার আধ আধ কথায়—'

চঞ্চল বাধা দিয়ে বলল, 'থাক, থাক, বুঝেছি তোমার মনে কোনও এম্‌বিশন নেই। তুমি সাধারণ বাঙালী গেরস্তের মেয়ে যার কল্পনা কিছুদূর গিয়েই হোঁচট খায়। কিন্তু এই সামান্য জিনিস—আমি ত অনায়াসেই দিতে পারি।'

'তা পারো না, চঞ্চলদা, কিছুতেই পারো না। তোমরা বড়লোক। তাই তোমাদের দেবার ক্ষমতা নেই, কেবল নিতেই জানো। দেবার মানুষ বোধ হয় আমি খুঁজে পেয়েছি।'

'মানে? তুমি কি ছেলে ধরে বেড়াচ্ছ না কি? ভাগ্যবান্‌টি কে শুনি।'

'শুনে কোনও লাভ নেই, চঞ্চলদা।'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। সেই চালচুলোহীন লেখকটা, সেই হতভাগ্যটা তোমার মাথা খেয়েছে।'

'চঞ্চলদা,' নিভা তীব্র প্রতিবাদ করে বলল, 'বিনয়বাবু সম্বন্ধে তুমি কোনও অভদ্র ইঙ্গিত করতে পারবে না। এতদিন একই বাড়িতে আছি, ইদানীং তাঁর কাছে এত গেছি তবু একটা দিনও তিনি আমার সঙ্গে অসদ্‌ব্যবহার করেননি, তোমার মতো লালসায় গিলে ফেলতে আসেননি।'

ঈর্ষায় চঞ্চল বিদ্রূপ করে বলল, 'ইস ঐ কপর্দকহীন কলমবাজটার জন্যে তোমার দরদ উথলে পড়ল দেখছি।' তারপর জঘন্য হাসি হেসে চঞ্চল তীব্রকণ্ঠে বলল, 'শোন নিভা, আমার মুখের শিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমার চোখের সামনে দিয়ে আমারই কামনার ধন কেউ হরণ করে নিয়ে যাবে, এ অসম্ভব। আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না।'

চঞ্চল দৃঢ়পদে নিভার দিকে এগিয়ে চলল। নিভা সভয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল, সে

আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'চঞ্চলদা, তোমার মতলবটা কি? তুমি আমায় জোর করে—'

চঞ্চল আরও এগিয়ে যেতে লাগল। সন্ত্রস্ত নিভা পিছতে পিছতে ধারের টেবিলের কাছে আশ্রয় নিল, হাত লেগে পিতলের ভারী ফুলদানীটা উলটে পড়ে গেল মাটিতে। ঝনঝন আওয়াজে ঘর উচ্চকিত হল। ফুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল।

কামার্ত পশুর মতো ফুঁসতে লাগল চঞ্চল 'হ্যাঁ, তোমায় জোর করে পেতে চাই।' চঞ্চলের কথাগুলি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না, সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'দিনের পর দিন তুমি আমায় নিরাশ করেছ, আজ আর পারবে না।'

বাধা না মেনে চঞ্চল লুব্ধ শ্বাপদের মতো জড়িয়ে ধরল নিভাকে। বলিষ্ঠ চুম্বনে ভবিয়ে দিল তার অধর। নিভা আর্তকণ্ঠে বলল, 'না, না, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।'

'হয় না, তা হয় না, আজ তোমায় একা পেয়েছি, আজ তুমি আমার, শুধু আমার।'

চঞ্চল দর্পিত হাতে নিভার ব্লাউজ ধরে টানল। পটপট করে বোতাম ছিঁড়ে গেল। চঞ্চলেব মুখ নেমে আসছিল নিভার নগ্ন বুকের উপর। আক্রান্ত বনবিড়ালীর মতো নিভা এবার প্রত্যাঘাত হানল, সে হাতের নখ দিয়ে চঞ্চলের লুব্ধ মুখের ওপর প্রাণপণ শক্তিতে আঁচড়ে দিল। চামড়া কেটে রক্ত ঝরে পড়ল চঞ্চলের মুখে চোখে, দু'চার ফোঁটা উষ্ণ বক্ত ছিটকে পড়ল নিভাব বিবসনা বক্ষে। চঞ্চল যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। তার আলিঙ্গন শিথিল হল। নিভা নিমেষে নিজেকে মুক্ত করে নিল। কিন্তু বেশিদূর সরে যেতে পারল না। চোখে বক্ত পড়ায় চঞ্চলের দৃষ্টি খানিকটা ঝাপসা হয়ে এল তবু সে নিভার আঁচল ধবে সবেগে টানল, তারপর হিংস্র পশুর মতো শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার অতর্কিত আক্রমণে নিভা মাটিতে পড়ে গেল। লুব্ধ কামুক লম্পট তার ওপরে এসে পড়ল। বলিষ্ঠহাতে নীবীবন্ধন শিথিল করতে গেল। নিভা একটু উঠে বসল। হাতের কাছে শীতল ধাতুর স্পর্শ। ভারী পিতলের ফুলদানীটা যেন নিভাকে বলল, 'ভয় কি, আমি আছি, আমি তোমায় শাস্তি দেব। আমি তোমায় রক্ষা করব।'

কামুকটা কোমরের নীচে হাতড়াতে যাচ্ছিল।

পলকের মধ্যে নিভা দু'হাতে ফুলদানী তুলে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে চঞ্চলের মাথায় আঘাত করল। অস্ফুট কাতর শব্দ করে কামার্ত পশু ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। নিভা ক্ষিপ্রপদে উঠে দাঁড়াল, বিস্রস্ত শাড়িটা কোনরকমে জড়িয়ে নিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে পড়ল। তার পর ছুট্ ছুট্ ছুট্। একাই একেবারে নির্জন বাগানবাড়ির বাইরে পালিয়ে গিয়ে হাঁফ ছাড়ল।

দ্বিতীয় পর্ব

পর পর দু'তিনটে লেখা পত্রিকার কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে ফেরত এসেছিল। বিনয় ক্ষুব্ধ মনে একটা কাগজের অফিসে ধাওয়া করল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাই সাহস। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন দেখা হল, কর্তৃপক্ষ বলল, 'বিনয়বাবু, আপনি লেখেন মন্দ নয়, কিন্তু ঐ লেখাটা ত আমাদের কাগজে চলবে না। অত করুণ পরিণতি আজকাল আর কেউ পড়তে চায় না। আপনি লেখাটা একটু বদলে নিয়ে আসুন, তবে ছাপা যায়।'

বিনয় আপত্তি করল, 'সে কি করে হয়?'

'এই ত আপনাদের অহমিকা,' কর্তৃপক্ষ মাতব্বরি করে বলল, 'মশায় আপনারা ত লিখে খালাস। কিন্তু ছাপাবার জন্যে আমাদের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে হয়। টাকাটা উসুল না হলে আমাদের চলে কি করে? গ্রাহক-গ্রাহিকারা যেমন লেখা পছন্দ করে তেমনি লেখা ত আমাদের ছাপতে হবে।'

বিনয়ের লেখাটা ছাপা হয় নি, কেন না সে করুণ পরিণতি বদলাতে চায়নি। লেখার গতি যদি করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায় বিনয় নাচার।

এই একগুঁয়েমির জন্যে বিনয় বেশ বিপদে পড়ত। সে ভাবত লিখে ত যাই। ছাপার বিষয় পরে ভাবা যাবে। যদি নিজের টাকা থাকত, তবে প্রকাশকদেব মুখ চেয়ে তাকে চলতে হ'ত না। নিজেই লিখে যেত, নিজেই ছাপাত। কিন্তু সে স্বপ্ন সুদূরপরাহত। নিত্য পেট চালানই দায়, ত আবার নিজের বই ছাপান। উপরি আয়ের জন্যে বাধ্য হয়ে বিনয় খুচরো কাজকর্ম জুটিয়ে নেবার চেষ্টা করত, কখনও বা গতানুগতিক টিউশনি, কখনও বা স্কুলের বইয়ের ক্যান্‌ভাসারি, কখনও প্রুফরীডারের কাজ। একটা ত পেট্ চলে যেত। অভিজ্ঞতাও বাড়ত, কত রকম লোকের সংস্পর্শে আসা যেত। রকমারি চরিত্রের স্কেচ সে নোট বইয়ে টুকে রাখত।

নিজের জন্যে বিনয় মোটেই ভাবে না। তার নতুন ভাবনা শুরু হল পরেশবাবুর পরিবারকে নিয়ে। ভদ্রলোকের কাজকর্ম নেই, তার ওপরে মাথার অসুখ। টাকার অভাবে চিকিৎসা নেই। বিনয় সুপারিশ ধরে দু-চারদিন পরেশবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার দেখল, কিছু ঘুমের ওষুধও দিল। কিন্তু প্রেস্‌ক্রিপসানের বহর যা পাওয়া গেল, তাতে ওষুধ কিনতে অনেক টাকার ধাক্কা। নিভার মার শেষ গয়নাটুকু বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। বিনয় চেষ্টা করতে লাগল, পরেশবাবুকে কোনও মানসিক রোগের হাসপাতালে ভর্তি

করা যায় কি না। কিন্তু সেখানেও উপযুক্ত তদ্বির না হলে সম্ভব নয়। কে করে সেই তদ্বির? বিনয়ের ত কোন খুঁটির জোর নেই।

আর নিভা? বেচারী! অমন সুন্দর একটি ফুলের মতো মেয়ে। তার ওপর দিয়ে কি না ঝড় যাচ্ছে। মেয়েটিকে খুব ভাল লাগে বিনয়ের, কেমন সপ্রতিভ, পরিশ্রমী। শত দুঃখেও সে ভেঙ্গে পড়ে না। কাজের জন্যে সে নানা জায়গায় খোঁজা-খুঁজি করছে। বিনয়ও চেষ্টা করছিল তার জন্যে। যদি নিভার একটা কাজ পাওয়া যায় তবু হয়ত ওরা যুঝতে পারবে। বিনয় নিজেই কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে, যদি কোন স্কুলে কিংবা অন্য কোথাও মেয়েদের জন্যে কর্মখালি থাকে। কয়েকটা জায়গায় নিভা দরখাস্ত করেছিল। বিনয় নিজেই পোষ্ট করে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু জবাব এল না। একটা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকার পদের জন্যে নিভা দরখাস্ত করেছিল। সেটা মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু চাকরিটা কোন সুদূর পল্লীগ্রামে। সেখানে সপরিবারে থাকারও সুবিধা নেই। ওই মাইনেয় একার চলাই শক্ত। তার ওপর রুগ্ন বাবা। নিভা সে চাকরি নিতে পারেনি। বিনয় অনেক চেষ্টা করে একটি বিপণির সেলস্ গার্ল-এর চাকরির সন্ধান পেয়েছিল, সে কাজটা অস্থায়ী। তবে হলেও হতে পারে। একটা আশ্বাস পেয়ে বিনয় খুশী মনে বাড়ি ফিরছিল, কিন্তু মেজাজটা বিগড়ে গেল, পার্কের ধারে গেঁয়ো ভিখারীটার ব্যাপার জানতে পেরে।

ঐ পরিবারটা ক'দিন ধরে পার্কের রেলিং-এ চট টাঙ্গিয়ে আস্তানা পেতেছিল। বর বউ আর ছোট ছেলে। এ পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়াত আর মোড়ের মাথায় গাড়ি থামলে বাবুদের কাছে হাত পাতত। বিনয় নিজেও দু'চার পয়সা দিয়েছে, যখন পকেটে কিছু থাকত। সময় সময় ওদের সঙ্গে দু'চারটে সুখ-দুঃখের কথাও বলেছে। লোকটার নাম সহায়রাম। কিন্তু ভিড় জমিয়ে ভিখারিটা সেদিন চিৎকার করছিল, 'বাবু, ওরা আমার বৌকে কাড়ি নিল, আমার বৌকে ফিরায়ে দেও।'

ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর ছোট ছেলেটাও কাঁদছিল।

ভিড় করে লোকগুলি মজা দেখছিল। এত বড় একটা জোয়ান মরদ হাউ হাউ করে কাঁদছিল, এ দেখে ছোট ছেলেপুলেরা দঙ্গল করেছিল। জনকয়েক ভদ্রলোক কেলেঙ্কারির গন্ধ পেয়ে সরস টিপ্পনী কাটছিল।

বিনয় ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতেই লোকটা বিনয়ের পায়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, 'বাবু আমার বৌকে ওরা কাড়ি নিল, আমার বৌকে ফিরায়ে দেও।'

'কে কেড়ে নিল?' বিনয় জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা বলল, 'মাসি কাড়ি নিল, তুমি ফিরায়ে দেও বাবু। হো-হো-হো।

ফুলে ফুলে লোকটা কাঁদতে লাগল, ছেলেটিও বাপের সঙ্গে সুর মেলাল। আশ-পাশের লোকেরা হাসাহাসি করল।

'তুমি চুপ কর, সহায়রাম। কান্না থামাও। ব্যাপারটা কি বল।'

বিনয় ওকে আশ্বস্ত করল, সহায়রাম আর তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল যেখানটায় কোন ভিড় নেই। তাকে সহায়রাম তার দুঃখের কাহিনী বলল। সে মোটেই গুছিয়ে বলতে পারছিল না। বিনয় প্রশ্ন করে করে জেনে নিল।

মাসি তার চোদ্দপুরুষের কেউ নয়। ঠিক 'পুতনা রাক্কুসির' মতো চেহারা, যেমন কালো তেমনি মোটা। পান খেয়ে ঠোঁট টুকটুক করছিল। কালো রঙের ওপর সোনার গয়না জ্বলজ্বল করছিল। রিকশা থেকে নেমে খুব মিষ্টি গলায় মেয়েছেলেটা মনুর মাকে সোহাগ করতে লাগল। 'আহা, এমন সোনার চাঁদ মেয়ে, তুই কি না রাস্তায় পড়ে আছিস। আমি রিকশা করে যেতে যেতেই দেখে অস্থির। আয় মা, আমার বাড়ি আয়। এস জামাই, আয় নাতি।'

সোহাগ দেখে সহায়রাম গলে যায়নি, কিন্তু মনুর মা একদম মজে গেল। সে বলল, 'চলনি, মাসি ডাকতিছে, তার বাড়ি চল।'

মাসির রিকশায় মনুর মা আর মাসি উঠল, মনুকে কোলে নিয়ে সহায়রাম সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। সে ভাবল আজব শহর কলকাতা;এখানে কেউ দূর দূর করে, কেউ আবার কোলে টেনে নেয়।

মনুর মা ভারী খুশী। সে কখনও রিকশায় চড়েনি। মানুষ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কত খাতির তার। মাসি যেতে যেতে কত মিষ্টি কথা বলল। পরিচয় জানল। মাসি বলল, 'কি গো বাছা পথে কেন পড়ে থাকবে? আমার মস্ত ঘর বাড়ি। কত লোক থাকে সেখানে, তোমাদের কোন চিন্তা নেই। আমার বাড়িতে থাকবে, কেমন?'

কথাবার্তায় সহায় একটু নরম হল, কিন্তু সন্দেহটা পুরো কাটল না।

মাসি এল একটা বস্তিতে। খাপরার চাল কিন্তু পাকা দেওয়াল। বেশ ছিমছাম। পরিষ্কার।

মাসি ওদের নিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকল। মাঝখানে উঠোন, চারিদিকে খাপরার ঘর। উঠোনে একটা তুলসী-মঞ্চ ছিল। মাসি বাড়ি এসেই হাঁকডাক শুরু করল, অ বিনো, অ সরি, অ আলতা, আয় মা, আয়। তোদের নতুন বোন, বোনাই, বোনপো এসেছে দেখবি আয়।"

কয়েকজন মেয়েছেলে, কটি শিশু, জনা দুয়েক পুরুষ উঠোনে এসে দাঁড়াল। একজনকে মাসি বলল, 'আমার নতুন মেয়ের মুখটা কেমন লক্ষ্মী পিতিমের মতো দেখ্ত। পথে পথে ঘুরে মুখটায় কালি পড়ে গেছে। ওরে ও, মতি, জামাই এল হাঁ করে দেখছিস কি? ওর চানের ব্যবস্থা করে দে। একটা ভাল জামা-কাপড়ও দিবি। সরি, তুই মা ছেলেটাকে সামলা, আমি নিজেই মেয়েটাকে সাজিয়ে দিচ্ছি। দেখবি তখন চিনতে

পারবিনে। তখন বলবি মাসি গোবর থেকে পদ্মফুল তুলে আনতে পারে, ছাইগাদায় হীরে খুঁজে বার করে। ও জামাই, যাও ত বাপ, চান-টান কর, পবিষ্কার হও। খাওয়া-দাওয়া কর। মাসি কিন্তু নোংরামি একেবারে পছন্দ করে না।'

তাজ্জব হয়ে গেল সহায়রাম। এ যেন রূপকথার গল্প। নিজের ছেঁড়া কানি ফেলে দিয়ে ধোপদোরস্ত জামা-কাপড় পরে যখন স্নানের ঘর থেকে বেরল, সহায়রাম আয়নাতে নিজেকেই চিনতে পারল না। মোতি বলে তাগড়া লোকটা আগেই গলির মোড়ে নাপিত দিয়ে তার গোঁফ দাড়ির খোঁচাগুলো পরিষ্কার করিয়ে দিয়েছিল।

সহায় সব থেকে অবাক হল সদুকে দেখে। একি সত্যি তার বিয়ে সাদি করা বৌ। আহা, ফিকে হলুদ রঙের শাড়ি যেন জেল্লা দিচ্ছিল, সদুর কালো, ধুলো পড়া রঙ যেন অনেকটা ফিকে লাগছিল, কতদিন বাদে মাথায় তেল পড়েছে। কপালে সিঁদুর টিপ, ঠোঁটে আলতা, ঠিক যেন কনে বউয়েব মত দেখাচ্ছিল।

সহায়রামের হঠাৎ সন্দেহ হল। কি জানি এটা নষ্ট মেয়েদের বাড়ি নয় ত? সে ইতস্ততঃ দেখল, বেশ ঘরোয়া পরিবেশ। এখানে ওখানে রান্না হচ্ছে। উঠানে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনু ও ওদের সঙ্গে খেলছে। নাঃ মিথ্যে সন্দেহ। ওরা নষ্ট মেয়েছেলে হতে যাবে কেন?

মাসি বলল, 'কি জামাই, মেয়েকে দেখে তোমার মাথা ঘুরে গেল নাকি। আহা লক্ষ্মী পিতিমে পথের ধুলোয় পড়েছিল। এস বাবাজী, মাসির বাড়ি এসেছ, খাওয়া দাওয়া করবে এস।'

সে কি যত্ন করে খাওয়ান। সদুর বাপের বাড়িতে এত যত্ন, এত রকম খাবার সহায় কখনও খায়নি। খাওয়া ত দূরের কথা, গুনে গুনে করকরে পাঁচশ টাকা সদুর বাবাকে দিতে হয়েছিল, সদুকে বিয়ের মাসুল স্বরূপ।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, মাসি বলল, 'পথে পথে অনেক ধকল গেছে। তোমরা দুজন ঐ ঘরে শোও জামাই, আমি নাতিকে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছি।'

মাসি সহায় আর সদুকে একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল।

ঘরটা ছোট। কিন্তু পরিষ্কার। একটা মাঝারি খাটের ওপর মোটা গদি পাতা, তার ওপর সাদা চাদর আর দুটো বালিশ। একটা বড় আলমারির গায়ে আয়না লাগান। দেয়ালে দেবদেবীর ছবি। ঘরে একটি জোরালো আলো জ্বলছিল। সহায়রাম সেই নরম বিছানাটার ওপর উঠল। আঃ কি নরম। এত নরম বিছানায় লোকে শোয় নাকি! আয় সদু আয়। সহায় ডাকল। সদু তখন সেই বড় আয়নায় নিজেকে দেখছিল। আর দেখছিল, নিজের গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি বালা। মাসি তাকে সোনার মতো ঝকঝকে গয়নায় সাজিয়েছিল। সহায় সদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সদুর গা দিয়ে কি মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছিল।

সদু ফিক ফিক করে হাসছিল।

সহায়রাম একরকম জোর করে সদুকে টেনে তুলেছিল বিছানায়। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সহায়রাম বলতে পারে না।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল মাসির ডাকে। ব্যাপারখানা কি? ঘুমন্ত চোখে সহায় বাইরে বেরিয়ে এল। মাসি বলল, 'জামাই তোমায় কাঁচা ঘুম থেকে তুললুম। কি করি বল, তোমার ভাইরা এসেছে। সে ঐ ঘরে থাকবে।'

'তা সদুকে ডেকে আনি।'

'না, না,। মেয়ে ও ঘরেই থাক্। তুমি আমার ঘরের দাওয়ায় শোবে এস, ওখানে তোমার জন্যে মাদুর পেতে দিয়েছি।'

'মানে?'

'মানে বুঝতে পারনি। কোথাকার গেঁয়ো ভূত গো তুমি জামাই। এস এস নাগর দাঁড়িয়ে আছে।'

সহায়রাম এবার ফেটে পড়ল, 'ও, তুমি নষ্ট মেয়েছেলে! তুমি বেউশ্যে!'

'মুখ সামলে কথা বল জামাই। মোতি— ।'

মোতি বলে তাগড়া লোকটা একটা লোহার রড্ হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

'তোমরা মনে ভাবছ কি? আমার বউকে বেউশ্যে করবে? মনুর মা, মনুর মা— বেরিয়ে আয় বলছি,' সহায় গর্জন করে উঠল। সদু চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এল। 'চল, মনুর মা' সহায় বলল. 'এই পাপপুরী থেকে পালিয়ে চল্।'

সদু দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না।'

'না?' ফেটে পড়ল সহায়, 'মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। চলে আয় বলছি।'

সদু বলল, 'ইস্ ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই। যাব কেনে তোর সঙ্গে? আমি মাসির কাছে থাকব। তোর সঙ্গে যাব নি।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না সহায়। সদু বলে কি?

মাসি বলল, 'কেন আর রাত বিরেতে ঝমেলা করছ জামাই? বাড়িউলির কাজে আমি চুল পাকিয়ে ফেললুম। মেয়ে দেখলে আমি চিনতে পারি না? এ মেয়ে আমার কাছে থাকবে।'

সহায় তাকে গ্রাহ্য করল না। সে সদুকে বলল, 'মনুর মা, তুই মনুর মুখ চেয়ে আমার সঙ্গে চলে আয়।'

'না।' সদু বলল, 'মাসি বলেছে মনু আমার কাছে থাকবে. তোমার ইচ্ছে হয় তুমিও থাক।'

'না, না।' সহায় চিৎকার করল, 'হারামজাদি আমি আমার ছেলে বেউশ্যের অন্ন

খাব? না—না। তুই মর্ এখানে। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে পাপপুরী থেকে এই দণ্ডে চলে যাচ্ছি।'

'নোংরা, নোংরা', সহায় চেঁচাল, 'এ সব জামা-কাপড় নোংরা!' সে টেনে খুলে ফেলল জামা-কাপড়, নিজের ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে নিল। মাসির ঘর থেকে ঘুমন্ত মনুকে টেনে তুলল। সে একটা ইজের পরে শুয়েছিল. ইজের খুলে উলঙ্গ ছেলেকে নিয়ে সহায়রাম ছুটে বেরিয়ে এল মাসির বাড়ি থেকে।

বিনয় বলল, 'আর একবার চেষ্টা করে দেখ না, সহায়রাম, বলে বুঝিয়ে যদি নিয়ে আসতে পার।'

'সে আর আসবেনি বাবু', সহায় বুক চাপড়ে ককিয়ে উঠল, 'ওরা আমার একখানা পাঁজর কেড়ে নিল। আর একখানা পাঁজর এই মনু। আয় বাবা, তোর বাপের সঙ্গে চল্।'

সহায়রাম ছেলেকে কোলে আঁকড়ে ধরল। তারপর ছুটে গিয়ে বাগানের ধারে চটের তাঁবুটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলল, লাথি মেরে ইটের উনুন উলটে দিল, আছাড় দিয়ে মাটির পাত্র ভাঙ্গল, শুধু মনুর মার একখানা ছেঁড়া শাড়ি মাথায় জড়িয়ে নিয়ে সে ছেলেকে কোলে তুলে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

বিনয় তক্তাপোশে উপুড় হয়ে শুয়ে তাকিয়ায় ভর করে নতুন গল্প লিখছিল। নিভা ঘরের কোণে একটা স্টোভে রান্না করছিল। বিনয় নিবিষ্ট হয়ে লিখেই যাচ্ছিল। নিভার দিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। লেখার একাগ্রতায় নিভার অস্তিত্বও সে যেন ভুলে গিয়েছিল। নিভা বার কয়েক খুন্তি নাড়ল। দু'একবার চাবিটা ঝনাৎ করে পিঠের ওপর ফেলল। কিন্তু বিনয় সেদিকে মন দিল না। শেষে নিভা বলল, 'কুঁড়ের মতো সকাল থেকে শুয়ে শুয়ে কি লেখা হচ্ছে?'

বিনয় মুখ না তুলে বলল, উঁ—কি বলছেন?'

'এতই তন্ময় যে আমার কথায় কান নেই? কি লিখছেন এত?'

মুখ তুলে বলল, 'লিখছি? আমার মাষ্টারপীস একটা ভিখারীর জীবন। এই লোভী সমাজ কি করে একটা গরীব মানুষের বউকে ছিনিয়ে নিল।'

কৃত্রিম অভিমানের সঙ্গে নিভা বলল, 'তখন থেকে যে একা রেঁধে মরছি, একটু সাহায্য করতে পারেন না?'

বিনয় গম্ভীর ভাবে বলল, 'তাতে আপনার পরিশ্রম বাড়বে বই কমবে না, এমনি

কাজের লোক আমি।'

নিভা নকল বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, 'নিজের সম্বন্ধে যে আপনার খুব উঁচু ধারণা দেখছি।'

বিনয় উত্তর না দিয়ে লিখেই চলল।

নিভা হাঁড়ি নামিয়ে বলল, 'এদিকে আমার খিচুড়ি রান্না হয়ে গেল, অথচ আপনার নাওয়া হল না। গরম গরম খাবেন কি করে?'

নিভা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'উঠুন, পরে লিখবেন।'

'এই যে উঠি।' বিনয় কাগজ কলম রেখে এবাব উঠে পড়ল।

নিভা বিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ইস্ দাড়িটাও কামাতে পারেন নি? মুখের ওপর জঙ্গল হয়ে রয়েছে!'

'ভাবছি দাড়ি রাখব।' বিনয় হেসে বলল, 'নাপিত বেটা রেট বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্লেডের দামও আগুন।'

'তা হলে যা দেখাবে আপনাকে', ব্যঙ্গ করে নিভা বলল, 'আহা!'

'কেন দাড়ি রাখলে কি খারাপ দেখায় আমাকে?'

'আয়নাটা এনে দেব?'

'না না থাক', বিব্রত হয়ে বলল, 'যেমন রূপের আভাস দিচ্ছেন, ভয় পেয়ে যাচ্ছি। দাড়ির বংশ আমি আজই ধ্বংস করব।'

'বেশ এখন যান, নেয়ে আসুন। আপনার জামা-কাপড় ঐখানে গুছিয়ে রেখেছি।'

বিনয় খুশি হয়ে বলল, 'তাই নাকি? আপনি আবার কেন কষ্ট করতে গেলেন?'

'চোখের সামনে এমন ছন্নছাড়া হয়ে থাকেন, আমার দেখতে ভাল লাগে না, তাই।'

বিনয় বলল, 'তা যা বলেছেন! ও সব দিকে নজর দেবার সময় পাই না।'

'ইস্, কত কাজের মানুষ! তবু যদি না দিনরাত লম্বা হয়ে শুয়ে কাগজের ওপর আজেবাজে লিখতেন।'

বিনয় ঈষৎ আহত হয়ে বলল, 'আমি বাজে লিখি? সত্যি বলুন না।' তার স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল। যেন নিভার মতামতের ওপর তার মানসিক শান্তি অনেকখানি নির্ভর করছে।

'না, না, আপনাকে ঠাট্টা করছিলুম।' নিভা আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আপনি খুব ভাল লেখেন।'

'সম্পাদকগুলো যদি আপনার মতো সমঝদার হতো!' বিনয়ের কণ্ঠে স্বপ্নের রেশ.'জানেন আমার এমবিশান আমি গর্কির মতো বড় লেখক হব। সে আমার মতো

গবীব ছিল। দ'বেলা রুটি জুটত না। দারুণ শীতে গরম জামার অভাবে হি হি করে কাঁপত। কিন্তু লিখত যা! আপনি গর্কির লেখা পড়েছেন।'

'না।'

'বলেন কি? গর্কির লেখা পড়েননি? বেশ ত আসুন এখনই শুরু করি।' সে একটা বই টেনে নিয়ে বলল, 'এই যে গর্কির মাদার।'

নিভা বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আর পারি না। এখন 'মাদার' নিয়ে বসেছেন। এদিকে খিঁচুড়ি জল হয়ে গেল।'

'ও আচ্ছা'। হঠাৎ বিনয় বলল, 'দেখুন আমি একটু পরে খাব। আমার মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে। এখনই না লিখে ফেললে সব গুলিয়ে যাবে। এক কাজ করুন, আমার ভাগটা বেড়ে রেখে হাঁড়িসুদ্ধু আপনি নিয়ে যান। আপনাদের আজ নিমন্ত্রণ করেছিলুম না? একসঙ্গে বসে খেতে পারলে খুব মজা হতো। কিন্তু জানেন ত আমার এখানে বাড়তি থালা গেলাস নেই।'

'আপনি বরং চলুন, আমাদের ওখানে গিয়ে খাবেন।'

'দি আইডিয়া—ঠিক বলেছেন। তাহলে ত গ্রাণ্ড ফিস্ট, মহাভোজ! সকালে যখন কাঁকড়মণি চাল আর ভাঙ্গা ডাল কিনে আনলুম, তখন ভাবতেই পারিনি যে খাওয়াটা এমন জবর হবে। কিন্তু এতে সকলের কুলিয়ে যাবে ত?'

'তা যাবেখন।'

এই সময় নন্দ নন্দী এসে হাজির। তার চেহারায় খানিকটা পরিবর্তন হয়েছিল। সে চুলে কলপ লাগিয়েছে, পরনে গলাবন্ধ ধোপদুরস্ত কোট, কোচান কাপড়, গলায় পাকান চাদর। তার মুখে বেশ সলজ্জ ভাব। সে নিভার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখল।

নন্দ বলল, 'এই যে ভায়া! তোমরা খুব ব্যস্ত দেখছি।'

বিনয় উৎসাহে বলল, 'আজ আমাদের গ্রাণ্ড ফিস্ট! নিভাদেবী নিজের হাতে খিঁচুড়ি রেঁধেছেন। আপনিও খাবেন না কি?' তারপর চুপি চুপি নিভাকে জিজ্ঞাসা করল, ঠিক কুলবে ত?'

ম্লান হেসে নিভা বলল, 'তা কুলিয়ে নেওয়া যাবে'খন।'

নন্দ একগাল হেসে বলল, 'উনি-নিজে রেঁধেছেন! আহা, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! এ অমৃত কি আমি ফেরাতে পারি?'

বিনয় বলল, 'বেশ ত, বেশ ত। কিন্তু আপনার গিন্নী রাগ করবেন না?'

নন্দ চটে গেল, বলল, 'বিনয়, তুমি আমার সঙ্গে সব সময় ঠাট্টা ইয়ার্কি কর না। আমি গিন্নীর ভেড়ুয়া কি? এ্যাঁ—'

নিভা মুখে কাপড় দিয়ে হাসি চেপে রাখল।

বিনয় কৃত্রিম অমায়িকতার সঙ্গে বলল, ' না, না এ কথা আবার কে বলল?'

'এই ত তুমিই বলছ,' নন্দ বিরক্ত হয়ে বলল, 'এঁর সামনে ঠাট্টা!'

'ও হাঁ, তাইত;' বিনয় নকল গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'মস্তো ভুল হয়ে গেছে! এঁর সামনে ঠাট্টা করা আমার উচিত হয়নি। আরে এতক্ষণ দেখিনি। আপনি যে আজ খুব সাজগোজ করেছেন? মাথার কাঁচাপাকা চুল এত কালো করলেন কি করে? আপনাকে দেখাচ্ছে একেবারে ইয়ংম্যান, কি বলেন নিভাদেবী?'

হাসি চেপে নিভা কোনক্রমে বলল, 'তা ঠিক।'

তরুণী প্রেমিকার প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে নন্দ বলল, 'এ্যাঁ, কি বললেন, ইয়ংম্যান দেখাচ্ছে? তা আমার বয়সই বা কত হবে। কি বললেন, আমায়, আমায় ইয়ংম্যান দেখাচ্ছে?'

'নিশ্চ য়।' বিনয় নিভাকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এবার একবার আয়নাটা এনে দিন।'

ঠাট্টা বুঝতে পেরে নিভা বলল, 'যান, আপনি ভারী অসভ্য।'

নন্দ ব্যগ্র হয়ে বলল, 'কখন খাব? কখন খেতে দেবেন?'

নিভা ব্যস্তভাবে বলল, 'আমি এখনই ব্যবস্থা করছি বিনয়বাবু, এই হাঁড়িটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি চট করে মাথায় একঘটি জল ঢেলে নিন, তারপর নন্দবাবুকে সঙ্গে করে থালা গেলাস নিয়ে আমাদের ঘরে আসুন, কেমন?'

নিভা হাঁড়ি তুলে নিয়ে যেতে যেতে বললে, 'দেরী করবেন না যেন। তাহলে খিচুড়ি একদম জুড়িয়ে যাবে।'

'আমি এখনই যাচ্ছি।' বিনয়ের কথা শুনে নিভা চলে গেল। তাব গতিপথের দিকে নন্দ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আহা, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!'

বিনয় মাথায় তেল মাখতে মাখতে বলল, 'আরে মশাই, আপনি এত দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন কেন? আপনার কেসে জয় অব্যর্থ!'

'সত্যি, বিন্যয়, সত্যি! আজ সাজটা ভালই হয়েছে, কি বল? এই ভাল জামা কাপড় পড়ে ছিল। ধোপার বাড়ি কাচাতে লাগল তিন টাকা।'

'আপনার সুদে আসলে উসুল হয়ে যাবে।'

'কলপটা নিল পাঁচ সিকে। বলেছিল এক টাকা ছ'আনা, আট পয়সার বেশী কিছুতে কমাল না। অথচ এই কলপের দাম ছিল আট আনা। কি দামই বাড়ছে বাবা, লুঠ, লুঠ চারিদিকে লুঠেরার রাজত্ব।'

'তাহলে ত আপনি অনেক খরচ করে ফেলেছেন একদিনে?'

তা হল বৈকি! ধর না, তিন টাকা আর পাঁচ সিকে—নাপিত বেটা দাড়ি কামাতে নিল চার আনা, মোট চার টাকা— চার টাকা আট আনা, মানে সাড়ে চার টাকা।'

'উঃ অনেক টাকা বেরিয়ে গেল ত আপনার। গিন্নী রাগ করল না?'

'দেখ, বিনয়', নন্দ রেগে বলল, 'কেবল গিন্নী গিন্নী কর না বলছি তাহলে একটা কেলেঙ্কারি করে বসব। আমার টাকা আমি খরচ করব, তাতে তার বাবার কি?'

'আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না।'

ওদিক থেকে নিভা ডাকতে লাগল, 'বিনয়বাবু—এখনও চানে গেলেন না।'

'এই যে যাই।'

নন্দ বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াও ভাযা। তুমি যে বলেছিলে 'লব্' করতে গেলে খরচ করতে হয়। তার একটা ফর্দ দেবে।'

'পরে দেব'খন।'

'না না পরে নয় ভায়া। বল'না মুখে মুখে। কি বলেছিলে তুমি? সিনেমায় যাওয়া, মোটরে হাওয়া খাওয়া, লেবেঞ্চুস চকোলেট দেওয়া, আচ্ছা বিনয়, ঐ লেবেঞ্চুস চকোলেটটা বাদ দেওয়া যায় না? ওগুলো ত ছোট খোকা-খুকুরা খায়।'

'ক্ষেপেছেন? সব ভেস্তে যাবে। আজকাল ধাড়ী খোকা-খুকুরাও ওগুলো ভারী ভালবাসে।'

'তাহলে লেবেঞ্চুস, চকোলেট, আর কি বল ত?'

'দাঁড়ান নেয়ে নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে সব বলছি।'

'বেশী দেরী হবে না ত?'

'না—না।'

'আচ্ছা আমি বসছি। দেখ বিনয, যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।'

'আচ্ছা, উনি ত আমায় 'লব্' করেন, ওঁকে আমি কি বলে ডাকব?'

'আপনার গিন্নীকে কি বলে ডাকতেন বিয়ের পর?'

'কেন? প্রিয়তমে, প্রাণেশ্বরী—।'

'হোপলেস।'

'কেন, কি হল?'

'ওসব কি আজকাল চলে?'

'তবে?'

'বলতে হয়, ডিয়ারেস্ট, ডার্লিং, হানি, সুইটহার্ট।'

'কি বললে? আবার বল।'

বিনয় পুনরাবৃত্তি করল। নন্দ নন্দী জপতে লাগল, 'ডিয়ারেস্ট, ডার্লিং, হানি, সুইটহার্ট।' বিনয় জামা-কাপড়, গামছা তুলে নিল। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই সে শুনল বাইরে থেকে কে কড়া নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি কি?'

বিনয় হতাশ হয়ে বলল, 'আসুন।'

ঘরে ঢুকল চঞ্চল। তার মুখের ঘা তখনও শুকোয়নি, স্টিকিং প্লাসটার লাগান। মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সমস্ত মুখটা খানিকটা বীভৎস আকার ধারণ করেছিল।

চঞ্চল নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করলুম, ভাবলুম এই ত নাওয়া খাওয়ার সময়। নিশ্চয় আপনাকে বাড়িতে পাব। ক্ষমা করবেন, আপনিই ত বিনয়বাবু?'

'আজ্ঞে হাঁ, আপনার নাম?'

'চঞ্চল রায়।'

'হাঁ হাঁ এবার মনে পড়েছে। পরেশবাবুদের সঙ্গে আপনার খুবই ঘনিষ্ঠতা। সেদিন একবার দেখেছিলুম কিন্তু আজ চিনতে পারিনি।'

'কি করে পারবেন? আমার একটা একসিডেন্ট হয়ে মুখটায় আঘাত লেগেছিল—তাই।'

'খুব সীরিয়াস হয় নি ত?'

'হয়েছিল, এখন খানিকটা সামলে নিয়েছি। আপনার সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে। আচ্ছা ইনি?'

'উনি, নন্দবাবু, ওঁনার বাড়িতে আমরা সবাই ভাড়া আছি।'

'হাঁ হাঁ মনে পড়েছে। সেদিন ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, ভালই হল। নমস্কার নন্দবাবু।'

নন্দ নন্দী চমকে উঠে বলল, 'ডিয়ারেস্ট, ডার্লিং, হানি, সুইটহার্ট।'

অবাক হয়ে চঞ্চল বলল, 'মানে?'

বিনয় বলল, 'না, না, ও কিছু নয়। নন্দবাবু, চঞ্চলবাবু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

চঞ্চল আবার বলল, 'নমস্কার।'

নন্দ অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'নমস্কার ডিয়ারেস্ট ডার্লিং, হানি, সুইটহার্ট।'

চঞ্চল বিনয়কে জিজ্ঞাসা করল, 'মশাই, এ বাড়িটা একটা পাগলাগারদ না কি?'

বিনয় হেসে বলল, 'না, না, তা ঠিক নয়।'

চঞ্চল বলল, 'দেখুন, ও কথা থাক, একটা কাজের কথা ওঁর সামনেই বলি, কি বলেন?

'তাড়াতাড়ি বলুন। কিছু মনে করবেন না, আমার বড্ড তাড়া আছে। এখনি নেয়ে পরেশবাবুদের ঘরে খেতে যেতে হবে।'

'পরেশবাবু আজকাল নিমন্ত্রণ খাওয়াচ্ছেন না কি?'

'তা নয়, নিভাদেবী নিজের হাতে খিঁচুড়ি রেঁধেছেন, তাই খাওয়া হবে। আসুন না, আপনিও দু'গরাস খেয়ে যাবেন।'

চঞ্চল বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি অমন মেয়ের হাতে খাই না।'

'কেন?'

চঞ্চল নির্লিপ্ত হবার ভান করে বলল, 'না, মশায়, পরের কুৎসা রটিয়ে আমার কি লাভ বলুন?'

কুৎসার কথা কানে যেতেই নন্দ নন্দীর চমক ভাঙ্গল। সে বলল, 'বলুন মশায়, আমার লাভ আছে।'

চঞ্চল বলল, 'না, আপনারা খেতে চান খান, কিন্তু আমি? ওরে ব্বাস্।'

'আরে ভণিতা রেখে বলুন কি হয়েছে।' নন্দ নন্দী দাবি করল।

'আমি ত আসতুম এখানে প্রায়ই, আসা ছেড়ে দিলুম কেন? ঐ জন্যে।' চঞ্চল রহস্য বাড়িয়ে তুলতে চাইল।

নন্দ বলল, 'কি জন্যে তাই বলুন।'

'ঐ যে মেয়েটা—' চঞ্চল ঘৃণ্য ইঙ্গিত করল।

বিনয় এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আপনি কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন।'

চঞ্চল বলল, 'আপনি চটছেন কেন? আমি বলছিলুম মেয়েটা কখন কি মিশিয়ে দেয় খাবারে—।'

নন্দ কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'মিশিয়ে দেবে মানে?'

চঞ্চল বলল, 'আরে মশাই ঐ ভয়েই ত আসি না। মেয়েটার স্বভাব যে ভাল নয়।'

নন্দ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'স্বভাব ভাল নয়?'

চঞ্চল জানাল, 'হাঁ, একদম নষ্ট।'

'নষ্ট!' নন্দ তাল ঠুকে বলল, 'বিনয়, তা হলে ত গিন্নী ঠিকই বলেছিল।'

বিনয় বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেখুন চঞ্চলবাবু, আপনার ভাসা ভাসা কথা আমার ভাল লাগছে না। কি বলতে চান খুলে বলুন।'

'ভাসা ভাসা কি মশায়?' চঞ্চল অবাধে মিথ্যে কথা বলে চলল, 'একদম সত্যি। আমি আজ ক বছর দেখছি। আগে ত আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। মেয়েটা আমায় প্যাঁচে ফেলবার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছিল?'

নন্দ এতক্ষণে বিশ্বাস করল অভিযোগটা, সে গরজে উঠল, 'সত্যি, একদম সত্যি, মেয়েটা আমাকেও প্যাঁচে ফেলতে চাচ্ছে।'

'তাই ত আপনাদের সাবধান করে দিতে এলুম।' চঞ্চল অম্লানবদনে বলে গেল।

কিন্তু চঞ্চলের কথার এক বর্ণও বিনয় বিশ্বাস করল না। তাব স্পষ্ট মনে পড়ল সেদিন নিভাদেবীই বলেছিল লোকটিকে, 'আপনি আমাদের বাড়ী পা দেন তা আমি চাই না।' কথাটা সেদিন হঠাৎ কেন জানা নেই, বিনয়ের খুব ভাল লেগেছিল। সে রুঢ়কণ্ঠে চঞ্চলকে বলল, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

চঞ্চল আহত হয়ে বলল, 'না এখনও বাকি আছে। কিন্তু আপনি এত ক্ষেপে উঠছেন কেন?'

নন্দ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন ত মশায় আরও কি জানেন? উঃ, কি শয়তানী, আমার বাড়ীতে বসে!'

চঞ্চল বলে চলল, 'বাপটা ত পাগল। ওদের চলে কি করে জানেন? মেয়েটা নিজের রূপ বেচে—'

ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল বিনয়, 'শাট্ আপ্—শাট্ আপ্, আই সে!'

নন্দকে মুরুব্বী পাকড়ে চঞ্চল বলল, 'দেখছেন মশায়, আমার কি অপরাধ? আমি ভাল মনে সাবধান করে দিতে এলুম, আর—'

নন্দ সমর্থন করল, 'সত্যিই ত আপনার কি অপরাধ? গিন্নী তাহলে ঠিক বলেছিল।'

বিনয় এবার রাগে ফেটে পড়ল, 'থামুন নন্দবাবু, আপনার লজ্জা করে না? আপনি নিজে দু'বেলা যাদের হাঁড়ির খবর রাখছেন, তাদের কি করে চলে, আপনি জানেন না? দিনের পর দিন পরের কাছে হাত পেতে, এক বেলা খেয়ে, উপোস করে কোনক্রমে তিনটি প্রাণী বেঁচে আছে, এসব দেখে আপনার কষ্ট হয় না? একটুও মন গলে না? আপনি নিজে সব জেনে শুনে এর কথায় নিভাদেবীকে সন্দেহ করছেন?'

নন্দ যুক্তির জোরে একটু পিছু হটল। সে আমতা আমতা করে বলল, 'তাই ত, তাই ত!'

চঞ্চল ব্যঙ্গ করে বলল, 'বিশ্বাস না হয়, আমি নাচার। বিনয়বাবুর কি? উনি একটু দরদ দেখিয়ে যদি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গ পান—'

'গেট আউট!' বিনয় আর থাকতে পারল না, গর্জন করে বলল, 'গেট আউট!'

'মানে?' চঞ্চল বিব্রত হয়ে বলল।

'গে—ট আউট।' বিনয় আরও জোরে চেঁচাল।

অনুযোগের সুরে চঞ্চল বলল, 'দেখছেন, একবার ভদ্রতা দেখছেন, নন্দবাবু? কি সব ভাড়াটে রেখেছেন আপনি!'

নন্দ যেন সম্বিত ফিরে পেল। বাড়ীর মালিকানা স্বত্বের কথা স্মরণ হতেই সে সদর্পে বলল, 'বিনয়, এ আমার বাড়ী। তুমি গেট আউট বলার কে হে?'

বিনয় নন্দর প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করে দু'পা এগিয়ে গিয়ে চঞ্চলকে আবার বলল,

'গেট আউট অর আই'ল্ থ্রো ইউ আউট।'

এখানে একটা মারামারি হলে গায়ের জোরে কে পারত বলা শক্ত, কিন্তু চঞ্চল একটা হাঙ্গামা বাধাতে চাইল না। ছোকরার মন বিষিয়ে দিতে না পারলেও চঞ্চলের উদ্দেশ্য আংশিক সিদ্ধ হয়েছিল, অন্ততঃ বাড়ীওয়ালা অভিযোগটা সত্যি বলেই ধরে নিয়েছিল। চঞ্চল আর কথা না বাড়িয়ে মানে মানে সেখান থেকে সরে পড়ল। কিন্তু নন্দ নন্দী তাকে এখনই ছাড়তে চাইল না। খিচুড়ি খাওয়া নন্দর মাথায় উঠল। সে চঞ্চলের উদ্দেশ্যে বলল, 'দাঁড়ান, স্যার, আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

যাবার সময় নন্দ বিনয়কে শাসিয়ে গেল, 'আমার বাকি ভাড়াটা কালকের মধ্যে চাই। নইলে তোমার নামে নালিশ করব, বিনয়।'

বালিকা অবস্থায় লিলির একটা মস্ত বড় পুতুল ছিল। লিলি তাকে বলত ছেলে। লিলি তাকে জামা-কাপড় পরাত, চান করাত, কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াত, নিজের পাশে নিয়ে ঘুম পাড়াত। ঠিক যেন একটা ক্ষুদে মা। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় তার ছেলে পুড়ে মারা গেল। দেওয়ালীর দিন সে রংমশাল জ্বেলে সেই ছেলের হাতে দিতে গিয়েছিল। রংমশালটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে পুতুলের কাপড়ে আগুন ধরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পুতুলটাও পুড়ে গেল। লিলির হাতেও ফোস্কা পড়েছিল। যতটা ফোস্কার জ্বালা না হক, তার চেয়ে পুতুলের শোকে লিলি তিন চার দিন কান্নাকাটি করে কাটিয়েছিল, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করেনি।

মা বলেছিল, 'তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। একটু পুতুলের শোকে এই করছিস, আর যখন জ্যান্ত পুতুল হবে তখন কি করবি?'

লিলি আবদার করল, 'আমায় একটা জ্যান্ত পুতুল দাও, মামণি।'

'দূর, মামণি আবার জ্যান্ত পুতুল দেয় না কি? সে ত বর দেয়।'

'তবে আমায় একটা বর এনে দাও, সে আমায় জ্যান্ত পুতুল দিক।' লিলি বায়না করল।

মামণি গালে আলতো করে চড় মেরে বলেছিল, 'কি দুষ্টু মেয়ে, বাবা! বরের জন্যে বুঝি তর সইছে না।'

পিসি বলত, 'ছেলে ছেলে করে মেয়ের আর তর সয় না।'

একটু বড় হয়ে যখন দাসীর কাছ থেকে লিলি সন্তান জন্মরহস্য জানতে পারল,

প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। ব্যাপারটা তার এতই জটিল লাগত যে কারুর কাছে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেত না। স্কুলের বন্ধু-বান্ধবীরাও স্পষ্ট করে কিছু জ্ঞান দিতে পারত না, শুধু হাসাহাসি, গা টেপাটেপি ইশারায়-ইঙ্গিতে কথা-বার্তা। একদিন আলমারির মধ্যে একটা লুকোনো বই তার হাতে পড়ল। নিশ্চয় মামণি লুকিয়ে রেখেছিল। বইটা পড়ে আর ছবি দেখে বিষয়টা পরিষ্কার হল অনেকটা। অবশ্য সবটা বুঝতে পারেনি। যৌবন সমাগমে বোঝবার ক্ষমতা বাড়ল।

লিলি সত্যি যেন তর সইতে পারছিল না। পুরুষের সঙ্গে মিলনের কথা ভাবলেই তার কেমন যেন সন্তানের আকাঙ্খা বেড়ে যেত। সারা শরীরের মধ্যে শিরশির করত, নবোদগত বুকটা টনটন করে উঠত। প্রাণপণে একটা বালিশ চেপে ধরলে বুঝি একটু শান্তি পাওয়া যেত। কলেজের মেয়েরা যখন পরিবার পরিকল্পনার কথা নিয়ে আলোচনা করত, লিলি সে সবের ধারে কাছে যেত না। সে চাইত একটা বৃহৎ পরিবার। অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মাঝে সে মহারানীর মতো বিরাজ করবে এই ছিল তার স্বপ্ন। তার কেমন একটা ধারণা হয়েছিল, স্বামী যদি দীর্ঘ বলিষ্ঠ হয়, তবে সন্তান সংখ্যাও হবে অনেক। তাই লিলির আকর্ষণ ছিল বলবান যুবকদের দিকে। মিনমিনে, প্যানপ্যানে, কবি-কবি ছেলেদের সে সন্তানের জনক হিসাবে কল্পনা করতে পারত না।

একদিন সে আদর্শ পুরুষ হিসাবে পেয়ে গেল চঞ্চল রায়কে। রাঁচীর মোরাবাদী পাহাড়ে ওদের দেখা। লিলিরা পিকনিক করতে গিয়েছিল মোরাবাদী হিলে। চঞ্চলের দলবলও ওখানে হাজির হয়েছিল। চঞ্চলরা কয়েকজন বন্ধু মিলে মোটরে করে রাঁচী বেড়াতে গিয়েছিল। তারা দল বেঁধে ছিল একটা হোটেলে। লিলির বাবা মজুমদার সাহেব একটা বাংলো ভাড়া নিয়েছিলেন। প্রথম দর্শনেই লিলি চঞ্চলকে ভালবেসে ফেলেছিল। প্রথম দর্শনটা বোধহয় ঠিক হল না, প্রথম আলিঙ্গনে বলাই বোধহয় ভাল, কেন না, ছোড়দিকে স্যাণ্ডউইচের প্লেটটা এগিয়ে দিতে গিয়ে লিলি স্লিপ করে গড়িয়ে পড়েছিল, আর একটু হলেই হয়ত হাত পা ভেঙ্গে যেত, হাড় চুরমার হ'ত, কিন্তু কাছাকাছি ছিল চঞ্চল, সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ফেলল। কি বলিষ্ঠ সেই আলিঙ্গন! লিলি সেই মুহূর্তেই নিজেকে চঞ্চলের কাছে মনে মনে উৎসর্গ করেছিল। আর চঞ্চলও তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। যে কদিন দুজনে রাঁচীতে ছিল, চঞ্চল লিলির সঙ্গ ছাড়তে চাইত না। দুজনে মিলে যেন রাঁচীর পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, মাঠ-প্রান্তর চষে ফেলেছিল। নিষ্পাদপ নীচু পাহাড়টার মাথায় পাশাপাশি শুয়ে শুয়ে দু'জনে আকাশের তারা গুণত; চঞ্চলের পেশীবহুল হাতের ওপর মাথা রাখলে লিলির কোনও কষ্ট হ'ত না। ছোট্ট নদীর শুকনো বালির ওপরে বসে ওরা অস্ফুট প্রণয়ালাপ করত, ক্ষেতে কাটা ধানের গোছার ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে পরস্পরের দেহ সান্নিধ্য উপভোগ করত। তাদের প্রেম যেন ছিল

আকাশের মতো উদার, পৃথিবীর মতো বিরাট, নদীর মতো চপল।

হুড্রু ফল্‌স্ দেখার সময় চঞ্চল বিয়ের প্রস্তাব করল। তিন চারটে তালগাছের সমান উঁচু পাথর থেকে প্রচণ্ড বেগে জলধারা ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। তার গর্জন কানে তালা ধরিয়ে দেয়। জলকণা ভিজে কুয়াশার জাল বোনে। একটা নিরালা পাথরের ওপর প্রচণ্ড আবেগে চঞ্চলও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লিলির দেহের ওপর। ভাগ্যে কেউ দেখতে পায়নি, আর দেখলেই বা কি হ'ত ? চঞ্চল যে কথা শোনাল, তাতে তাদের এই নিবিড় আলিঙ্গনে কারুর আপত্তি করবার নয়। লিলিও আপত্তি করেনি। চঞ্চল এইখানেই লিলিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করল। ঝরণার গর্জন ছাপিয়ে গেল চঞ্চলের ভরাট কণ্ঠ। লিলি রাজী হল। মজুমদার সাহেব যে রাজী হবেন, সে বিষয়ে লিলির সন্দেহ ছিল না। চঞ্চলের পরিবার সুপরিচিত, তাদের অবস্থাও খুব ভাল। ঘর বর যখন ভাল, মামণিই বা অপছন্দ করবে কেন ? লিলি রাজী হতে চঞ্চল অনেকগুলি চুমু খেয়ে, 'তুমি আমার কাছে কি চাও, ডার্লিং ?'

লিলি নিলাজের মতো বলেছিল, 'ছেলেমেয়ে, অনেক, অনেক ছেলেমেয়ে।'

'তুমি দেখছি সেকেলে বুড়ী! আজকের দিনে কোন মেয়ে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে চায় না কি ? ফিগার নষ্ট হবে শরীর ভাঙ্গবে—'

'তুমি তো ভারী জানো ?' লিলি মিষ্টি মুখভঙ্গী করে বলেছিল, 'প্রেমই হল সেকেলে। সন্তান না হলে ত প্রেমের পূরণ হয় না। আমার কিন্তু অনেক, অনেক ছেলেমেয়ে চাই।'

চঞ্চল আশ্বাস দিয়েছিল, 'আচ্ছা গো, আচ্ছা। হবে হবে, তুমি একেবারে কলির গান্ধারী হয়ে উঠবে।'

ওদের বিয়ের যখন কিছুদিন বাকী, একটা বেনামী চিঠি লিলির হাতে এসে পড়ল। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা লেখা ছিল চিঠিটায় চঞ্চলের সম্বন্ধে। তার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়, অনেক মেয়ের সঙ্গেই তার এফেয়ার্স আছে, ঐ বিয়ে করলে পস্তাতে হবে লিলিকে। লিলি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল অভিযোগগুলি। সে চিঠিটা চঞ্চলকে দেখিয়েছিল। চিঠি দেখে চঞ্চল যেন একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'হাতের লেখা দেখে ত মনে হচ্ছে মাধবীর চিঠি।' মাধবী তার বোনের বান্ধবী। দিনরাত চঞ্চলের পিছনে জোঁকের মতো লেগে আছে, তাকে বাঁধবার মতলব। ভারী কুচুটে মেয়ে! চঞ্চলের সামনে লিলি চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। চঞ্চলও আশ্বস্ত হয়েছিল। লিলি মনে মনে সেদিন খুশি হয়েছিল, চঞ্চলের মতো এমন বলবান্ সুপুরুষ যুবককে সে অন্য মেয়েদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজস্ব করে নিতে যাচ্ছিল বলে।

ঘটা করে ওদের বিয়ে হল। চঞ্চল ওকে নিয়ে হনিমুনে গেল। এদেশ ওদেশ নানা জায়গায় ঘুরল। লিলি চঞ্চলকে নিজস্ব করে একান্ত করে পেল, কিন্তু তার সন্তানের আশা পূর্ণ হল না। চঞ্চল বলত, 'ব্যস্ত কি ? এখনও ত সারাজীবন পড়ে রয়েছে।' কিন্তু

লিলি সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠল, চঞ্চলকেও ব্যস্ত করে তুলল।

কয়েকমাস পরে চঞ্চলের বাবা মারা গেলেন। শ্রাদ্ধশান্তির পর যখন তার উইল পড়া হল, দেখা গেল, চঞ্চলের বাবা তাকে সম্পত্তির জীবনস্বত্ব দিয়ে গেছেন, তার অবর্তমানে পুরো স্বত্ব তার পৌত্রাদির। এবার পুত্রমুখ দেখার জন্যে চঞ্চল নিজেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হতে চায় না। লিলি পাঁজিপুঁথি দেখে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করল পুত্রার্থিনী হয়ে, সেও বিফল, পূজো-প্রার্থনা, মানত-মাদুলি, ঠাকুর-দেবতা— অনেক কিছুই বরবাদ হল। ডাক্তার বৈদ্য হাকিম কিছুতেই কিছু হল না। স্ত্রীরোগ বিশারদ লিলিকে পরীক্ষা করে রায় দিল যতদূর মনে হয় লিলির শরীরে কোন দোষ নেই। বিশেষজ্ঞ চঞ্চলকে পরীক্ষা করে জানালেন, চঞ্চলেরই সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতার অভাব।

এর পর থেকেই চঞ্চলের ব্যবহারে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করল লিলি। চঞ্চলের মন বহির্মুখী। প্রায়ই তাকে বাড়িতে পাওয়া যেত না. এমন কি এক একদিন রাত্রেও সে বাড়ী ফিরত না। হরিচরণ নামে চতুর বয়স্য তার সঙ্গী। লোকটাকে দেখলে লিলির গা জ্বলে যায়। লিলির অভিমান অনুযোগ অভিযোগ সবই বৃথা হল। স্বামীর নানা কেলেঙ্কারির কথা লিলির কানে আসতে লাগল। পুরানো সেই বেনামী চিঠির কথা মনে পড়ল। তখন কেন সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল ঐ চিঠিটাকে, কেন ভাল করে খোঁজখবর নেয়নি। নিজের বাবা মার ওপর রাগ হল। তাঁরাই বা কেন বাধা দেন নি। চঞ্চল লিলিদের সমাজে একজন প্রখ্যাত লম্পট বলে কুখ্যাতি লাভ করল। লিলি ক্ষোভে অভিমানে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিল। লোকের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি কি অনুকম্পা তার মোটেই ভাল লাগত না। এমন কি সে নিজের বাপের বাড়ী যাওয়া-আসা কমিয়ে দিল। সে যেন স্বামীগৃহে স্বেচ্ছায় অন্তরীণ দশা বরণ করে নিল। সে নিজেকে গুটিয়ে নিল নিজের মধ্যে। তার বান্ধবীরাও ক্রমশ তাকে ত্যাগ করল। একমাত্র নিভা বলে মেয়েটি মাঝে মাঝে আসত, যতদিন সে পাশের বাড়ীতে থাকত। তার সঙ্গে কিছু সুখদুঃখের কথা হ'ত। কিন্তু ইদানীং সেও এবাড়ীতে আসা একদম বন্ধ করে দিয়েছিল। লিলি জানতে পেরেছিল নিভাও একদিন চঞ্চলের প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু সে মোহ তার ছুটে গিয়েছিল। এই শক্তমনা মেয়েটির ওপর লিলির শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। তাই যখন সে ভৃত্যমহলে গুঞ্জন শুনল বাগানবাড়ীতে নিভাকে ভুলিয়ে নিয়ে চঞ্চল অত্যাচারের ফন্দী করেছে, লিলি নিজেই ছুটে গিয়েছিল তাকে বাঁচাতে। তারপর কি হয়েছিল সে ঠিক জানতে পারে নি। খাবার পর কি ঘুম পেয়েছিল! সে শোবার ঘরে চঞ্চলের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে দু'চার কথা বলতে বলতে ঘুমে ঢলে পড়েছিল। তারপর যখন ঘুম ভাঙল, দেখল বাগানবাড়ীতে হৈচৈ। না কি পিছলে পড়ে গিয়ে চঞ্চলের মাথায় দারুণ চোট লেগেছিল. মুখও কেটে-ছড়ে গিয়েছিল। হরিচরণ ডাক্তার ডেকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়ে

দিয়েছিল। লিলি পতি সেবায় তৎপর হল। পরেশবাবু আর কাকীমাকে লিলি বাড়ি পাঠিয়ে দিল। নিভা না বলে কয়ে কখন চলে গিয়েছিল, লিলি জানতেই পারেনি। স্বামীকে অনেক দিন বাদে পর পর কিছুদিন কাছে পেয়ে লিলি বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল। তারপর একদিন চাকর রামু ভৃত্যমহলের কানাঘুষোর কথা লিলির কানে এনে তুলে দিল। নিভাদিদিমণির সঙ্গে বাবুর কি ঝগড়া হবার পর বাবু বৈঠকখানা ঘরেই পড়ে যান। দিদিমণিও দরজা খুলে ছুটে পালিয়ে যায়। আসল ঘটনার কথা জানতে লিলির প্রবৃত্তি হয় নি। নিভার ছুটে পালিয়ে যাওয়াটাই তাকে মনে মনে আশ্বস্ত করে তুলেছিল। চঞ্চল সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই হরিচরণের সঙ্গে শলাপরামর্শ জুড়ে দিল। নিশ্চ য় আবার কোন নারী-শিকারের ব্যাপার। বাঁধা-ব্যাগেজ নিয়েই চঞ্চল আবার বাইরে বেরতে শুরু করল। লিলির বারণ মানল না। লিলি আবার একা, নিঃসঙ্গ, সাথীহীন। সে কখনও আপন মনে বুনত, কখনও রেডিও শুনত, জানলায় বসে বসে লোকের আনাগোনা দেখত, দেশী-বিলাতি পত্রিকার পাতা ওলটাত, শিশুদের ছবি দেখত, কিন্তু তার নিরস দিনগুলি যেন কিছুতেই কাটতে চাই ত না।

লিলির সবচেয়ে ভাল লাগত ছেলেমেয়েরা যখন দল বেঁধে স্কুল থেকে ফিরত। তাদের কলকাকলি, হাস্যোচ্ছ্বাস, কলহ-বিবাদ জানালা দিয়ে দেখতে শুনতে ভারী মজা লাগত। আইসক্রীম, আলুকাবলি, পাঁঠার ঘুগনী, চিনেবাদাম, কিছুই খেতে বাদ দিত না ওরা, এসব নিয়ে ওদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এ সব দেখতে দেখতে লিলি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

সেদিন বিলাতী ম্যাগাজিনে উলের একটা নতুন প্যাটার্ণ চোখে পড়ায় লিলি সেটা তুলছিল আর রেডিওর শিশুমহলের প্রোগ্রাম শুনছিল। সেই প্রোগ্রাম শেষ হতে অন্য কি একটা পল্লীগীতি শুরু হল। মোটেই ভাল লাগছিল না তার। অথচ নিজে উঠে গিয়ে রেডিও বন্ধ করার ইচ্ছা হচ্ছিল না। এমন সময় রামু ঘরে ঢুকল। রামু তাদের বাড়ির পুরানো চাকর। এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে ঐ রামুই বোধহয় তার একমাত্র সুহৃদ। রামু ঘরে ঢুকতেই লিলি তাকে রেডিওটা বন্ধ করে দিতে বলল। বৌমণির হুকুম তামিল করে রামু মাথাটা চুলকে বলল, 'মাইনে না বাড়ালি আর ত চলছিনি, বৌমণি।'

'কেন?'

'চাইলের দাম হু হু করো্যে বেড়ে যাতিছে। সব জিনিসপত্র আক্রা। ছেলে বৌ উপোশ করতিছে। শাক পাতা খায়ে কোন গতিকে ধুক ধুক করতিছে।'

'তবে কি সত্যি সত্যি দুর্ভিক্ষ এল, ফ্যামিন্?'

'ফ্যান আর কনথে জোটবে, বৌমণি? চাইল কি আর রাখিছে? সব ধান কাড়ে নিছে, ক্যামন করো্যে যে প্যাট চলিবে তা ভগমানই জানেন।'

'বেশ ত তোমার যা টাকা দরকার ম্যানেজার বাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিও।'

'শুধু টাকায় কি হবে বৌমণি? পয়সা দিলেও জিনিস মিলতিছে না। আইজ্ঞে হয় ত ছোট ছাওয়ালডারে এখেনে নিয়ে আসি। আপনের আশ্রয়ে থাকলি দু'মুঠো খাতি পাবে।'

'তোমার ছেলেকে আনবে? সে ত খুব ভাল কথা। এ বাড়ীতে ছোট ছেলে নেই, না হয় একটা থাকল। তা সে তার মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?'

'খুব পারিবে, বৌমণি। নইলে প্যাটে না খাইয়ে মরবে।'

'বেশ, বেশ, রামু, তাই এনো।' লিলি খুশি মনে বলল।

বাইরের রাস্তায় ভিখারী চিৎকার করছিল, 'একটু ফ্যান দেও, মা, একমুঠো ভাত দেও মা।'

তার সঙ্গে সুর করে একটি ছোট ছেলেও পোঁ ধরেছিল, 'একটু ফ্যান দেও, মা, একমুঠো ভাত দেও মা।'

ভিখারি আবার চিৎকার করল, 'মা, একটু ফ্যান দেও।'

লিলি বলল, 'উঃ সকাল থেকে এদের চিৎকার আর শুনতে পারি না. রামু?'

'দুঃখী ভিকিরি, বৌমণি।'

লিলি যেন আপন মনে বলল, 'এ জগতে কে সুখী বলতে পার, রামু।'

'গরীবেরা ক্যামনে সুখ পাবে বৌমণি? আপনারা বড়লোক, আপনারা—'

'আরও দুঃখী, রামু, আরও দুঃখী।' লিলি দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখল।

ভিখারি চিৎকার করছিল, 'ছোট ছ্যালেডারে একমুঠো ভাত দেও মা। মা, মাগো—'

'ছোট ছেলে?' লিলি ঈষৎ সচকিত হয়ে বলল, 'দেখো ত রামু।'

রামু দরজা দিয়ে দেখে বলল, 'রোগাপানা লোকডা একডা লিগলিগে ছাওয়াল কোলে করি ভিক্কে চাইতেছে।'

লিলির দয়া হল, সে বলল, 'লিকলিকে ছেলে! আহা, ডাক ত ওদের।'

'এইখানে?'

'হাঁ, কি হয়েছে তাতে?'

'আচ্ছা' রামু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাকল, 'এই তুই আয়, এই দরজা দিয়ি আয়।'

তারপর বৌমণিকে বলল, 'ওদের বাড়ী ঢুকতি দিতি নাই, বৌমণি, ভ্যায়ানক চোর। কখন কি চুরি করি পালাবে।।'

'না রামু, কি আবার চুরি করবে?'

সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল সেই সহায়রাম আর তার কোলে শিশু মনু। ওদের হাল আরও খারাপ হয়েছিল। সহায়রামের মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি জঙ্গলের মতো দেখাচ্ছিল, তার সন্দিগ্ধ চোখ দুটি ইতস্তত দেখে বেড়াচ্ছিল। মনুকে সে জোরে আঁকড়ে

রেখেছিল।

'মা, এক মুঠো ভাত দেন মা, ছোট বাচ্চা কিচ্ছু খায নাই।'

লিলি জিজ্ঞাসা করল, 'ঐ বুঝি তোমার ছেলে?'

'হাঁ মা, দুঃখীর সন্তান, বুকের পাঁজর।'

'আহা ও খায়নি?'

'কোথায় পাবে মা? আজ দু'বেলা অনাহারে আছে।'

'ওর মা কোথায়?'

'ওরা কাড়ি নিয়েছে মা, ওরা কাড়ি নিয়েছে। গাঁ থাকি এলাম শহরে, ওরা কাড়ি নিল, মা।'

'কারা?'

'সে বড় নজ্জার কথা। সে তোমারে বলতি পারব নি। এখন ভগমানকে ডাকছি আর বাচ্চাটারে একমুঠো ভাত দিবার তরে হন্যে হয়ে ঘুরতেছি।'

'আহা, মা নেই।' লিলি কাছে গিয়ে মনুকে টেনে নামিয়ে নিল।

রামু বলে উঠল, 'আহা হা, কর কি, কর কি বৌমণি? বড় নোংরা যে! শেষে অসুখ করবে।'

'না, না, কিছু হবে না,' লিলি বলল, 'আহা বাছা না খেয়ে নেতিয়ে আছে! রামু, যাও তো, একবাটি গরম দুধ নিয়ে এস।'

'যাই, কি যে বাতিক! যাই।' রামু দুধ আনতে গেল।

লিলি জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম তোমার, খোকা?'

মনু নিরুত্তর।

'মনু বলে ডাকি।' সহায়রাম বলল।

'মনু, বেশ নাম। মনু।' ছেলেটির ছোট্ট লিকলিকে হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে লিলি বলল, 'কিন্তু বড্ড রোগা।' ছেলেটিকে দেখে লিলির ভারী কষ্ট হতে লাগল।

'খাতি পায় না, মা।' সহায়রাম কাতরভাবে বলল।

লিলির মনে হঠাৎ বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস এল। ছেলেটির উপর তার কেমন একটা মায়া পড়ল। সে বলল, 'বেশ, আমি খেতে দেব। তোমায় কাজ দেব। এই মনুকে আমি বড় করব, লেখাপড়া শেখাব, মানুষ করব।'

'মানে? আমার ছ্যালেকে?' সহায়রাম সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল।

'হাঁ, হাঁ, তোমার ছেলেকে আমি বড় করব, মানুষ করব।' লিলি বলল। ভাবল এমন একটা সদয় প্রস্তাব নিশ্চয় লোকটা মেনে নেবে। কিন্তু হঠাৎ সহায়রাম অন্য মূর্তি ধরল। সে সন্ত্রস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'না. না, আমার ছ্যালেডারে ফিরায়ে দাও। আমার

ছ্যালেডারে ফিরায়ে দাও।'

'কেন, ভয় পাচ্ছ কেন?'

'না, না, আমার ছ্যালেডারে কাড়ি নিও নি। আমার বউডারে ওরা কাড়ি নিল। আমার ছ্যালেডারে তুমি কাড়ি নিও নি।' সহায়রাম হঠাৎ যেন পাগলের মতো কথা বলতে লাগল।

'তোমার ছেলে তোমারই থাকবে, আমি শুধু—' লিলি লোকটিকে আশ্বাস দিয়ে বলতে গেল। কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই সহায়রাম মনুকে ছিনিয়ে নিল লিলির হাত থেকে, চিৎকার করে বলল, 'আমার ছ্যালেডারে তুমি কাড়ি নিবে? তুমি ডাইনী, তুমি ডাইনী, তুমি ডাইনী।'

লিলি ব্যাপারটা বুঝতে পারার আগেই আর অন্য কোনও কথা না বলে সহায়রাম মনুকে কোলে জাপটে ধরে সেখান থেকে ছুটে পালাল। 'তুমি ডাইনী।' কথাগুলি যেন লিলির গায়ে চাবুকের মতো লাগল। কি অন্যায় বলেছে সে? অথচ লোকটা এতবড় অভিযোগ শুনিয়ে গেল। ক্ষোভে লিলির মন ভারাক্রান্ত। নিশ্চয় লোকটা ভুল বুঝেছে। এই ভুল বুঝে যাওয়া ঠিক না। এটা পরিষ্কার করে দেওয়া ভাল। আর ছেলেটাও কেমন করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে ছিল। রামু যখন এক বাটি দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকল, সে দেখল লিলি স্তব্ধ হয়ে দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে। ভিখারীরা নেই।

রামু বলল, 'কি হল বৌমণি?'

'চলে গেল। রামু তুমি শীগগির যাও। এখনও বোধহয় বেশীদূর যায়নি ওরা। ওদের ফিরিয়ে এনে বল, এখানে নাই বা থাকল, ছেলেটাকে মুখের দুধটা খাইয়ে যাক।' এই অনুরোধ যেন লিলির নিঃসঙ্গ বক্ষ তোলপাড় করে বেরিয়ে এল।

চঞ্চল বাড়ীতেই ছিল। সে শোরগোল শুনে বাইরের ঘরে এসে হাজির। তার পরনে ড্রেসিং গাউন আর হাতে পাইপ।

চঞ্চল ঈষৎ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? দুধের বাটি নিয়ে এত ছোটাছুটি কেন?'

রামু বলল, 'এজ্ঞে এট্টা ভিকিরির ছোট ছাওয়াল।'

চঞ্চল বিদ্রূপ করে বলল, 'এখানে কি দানছত্তর খোলা হয়েছে?'

লিলি একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'সে খবরে তোমার দরকার কি?'

নকল বিনয়ের সঙ্গে চঞ্চল বলল, 'আই বেগ্ ইওর পার্ডন্, ম্যাডাম!'

লিলি এ ব্যঙ্গ গ্রাহ্য না করে বলল, 'তুমি শীগগির যাও রামু।'

রামু বলল, 'মিথ্যে যাওয়া বৌমণি। তারে এখন ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে নি।'

'তা হোক, তুমি দেখ না।'

'তবে তুমি দুধের বাটিটা ধর।' রামু লিলির হাতে দুধের বাটি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

চঞ্চল বিদ্রূপ করে বলল, 'বাঃ তোমায় চমৎকার করুণ দেখাচ্ছে, লিলি! মাদার উইথ আ পট অব্ মিল্ক্ বাট নো চাইল্ড!'

লিলি বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার উপহাস থামাবে?'

চঞ্চল আরও কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হরিচরণ এসে হাজির। সে বলল, 'নমস্কার স্যার। পেন্নাম হই বৌমণি।'

চঞ্চল বলল, 'আরে এস এস, হরিচরণ। তারপর কি খবর?'

'রাস্তার মোড়ে দেখি রামু ব্যাটা কাকে গরু খোঁজা খুঁজছে।' হরিচরণ বলল।

'তোমার বৌমণির ধম্মপুত্তুরকে।'

'তাই না কি?'

লিলি ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল, 'বলতে পারেন, রামু তাদের পেয়েছে কি না?'

'না, দেখলুম সে আস্তে আস্তে ফিরে আসছে।'

'ও'! লিলি হতাশ হয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করল।

চঞ্চল আবার ব্যঙ্গ করে বলল, 'ডার্লিং, ফিরে যাচ্ছ কেন? হরিচরণকেই দুধের বাটি দিয়ে যাও। ও না হয় তোমায় ধম্ম-মা বলবে, কি বল, হরিচরণ?'

হাত কচলে হেঁ হেঁ করে হেসে হরিচরণ বলল, 'সে কথা আর বলতে হবে, স্যার?'

'ব্রুট!' লিলি রাগ করে সেখান থেকে চলে গেল। চঞ্চল নিজের হৃদয়হীন রসিকতায় উচ্চহাস্য করে উঠল।

হরিচরণ উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে নিল বৌমণি কতদূর গেলেন। নিঃসন্দেহ হয়ে চুপিচুপি সে প্রশ্ন করল, 'যাক, কালকে কতদূর কাজ এগুলো স্যার?'

হতাশ হয়ে চঞ্চল বলল, 'সুবিধে হল না, হরিচরণ।'

'কেন? যা মতলব দিলুম—'

'খাটল না, হরিচরণ। বুড়ো বাড়িওয়ালা ক্ষেপে লাল। হয়তো তাদের তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু ছোঁড়াটা কিছুতেই টললো না।'

'হুঁ।'

চঞ্চল বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কিছুই ভাল লাগছে না। শেষে কি হার মানতে হবে?'

হরিচরণ এবার গম্ভীরভাবে বলল, 'সত্যি কথা বলব, স্যার?'

'বল।'

'আপনি মিথ্যে ক্ষেপে উঠেছেন। নিভাদেবীকে দেখতে এমন আর কি! ওকে

কাটান দিন। এবাব একটার যা সন্ধান পেয়েছি. স্যার, একেবারে—'

'আমার আর ও সব ভাল লাগে না, হরিচরণ।'

'খুব ভাল স্যার্। ইনি এখনও কলেজে পড়ছেন. দেখতে উর্বশী, নাচতে গাইতে ওস্তাদ। স্যার্ বিরূপাক্ষের ছেলে তাব জন্যে একেবারে পাগল। আমায় রোজ খোসামোদ করছে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে, মালটিকে আপনার জন্যে বুক করে রেখেছি, বলেন ত একদিন ফারপো কি গ্র্যাণ্ডে—'

'না, হরিচরণ, না। আর ওসব না। নিভাকে আমি সত্যি ভালবেসেছি, ও যতই আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছে, ওর ওপর আমার ভালোবাসা ততই বেড়ে চলেছে। চঞ্চলের স্বরে প্রকৃত আকুলতা।

হরিচরণ ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তাহলে ত বিপদ স্যার্! এই গরীবের অন্ন ঘুচল। অনেক সতী সাধ্বীও পথে বসল রোজগেরের অভাবে।'

চঞ্চল আপন মনে বলে চলল, 'ভালবাসা কি তা আমি জানতুম না। মেয়েদের নিয়ে পুতুলের মতো খেলা করেছি। প্রয়োজন মিটলে বিদেয় করে দিয়েছি। কিন্তু নিভা আমার মনে একি পরিবর্তন এনে দিল?'

'ও দু'দিনের মোহ, স্যার, ওঁকে পেলেই এ মায়ার ঘোর কেটে যাবে।' হরিচরণ বিজ্ঞের মতো টিপ্পনী কাটল।

'তা হয় ত যাবে না, হরিচরণ। মানুষ চিরদিনই কি একরকম থাকে? তার কি পরিবর্তন হয় না?'

'কিন্তু এ মেয়েটিকে একবার চোখে দেখুন স্যার। তখন অন্যদিকে নজর যাবে না।'

'না, হরিচরণ।'

'তাহলে ত আমায় ছুটি দিতে হয়, স্যার,' হরিচরণ সিধে কথা বলে ফেলল, 'আমি অন্য কাপ্তেন পাকড়াই।'

'বেশ ত।'

'বেশ বললেই ত হয় না, আমার টাকাটা?'

'কিসের টাকা?'

'বলেন কি, স্যার? আপনার কাছে যে আমার প্রায় সাত হাজার টাকা পাওনা।'

'কি রকম?'

'কেন?' অনুপমার খাতে বাকি দু'হাজার আর নিভাদেবীর ব্যাপারে পাঁচ হাজার।'

'কিন্তু অনুপমার বাবদ তোমায় ত তিন হাজার টাকা দিয়েছি, হরিচরণ।'

'ওতে কি গরীবের পেট চলে, স্যার। কত বিপদ আমায় ঘাড়ে নিতে হয়, স্যার, তা'ত আপনি জানেন। একটু বেচাল হলে কয়েক বছরের মতো ঘানি টানতে হবে।'

'সে না হয় বুঝলুম। কিন্তু নিভার ব্যাপারে ত তোমার প্ল্যান খাটল না, হরিচরণ, তবে তুমি কেন এত টাকা চাইছ?'

'সে কি আমার দোষ স্যার? আপনার হাতের মুঠো থেকে পাখি উড়ে গেল, তাতে গরীবের টাকা মারা যাবে কেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরে হবে'খন।'

'হবে হবে করে ত অনেকদিন কেটে গেল, স্যার। আর ত আমি দেরি করতে পারি না। এদিকে আপনি আবার কেমন বদলে যাচ্ছেন। টাকাটা তো চাই।

'বেশ ত, দু'পাঁচ দিন পরে নিও।'

'না স্যার, আজকেই বিশেষ দরকার। অনুপমাকে নিয়ে তীর্থে যাব ঠিক করেছি। অনেক টাকার ধাক্কা। নগদ টাকা আজই না হলে চলবে না।'

'এ তুমি অবুঝের মতো কথা বলছ হরিচরণ, এত টাকা আমি এখন কোথায় পাব?'

'আপনাকে ত অনেক দিন ধরে বলছি, স্যার। আপনি ত গরীবের কথা কানেই তুলছেন না। জরুরী দরকার। টাকা আজই চাই।'

চঞ্চল এবার চটে গেল, 'জুলুম না কি? বলছি টাকা হাতে নেই। বারবার সেই একই কথা। টাকা আমি দেব না।'

হরিচরণও সুর চড়াল, 'কিন্তু ওটা যে দিতেই হবে স্যার।'

'দেব না, দেব না, দেব না, এক পয়সাও দেব না।'

হরিচরণ এবার স্বমূর্তি ধরল, সে শাসাল, 'তা হলে অনুপমাকে আদালতে দাঁড় করাতে হয়, স্যার্।

চঞ্চল একটু চমকে গেল, বলল, 'মানে?'

'আপনার নামে কেস করাতে হয় স্যার, ঘরের-বউকে ফুসলানো, বলাৎকার।' নির্মম উক্তি হরিচরণের।

'স্টপ ইট, আই সে।' ভীত চঞ্চল ধমক দিল।

'থামছি, স্যার। টাকাটা ফেলে দিন।'

ব্ল্যাকমেল্? ভেবেছ আমি তোমায় ভয় করি? তোমায় এক কানাকড়িও দেব না।'

হরিচরণ বোঝাল, 'তাহলে বড় কেলেঙ্কারি হবে স্যার। বড় ঘরের দেদার মজা। লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। কাগজে রোজ রোজ কেচ্ছা বেরুবে, লজ্জা, লজ্জা, জরিমানা, এমন কি কয়েক বছরের জেল।'

চঞ্চল বুঝল সে জটিল ফাঁদে পা দিয়েছে। সে এবার ধূর্ত বয়স্যকে অনুনয় করল, 'হরিচরণ, বী রীজনেবল্। তুমি অবুঝ হোয়ো না।'

'টাকাটা আজ দিয়ে দিলে সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায় স্যার। বিশেষ দবকাব তাই না চাচ্ছি। আপনাকে বলতে সংকোচ হয়, স্যার, আপনার এঁটো পাতা এখন আমি চাটছি, ঐ অনুপমা আমার ওপরে ভর করেছে, টাকা না পেলে অনুপমা আমায় বাড়ী ঢুকতে দেবে না, স্যার।'

'হরিচরণ, তুমি অনুপমাকে বুঝিয়ে বল, আমার হাতে এখন অত টাকা নেই।'

'কিন্তু বৌমণির হাতে ত আছে।'

'শাট আপ, ইউ সোয়াইন! তোমায় টাকা দিতে আমি লিলির কাছে হাত পাততে যাব?'

'ক্ষতি কি? তিনি ত সতী-সাধ্বী স্ত্রী। আপনাকে খুব ভালবাসেন শুনেছি।'

'সে বিচার তোমায় করতে হবে না। তার কাছে আমি টাকা চাইতে পাবব না।'

'আপনার লাঞ্ছনা, আইন আদালত, জরিমানা জেল। সেসব কি ভাল হবে? সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না। ভদ্রলোকে আর বাড়ী ঢুকতে দেবে না। সে কি আপনি সইতে পারবেন, স্যার?'

চঞ্চল এবার সত্যি সত্যি ভয় পেল। সে একটু ভেবে সুর নরম করে বলল, 'হুঁ, তোমার পাল্লায় যখন পড়েছি, জানি আমার সহজে পরিত্রাণ নেই। কি কবত হবে বলো আমায়।'

'বৌমণির হাতে অনেক টাকা শুনেছি। সাত হাজার চেয়ে নিন। তিনি সতী-সাধ্বী স্ত্রী। বললেই ফেলে দেবেন।' হরিচরণ সাফ পরামর্শ দিল।

চঞ্চল শেষবারের মত বলল, 'কিন্তু তার কাছ থেকে টাকা চাইব?'

'তাতে আর লজ্জার কি, স্যার? না হয় ধার বলে নিন।'

কথাটা মন্দ বলেনি হরিচরণ, হয়ত ধার বলে চাইলে সমস্যার সমাধান হয়। চঞ্চল বলল, 'আচ্ছা দেখি।' সে ডাকল, 'লিলি, লিলি।'

লিলি এল। খুব গম্ভীর ভাবে বলল, 'আমায় ডাকছ কেন?'

'শোন লিলি, বড় বিপদে পড়েছি। আমার সাত হাজার টাকার এখনি দরকার। নগদ টাকা, নইলে মান সম্ভ্রম সব যায়। দেবে টাকা? তোমার ত অনেক টাকা আছে।'

লিলি হরিচরণের দিকে সন্দিগ্ধ ভাবে চেয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, 'বিশেষ দরকারটা কি জানতে পারি না?'

চঞ্চল ইতস্তত করে বলল, 'মানে বিশেষ দরকার। ইয়ে হয়েছে—হরিচরণ আমার কাছে সাত হাজার টাকা পাবে কি না, ওর এখনই চাই, নইলে চলবে না।'

'সে টাকা দু'দিন পরে দিও না।' লিলি বলল।

হরিচরণ বলল, 'আমার আজই চাই বৌমণি।'

'চাই বললেই ত আর পাওয়া যায় না। আমি যদি না দিই? 'লিলি শান্ত সুরে প্রশ্ন করল।'

'বড় মুশকিল হবে বৌমণি। বাবুর নামে নালিশ করতে হবে।' হরিচরণ স্পষ্টই শাসাল।

'কি রকম?' লিলি জিজ্ঞাসা করল।

'এই অনুপমাকে ফুসলানো, বলাৎকার—' হরিচরণ নির্লজ্জের মতো বলে যাচ্ছিল। চঞ্চল তাকে বলল, 'থামো, হরিচরণ।' তারপর লিলিকে কাতর সুরে অনুনয় করল, 'লিলি, ওরা সব এক জোট হয়েছে, টাকা ওদের দিতেই হবে, নইলে নালিশ মকদ্দমা, জরিমানা জেল—'

লিলি একমুহূর্ত কি ভাবল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'টাকা আমি দেব না।'

'দেবে না?' চঞ্চলের ব্যাকুল প্রশ্ন।

হরিচরণ আবার বোঝাতে চাইল, 'বাবুর নাম ডুববে, বৌমণি।'

লিলি একটুও নরম হল না। সে বলল, 'তা ডুবুক, আমি এক পয়সাও দেব না।'

চঞ্চল এবার ভেঙ্গে পড়ল, 'সে কাকুতি-মিনতি করল, 'লিলি, ছেলেমানুষী কর না, তুমি বুঝতে পারছ না কত বড় কেলেঙ্কারি হবে। আইন আদালত, ফাইন, চার পাঁচ বছরের জেল।'

'তা হোক, আমি এক আধলাও দেব না।'

'লিলি, তুমি কি পাগল হলে? এই তুমি আমায় ভালবাস?'

'আমার ভালবাসার বিচারক তোমায় করিনি। ভালোবাসার তুমি কি জানো?'

হরিচরণ বলল, 'আপনি সতী-সাধ্বী স্ত্রী, বৌমণি। স্বামীর এই বিপদে—'

'থামুন হরিবাবু, আপনাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমার কর্তব্য কি তা আমি ভাল করেই জানি।'

চঞ্চল এবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'জান যে টাকাটাই তোমার কাছে বড়, আমি কেউ নই। তোমায় আমি চিনেছি। লোকের কাছে ভালোবাসার অভিনয় করে তুমি প্রমাণ করতে চাও, তুমি খুব উদার পতিপ্রাণা আর আমি জঘন্য শয়তান, এমন সাধ্বী স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করি। আজ বুঝেছি তোমার চালাকি। তুমি আমায় কোনদিন চাওনি, চেয়েছ আমার টাকাটাকে, তাই আমার কাছে টাকা লুটে নিজের লোভ চরিতার্থ করেছ।'

লিলি শান্ত অথচ কঠিন স্বরে বলল, 'তুমি ভুল করছ, তোমার কাছ থেকে আমি এক কপর্দকও নিইনি, এ তুমি ভাল করেই জানো। এ টাকা আমার বাবা আমায় দিয়েছিলেন।'

'বেশ, তাই যদি হয়, ভালবাসার খাতিরে তুমি নিজের টাকা আমায় ধার দিতে পার না?'

'না, তোমায় ভালবাসি বলেই দিতে পারি না।'

'মানে?' ও সব হেঁয়ালী রাখ, একটা খোলা কথা হয়ে যাক।'

'দেখো তোমার কাছে আমার কাজের কৈফিয়ত দিতে লজ্জা করে। তবুও শুনে রাখ, তোমায় ভালবাসি বলেই টাকা দেব না। তুমি অনেক পাপ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করনি। তোমার শাস্তি দরকার। কঠোর শাস্তির আগুনে তোমার অন্তরের আবর্জনা পুড়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে, এই আমার বিশ্বাস। তাই আমি টাকা দেব না।'

লিলির এই আকস্মিক দৃঢ়তায় চঞ্চল বিমূঢ়ের মতো নির্বাক্ দাঁড়িয়ে রইল। এরপর আর কি জবাব আছে?

লিলি দৃঢ়পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চঞ্চল জটিল অবস্থাটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগল।

হরিচরণ দমবার পাত্র নয়, সে বাঁকা সুরে বলল, 'আচ্ছা, তবে এখন আসি, স্যার। আদালতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে চঞ্চলকে ডুবিয়ে দিয়ে হরিচরণ চলে গেল।

বিনয় নিভার একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিল। কাজটা অবশ্য অস্থায়ী। সমবায় বিপণির সেলস্ গার্ল। একটি মেয়ে ছুটিতে গিয়েছিল। তারই জায়গায় বদলি। মাত্র দেড় মাসের মতো কাজ মাইনেও কম। তবু নিভা যেন হাতে স্বর্গ পেল। দিনরাত সাংসারিক দুশ্চিন্তা, আর্থিক অনটন, পাগল বাবার চেঁচামেচি, কর্মহীনতার গ্লানি, অন্তত এসবের হাত থেকে ত খানিকটা মুক্তি পাওয়া গেল। নতুন পরিবেশ। সুরম্য বিপণি। ক্রেতাদের যাতায়াত। লোভনীয় পোশাক পরিচ্ছদ শাড়ী ব্লাউজ নাড়াচাড়া করা। বেশ যেন নতুন জগতে গিয়ে পড়ল নিভা। যাতায়াতের পাথেয় স্বরূপ কিছু টাকা বিনয় নিভার হাতে গুঁজে দিয়েছিল। আর দিয়েছিল তাঁতের ডুরে শাড়ী। শাড়ীটা পেয়ে নিভা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিনয় বলল, 'ওসব রংচটা শাড়ী পরে আপনি কাজে যেতে পারবেন না। এতে আপনার লজ্জা না হতে পারে, কিন্তু আমার লজ্জা করবে। যে বন্ধুটি এই কাজ করে দিয়েছে, সে ভাববে কি? এমন অবস্থা যে একটা নতুন শাড়ীও জোটে না?'

'এটা ত মিথ্যে কথা নয়।' নিভা বলল।

বিনয় বলল, 'দেখুন সব জায়গায় সত্যি খাটে না। এসব ছোটোখাটো মিথ্যেরও

দরকার।'

নিভা যখন নতুন ডুরে শাড়ীটা পরে বিনয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বিনয় ভাল করে চেয়েও দেখল না, মুখ ফুটে একবার বলল না কেমন দেখাচ্ছে।

লোকটিকে নিভা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। চঞ্চলকে বোঝা যায়, নন্দবাবুকে তবু বোঝা যায়, কিন্তু বিনয় দুর্জ্ঞেয়। কখনও প্রাণখোলা হাসি ঠাট্টা, আলাপ আলোচনা করত সে, আবার কখনও নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিত। নিভা এত কাছাকাছি আসা-যাওয়া করত, বিনয়ও অসংকোচে মেলামেশা করত, তবু কোনওদিন সে নিভার দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে চায়নি, নিভার দেহের প্রতি লোভ প্রকাশ করেনি। প্রথমদিন কাজে যাবার সময় বিনয়ই তাকে বিপণিতে পৌঁছে দিয়ে এল, বিকেলে ছুটির সময় তার জন্যে অপেক্ষা করল, দু'জনে কার্জন পার্কে বসে চিনেবাদাম খেতে খেতে কত রকমারি কথা বলল, একই সঙ্গে পাশাপাশি বাসায় ফিরল, অথচ কোথাও এটা প্রকাশ পেল না যে বিনয় নিভার জন্যে বিশেষ ব্যাকুল, যেমন প্রেমিক হয় প্রেমিকার জন্যে। এত কাছাকাছি, তবু যেন ছাড় ছাড় ভাব। দু'জনের খুব বন্ধুত্ব, সেটা যেন দেহাতীত।

এক এক সময় এই সম্পর্কটা নিভার পছন্দ হত না। সে চাইত বিনয়ের কাছে ছুটে যেতে, শুধু অভাব অনটনের কথা নয়, শুধু সুখ-দুঃখের কথা নয়, মনের কথা, হৃদয়ের আবেগের কথা বলতে, শুধু কথা নয় দু'জনে দু'জনকে নিবিড় করে পেতে। কিন্তু বিনয় যেন অন্য এক ধরনের। কাছে থেকেও সে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়। যে বরতনুর দিকে রাজ্যের লোক চেয়ে থাকে, যাকে পাবার জন্যে চঞ্চল পাগল হয়ে ওঠে, নিভৃতে নিকটে পেয়েও বিনয় তার দিকে মন দেয় না।

বড় লেখক হবার বাসনা তার। লেখায় বসলে অন্য কোনও দিকে তার হুঁশ থাকে না। সে এখানে সেখানে ছুটে বেড়ায় বিচিত্র চরিত্রের সন্ধানে, নতুন আইডিয়া, নতুন প্লটের খোঁজে। কিন্তু তার কাজ কারবার হল গরীব-দুঃখীদের নিয়ে। সে যত না লেখে, তার চেয়ে ভাবে।

সেদিন হঠাৎ বিনয় বলে বসল, 'জানেন, নিভাদেবী, আজ বেশ্যাবাড়ী গেছলুম।'

নিভা একটু চমকে উঠেছিল। বিনয় সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'না, না, ভয় পাবেন না। আমি রাত্রে যায়নি, দিনের বেলায় গেছি। অবশ্য দিনের বেলায়ও নিরাপদ নয়।'

নিভা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, 'আবার এসব খেয়াল হল কেন? আর আমাকেই বা শোনাচ্ছেন কেন?'

'আপত্তি করেন ত বলব না', বিনয় বলল, 'আমি অবশ্য কোনও কুমতলব নিয়ে যাইনি। গেছলুম আমার লেখার প্লট সংগ্রহ করতে।'

'কেন, সারা দেশে প্লট ছড়িয়ে রয়েছে, আর জায়গা পেলেন না?' নিভা ঈষৎ ব্যঙ্গ

করল।

'ওখানে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না', বিনয় বলল, 'ঐ যে সহায়রাম বলে লোকটাকে কেন্দ্র করে নতুন যেটা লিখছি, সেইটের আরও খবরের জন্যে যেতে হল। আপনি বোধহয় জানেন না, লোকটার বৌ আজকাল ঐ বৃত্তি নিয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে তার কাছে গেলুম। ইচ্ছে ছিল যদি তাকে ফিরিয়ে এনে স্বামীর সঙ্গে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া যায়।'

'কি হল?'

'সুবিধে হল না। মেয়েটা লোভে পড়ে একবার যে ফাঁদে পা দিয়েছে, সেখান থেকে এখন বেরোনও শক্ত। বাড়ীউলিটি দজ্জাল ধুরন্ধর মেয়েছেলে, যেন মিছরির ছুরি। আমি যেতে কত খাতির। সদু, মানে ঐ সহায়রামের বৌ এল। তাকে অনেক বোঝালুম, কিন্তু সে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে রাজী হল না। সেই এক কথা, ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল দেবার গোঁসাই। অভাবে পড়ে অনেকে ঐ পথে যায়। কিন্তু সবাই কি যায়?'

এই প্রশ্নের কি জবাব দেবে নিভা?

আরও প্রশ্ন জাগে নিভার মনে। অভাব, অভাব, চারিদিকে এত অভাব কেন? অথচ সবাই ত অভাবী নয়।

বিনয় বলল, 'অভাবটা মানুষের সৃষ্টি। ঈশ্বর ত কাউকে ধনী কাউকে গরীব করে পাঠাননি। মানুষ নিজেই ধনী গরীব সৃষ্টি করেছে। নতুন কালের চেষ্টা হচ্ছে এই বৈষম্যকে দূর করার।'

'সত্যিই কি চেষ্টা হচ্ছে? তবে গরীবী কমছে না কেন? যে কাজ চায় সে কাজ পাচ্ছে না, যে খেতে চায় সে খেতে পাচ্ছে না। যে ঘর চায় সে পথে পথে কাটাচ্ছে। অথচ যাদের আছে, তারা খেয়ালখুসি মতো দুহাতে টাকা ওড়াচ্ছে।' নিভা চিন্তিত হয়ে বলল।

বিনয় বলল, 'এ অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। এ অবস্থা একদিন ভেঙ্গে পড়বে, ভাঙ্গার জন্যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদলে দিতে হবে মানুষের অন্তরকে। নইলে বাইরের খোলসটাই পালটাবে, ভিতরের কুটিল সাপ থেকে থেকে মাথা চাড়া দেবে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে, ছোবল মারবে।'

'সেই জন্যেই কি আপনি লিখছেন?' নিভা জানতে চাইল।

'লেখার চেষ্টা করছি।'

নিভা মনে মনে ভাবে লেখার চেষ্টা যারা করে তারা কি ভালবাসে না, তারা কি দেহ সংসর্গ চায় না, তারা কি ঘর বাঁধতে চায় না? বিনয়কে দেখে ত মনে হয় তাই।

মরুক গে। এসব কথা ভাবার এখন সময় কই? চাকরি ত একটা কিছুদিনের জন্যে জুটল, কিন্তু হাতে টাকা নেই, মাস কাবারের আগে কিছু পাওয়া যাবে না। এদিকে বাবার অবস্থা দিন দিন জটিল হয়ে উঠছিল। ঘুমের ওষুধটা ফুরিয়ে গিয়েছিল। পয়সার অভাবে কেনা যায়নি। অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা গেল না।

এমন অবস্থায় একদিন মা চিন্তিত হয়ে বলল, 'কি করা যায় বল ত মা, বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়েছে, বলে উঠে যাও।'

মা'র সিঁথির সিঁদুরটা আরও চওড়া হয়েছিল, কপালের টিপটাও জ্বলজ্বল করছিল। মা'র পূজার্চনা আজকাল খুব বেড়ে গিয়েছিল।

নিভা বলল, 'তা ত বলবেই মা। ক'মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে।'

'পড়েছে ত হয়েছে কি?' হৈম বলল, 'উনি যখন চাকরি করতেন, মাস মাস ভাড়া চুকিয়ে দিইনি? এই তিনটে মাস যা দিতে পারিনি। আবার অবস্থা ফিরলেই বুড়োর নাকের ওপর টাকা ছুঁড়ে দেব।'

নিভা নিরুত্তর হল।

হৈমর আশা কবে পূর্ণ হবে কে জানে? সে এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'মিনসে কি বলে জানিস? বলে আমার মেয়ের নাকি স্বভাব-চরিত্তির খারাপ!'

'তাই না কি?' নিভা নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করল।

মা রেগে বলল, 'বুড়ো ড্যাব্‌ড্যাব্ করে যদি আমার মেয়ের দিকে ফের তাকায়, তবে গরম শিক দিয়ে চোখ গেলে দেব, হ্যাঁ।'

'তার শাসন পরে হবে। আজ খাবার জোগাড় কি করেছ তাই বল।'

'বলব আবার কি? হাওয়া গিলে থাকবে। সকাল থেকে খাই খাই করে উনি চেঁচাচ্ছিলেন ষাঁড়ের মতো, দিলুম শিকলি দিয়ে দোর বন্ধ করে পাশের ঘরে। থাক ত বন্ধ। কে আবার এখন ওঁর হাতে মারধর খেতে যায়?'

'নিজেদের জন্যে ভাবি না মা। না খেতে দিয়ে বাবাকে ক'দিনই বা রাখবে? কার কাছে হাত পাতি?'

'যার কাছেই হোক, ঐ হতচ্ছাড়া চঞ্চল ছোঁড়াটার কাছে নয়। উঃ ওর পেটে পেটে এত শয়তানী! কেমন মিষ্টি করে কথা বলত। মিছরির ছুরি!' বিরক্তির সঙ্গে হৈম বলল। সে মেয়ের কাছে বাগানবাড়ীর ঘটনা খানিকটা শুনেছিল। নিভা লজ্জাবশে মার কাছেও সবটা বলতে পারেনি। এতেই হৈমর ধারণা পাল্টে গেল চঞ্চল সম্পর্কে!

নিভা সায় দিয়ে বলল, 'আমি ত তোমায় আগেই বলেছিলুম, মা।'

'কে জানত বাবা, ওর মধ্যে এত্ত শয়তানী লুকিয়ে আছে? বাগানবাড়ীতে বিষ খাইয়ে মেরেই ফেলত। ভাগ্যে তোকে বিষ খাওয়াতে পারেনি।' সব লক্ষ্মীছাড়া, জগৎসুদ্ধু

সবই লক্ষ্মীছাড়া। দেখ না একবার বিনয়ের কাছে। পরে শোধ করে দেব।'

'উনি ত অনেক করছেন, 'ওঁর কাছে এখন ধার চাওয়া মানে ওঁকে লজ্জা দেওয়া। ওঁর নিজেরই চলে না।'

'ও অত বড় ছোঁড়া, করে কি? দু'পয়সা মোটা রোজগারের ক্ষমতা নেই?'

মার কথায় নিভা একটু অস্বস্তিবোধ করল, সে বলল, ওঁর দোষ কি মা? উনি সরস্বতীর আরাধনা করেন। জানো না লক্ষ্মী-সরস্বতীর ঝগড়া।'

'তুই আর জ্বালাসনি বাপু। ওর হয়ে কথা কইতে হবে না।'

'মা, আরও তিন জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করে দিলুম।'

'তুই করছিস চাকরি! এও দেখতে হল?'

'ক্ষতি কি? অনেক মেয়েই ত চাকরি করে। পেট চালাতে হবে ত।'

'না, না বাপু, শুনেছি লোকগুলোর স্বভাবচরিত্তির খারাপ। তোর এমন রূপ! ওঁকে কবে থেকে বলছি, মেয়ে বড় হল, বিয়ের ঠিক কর। কানে কি তুলতেন আমার কথা? হেসে বলতেন, কি আর বয়েস? পড়ছে—পড়ুক। এখন ঠেলা সামলাও। পয়সার অভাবে পড়া বন্ধ। ওঁর মাথা খারাপ। চিরকাল কি আইবুড়ো হয়েই থাকবি?

'নাই বা হল বিয়ে?'

'বলিস কি? গেরস্তর মেয়ে, স্বামী ছাড়া কি গতি আছে?'

নিভা এবার ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'কিন্তু কি গতি হয়েছে তোমার? তুমিও ত বিয়ে করেছিলে, এখন দুর্গতির শেষ নেই। পেটে নেই ভাত, গায়ে ছেঁড়া কাপড়। লোকের কাছে মুখ দেখাবার অবস্থা নেই।'

'আমার মেয়ে হয়ে ও কথা কি বলছিস তুই? হলই বা অবস্থা খারাপ। তাই বলে বিয়ে মন্দ? এই বুঝি তোদের শিক্ষা হচ্ছে? মাথায় যে এই সিঁদুর, হাতে যে এই নোয়া, এর চেয়ে দামী কি আছে রে?'

নিভা অভিমান করে বলল, 'কিসের দাম? তুমিই কেবল কাচকে হীরের মর্যাদা দিয়েছ। এই যে তুমি আজীবন সৎপথে থেকেছ। জ্ঞানত কোন পাপ করনি, রাতদিন স্বামীর সেবা করেছ, কি লাভ হয়েছে তোমার? কি দাম দিয়েছে সমাজ তোমার সতীত্বের, তোমার পতিভক্তির?'

হৈম বলল, 'তুই হাসালি নিভা! সমাজ আবার কি দাম দেবে? এ যে অমূল্য! এর দাম নিজের মনের কাছে, আর তাঁর কাছে, যিনি আছেন ওপরে।'

মা হাতজোড় করে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

'কেউ নেই মা, ওপরে কেউ নেই, ওপরে সব শূন্য ফাঁকি।' নিভা যেন অতিকষ্টে রোদন রুদ্ধ করে রাখল।

মা নিভাকে বুকে টেনে নিল, মেয়ের মাথায় সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে মৃদু গলায় বলল, 'ছিঃ মা, ও কথা বলতে নেই। আলোর পাশে যেমন ছায়া, সুখের পাশে তেমনি দুঃখ। সুখ-দুঃখ নিয়েই সংসার। দুঃখ পেয়ে টলতে আছে কি? এই হলো তাঁর পরীক্ষা।'

নিভা করুণস্বরে বলল, 'ও পরীক্ষায় বোধহয় আমি ফেল করব, মা।'

'তুই নিশ্চয় পাস করবি, তুই যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে।' হৈম মেয়েকে স্নেহের আলিঙ্গনে বদ্ধ করল।

কিন্তু এই মধুর পরিবেশ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল পরেশের ক্রুদ্ধ গর্জনে। পরেশ পাশের ঘর থেকে বন্ধ দরজার ওপর দুমদাম করে লাথি মারতে লাগল আর চিৎকার করতে লাগল, 'এই দোর খোল, দোর খোল বলছি। নইলে দরজা ভেঙ্গে ফেলব, চুরমার করে ফেলব।'

সভয়ে হৈম বলল, 'এই রে আবার উনি ক্ষেপে উঠেছেন।'

পরেশ সমানে চেঁচিয়ে বলল, 'খোল দোর, খোল শীগগির।'

আবার দুমদাম লাথি পড়তে লাগল।

নিভা ভয় পেয়ে বলল, 'দরজা খুলে দিই, মা।

হৈম বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি বাপু আর মারধর খেতে পারব না। উপোস করে উনি ক্ষেপে উঠেছেন, বেরিয়ে খাবার না পেলে উনি যে কি করবেন ঈশ্বরই জানেন।'

নিভা বলল, 'কিন্তু উপোস করে আর কতক্ষণ থাকা যায়?'

'ওঁর জন্যে সন্দেশ রাজভোগ কে আনছে বল!'

'পেটে যদি কিছু পড়ত তাহলে ঠাণ্ডা হ'ত!'

'ঘরে সব বাড়ন্ত।তুই ত জানিস একটা কণাও খাবার নেই।'

পরেশ আবার তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, 'আমায় খেতে দেবে না। এরা না খাইয়ে মারবে। পেট জ্বলে গেল। খোল দরজা, নইলে খুন করব। গলা টিপে মারব।'

নিভা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'মা, যাই, রাস্তায় ঘোমটা দিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়াই যদি কেউ এক আধলা ভিক্ষে দেয়।'

'তুইও কি ক্ষেপেছিস নিভা! আমরা না ভদ্দরলোক।'

নিভা এবার বিদ্রোহ করল, সে তিক্তসুরে বলল, 'তা বটে, আমরা ছোটলোক নই। আমাদের মান আছে, নীতি আছে। ওদের ওসব বালাই নেই। ওরা গাছতলায় থাকছে, ভিক্ষে করছে, আস্তাকুড়ের নোংরা উচ্ছিষ্ট তুলে খাচ্ছে, পেটের জ্বালায় মেয়ে বৌকে বেচে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা ভদ্রলোক, তাই মানের মোহে প্রাণ দিচ্ছি।'

পরেশ সমানে চিৎকার করল, 'এই রাক্কুসী, এই শয়তানী, খোল দরজা। খোল

শীগগির, খুন করব, গলা টিপে খুন করব।'

সে আবার দরজায় প্রচণ্ড জোরে লাথি মারতে লাগল। এবার হৈম ধমক দিয়ে উঠল, 'ষাঁড়ের মতো গাঁকগাঁক করে চেঁচাচ্ছ কেন? পরের বাড়ির দরজা ভাঙ্গবে নাকি?'

ধমক খেয়ে পরেশ একটু নরম হল। কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'কোথায় খাবার, দে খাবার। রাক্কুসী, সব খাবার গিলে ফেলেছিস? আমায় না খাইয়ে শুকিয়ে মারবি?'

পরেশ কাঁদতে লাগল।

নিভা আকুলকণ্ঠে বলল, 'মা, বাবার চিৎকার আর আমি শুনতে পারছি না। তুমি ওকে একটু সামলে রেখ। আমি যেখান থেকে যেমন করে পারি খাবার আনছি।'

সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পরেশ এবার যাত্রার ঢংয়ে বলতে লাগল, 'ঔরঙ্গজেব. না খাইয়ে শুকিয়ে মারবে ভেবেছ? পারবে না, পারবে না।'

সে দরজা ধরে প্রবল টানাটানি শুরু করল। দরজার শিকলি ঝনঝন করে উঠল।

হৈম বলল, 'বলি হচ্ছে কি? নিভা খাবার আনতে গেছে। বস চুপ করে। পরের দরজা ভাঙ্গবে নাকি? একে ভাড়া দিতে পারি না, আবার খেসারত দেবে কে?'

পরেশ এবার স্ত্রীর অনুরোধে কর্ণপাত করল না। সে দরজা ধরে সজোরে টানাটানি করে যেতে লাগল। হঠাৎ শিকল ছিঁড়ে গেল। পরেশ প্রচণ্ড উল্লাসে চিৎকার করে যাত্রার ভঙ্গীতে বলল, 'মুক্তি চাই, মুক্তি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ মুক্তি! ঔরঙ্গজেব, ভেবেছিলে আমায় কয়েদ করে অন্ধ কারায় না খাইয়ে মারবে? পারবে না—পারবে না। খাবার, কোথায় খাবার?'

পরেশের আরক্ত উজ্জ্বল চোখ, অস্বাভাবিক মুখের ভাব দেখে হৈম সভয়ে পিছিয়ে গেল। এতক্ষণে স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তে পরেশ প্রশ্ন করল, 'এই বাঁদী, এই, বলতে পারিস ঔরঙ্গজেব কোথায় খাবার রেখেছে?'

হৈম ভয়ে ভয়ে বলল, 'নিভা খাবার আনতে গেছে।'

'দে এখনি খাবার দে, একপেট খেয়ে নিয়ে এখনি পালাতে হবে, নইলে ঔরঙ্গজেব আবার কয়েদ করবে।'

হৈম একটু দরদের সঙ্গে বলল, 'তুমি কার নাম করছ? দেখছ না আমি তোমার হৈম, আমি নিভার মা। এ তোমার ঘর।'

'ঘর? না না না, এ এক কয়েদখানা, বিরাট কয়েদখানা। এখানে কয়েদীদের না খাইয়ে শুকিয়ে মারা হয়। কাঁদলে টুঁটি চেপে ধরে, খেতে চাইলে গর্দান নেয়। এ এক বিরাট কয়েদখানা।' তুই খেতে পাস?'

হৈম অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'না গো কিছুই পেটে পড়েনি। উপোস করে আছি।'

অট্টহাস্য করে উঠল পরেশ, খুশী হয়ে বলল, 'কেমন? ঠিক বলিনি? কেউ খেতে পায় না, সবার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারে, তিল তিল করে শুকিয়ে মারে। তুই জানিস কোথায় খাবার আছে?'

'সব খাবার দোকানে। ঘরে এক কণাও খাবার নেই।' হৈম প্রবোধ দিতে গেল।

কিন্তু কথা শুনেই পরেশ উগ্রমূর্তি ধরল, 'আমার ঘরে খাবার নেই? মিথ্যে কথা। একদম মিথ্যে কথা। আমি নবাব শায়েস্তা খাঁ, আমার সুবায় টাকায় আট মণ করে চাল পাওয়া যায়। আর বলে কি না আমার ঘরে খাবার নেই? আলবাৎ আছে। লুকিয়ে রেখেছে, লুঠ করেছে। আমি নিজেই খুঁজে বার করব।'

পরেশ ঝোঁকের মাথায় বাক্স পেঁটরা ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলল, বিছানার তলা দেখল, টেবিল চেয়ার ওলটাল, ঠাকুরদের ছবি টেনে নামিয়ে আছড়ে কাঁচ ভাঙ্গল।

এবার হৈম রাগ করল, সে বিরক্ত হয়ে চিৎকার করল, 'কি হচ্ছে এ সব? ঘর-দোর সব তচনচ করছ কেন?'

পরেশের কণ্ঠ তার ওপরে উঠল, 'চোপরাও, চোপরাও, খাবার আছে, খাবার লুকিয়ে রেখেছে।'

সে একটা কাপড় মুখে পুরে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে থু-থু করে ফেলে দিল।

হৈম বাধা দিয়ে বলল, 'কাপড়গুলো ছিঁড়ছ কেন? পেটে ভাত জোটে না, লজ্জা রাখবার উপায় থাকবে না যে।'

সমস্ত ঘর বিপর্যস্ত করে পরেশ কোথাও এক কণা খাবার পেল না। সে হতাশ হয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসতে লাগল।

হৈম ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে বলে উঠল, 'কেমন? পেলে ত খাবার? তোমার জন্যে সব মণ্ডামেঠাই বসিয়ে রেখেছে। এখন ঘরদোর গোছাবে কে?'

পরেশ হিংস্রভাবে স্ত্রীর দিকে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে দেখল, তারপর গর্জন করে বলল, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস খাবার? বার কর।'

'ক্রুদ্ধ স্বরে হৈম বলল, 'ইস্, রকম দেখ না! আমায় কত লুচি মালপো এনে দিচ্ছেন যে আমি লুকিয়ে রাখব।'

শিকারী বাঘের মতো এগিয়ে আসতে লাগল পরেশ, সে হিংস্র ভঙ্গিমায় চিৎকার করল, 'বার কর খাবার, নইলে খুন করব, গলা টিপে খুন করব।'

স্বামীর অবস্থা দেখে হৈম সভয়ে বলল, 'তোমার মতলব কি বল ত? অমন করছ কেন?'

নিরুত্তর পরেশ শুধু গর্জন করতে করতে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হৈম আতঙ্কে কঁকিয়ে উঠল, 'না—না, আমি খাবারের কি জানি? ওগো কে কোথায় আছ,

এদিকে এস, শীগগির এস, উনি পাগল হয়ে আমাকে খুন করতে—'

কথা শেষ হবার আগেই পরেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল, তার বুকের ওপর বসে গলা টিপে বিকট অট্টহাস্য করে তার দেহ নিয়ে ঝাঁকানি দিতে লাগল। হৈমর দেহ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এলিয়ে পড়ল। পরেশ বার কয়েক দেহটি নাড়াচাড়া করল। কোনও সাড়া মিলল না। পরেশ সেই মৃতদেহটা জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, অশ্রুভরা ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করতে লাগল, 'অন্ন দে মা অন্ন দে!'

তৃতীয় পর্ব

এক

বিয়েবাড়ি। মহাধুমধাম। সমস্ত বাড়িটাই আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছিল। সামনের গাছগুলোর পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো ঝিকমিক করছিল। সানাই-এর আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশনকারীদের চিৎকারও থেকে থেকে কানে আসছিল। পায়ে হেঁটে, মোটরগাড়িতে নিমন্ত্রিতরা আসছে। মেয়ে পুরুষ, কত বিচিত্র তাদের সাজপোশাক, ঝকমক করছিল মেয়েদের শাড়ি, গায়ের গয়না।

সহায়রাম মনুকে কোলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল উৎসবের আড়ম্বর। তাদের গাঁয়ে বিয়ে হয়, সানাই বাজে, খাওয়ান-দাওয়ান হয়। কিন্তু এত জাঁকজমক সে কল্পনাই করতে পারত না। সদুর সঙ্গে যখন বিয়ে হল, পুরুতমশায় নম নম করে সব সেরে দিল, নেহাৎ দু'চার জন আত্মীয়-কুটুমকে বলতে হয় তাই বলা। সহায়রাম শহরের বিয়েবাড়ি দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।

মনুর কিন্তু ওদিকে হুঁশ নেই। সে থেকে থেকে ঘ্যানঘ্যান করছিল, 'বাবা, কখন খাতি পাব। ওঁয়ারা যে সব খায়ি নিল। মোরা কখন খাব?'

'খাবি বাবা, খাবি।' সহায়রাম আশ্বাস দিয়ে বলল, ওঁদের খাওয়া হলি, এদিক পাতা পড়বেনি, তখন খাবি।'

সেদিন সদুর কথা বাব বার মনে হচ্ছিল। সে এখন সুখে আছে, মাসির বাড়ি সুখে থাক।

গঙ্গার ঘাটের পথে সহায় ক'দিন আগে মনুকে নিয়ে ভিক্ষে করছিল। পুলিশে হাত দেখালে, একটা করে গাড়ি বা রিকশা চৌমাথায় থামত আর সহায় বলত, 'দুটো পয়সা দেও বাবু, দুটো পয়সা দেও মা। গাঁ থেকি আসেছি, ছ্যালেডারে দুমুঠো ভাত দেব, মা।'

হঠাৎ মনু চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, মা।'

সহায় চমকে উঠল। একটা রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দুটো মেয়েছেলে। সহায় তখন চিনতে পারল। মাসি আর সদু। ওরা গঙ্গা নেয়ে ফিরছিল। ভিজে চুল এলো করে

দিয়েছিল। তেল চকচকে চুল। কপালে চন্দনের তিলক কাটা। দু'জনকে যেন গেরস্ত বাড়ির বউ বলে মনে হচ্ছিল। সদু প্রথমটায় কথা বলল না। মাসি বলল, 'আহা জামাই সেদিন মেজাজ দেখিয়ে চলে এলে, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে মরে। ঘরের জামাই, ঘরে এস।'

সহায়রাম কোন জবাব দিল না।

'মনুরে, আমার বাপ,' সদু আদর করে ডাকল। ঠিক সেই পুরানো ডাক।

'মার কাছি যাব,' মনু বায়না ধরল। সহায় বাধ্য হয়ে ছেলেটাকে মায়ের কোলে দিল। সদু তাকে আদর করল।

'তুমি না আস, আসবে নি,' সদু বলল, 'কিন্তুক ছেলেডারে দেও। মাসি বলেছে, ও সুখে থাকবে, খাবে দাবে ফাইফরমাশ খাটবে।'

সহায় ছেলেকে মার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আবার দর্পভরে বলেছিল, 'আমি চাষার পো, আমাব ছেলে চাষার নাতি। ভিক্ষে করি খাব, তবু বেউশ্যের অন্ন খাবনি।'

পুলিশ অন্যদিকে হাত দেখাতে রাস্তা খালি হয়ে গেল। রিকশাটা সদু আর ঐ মেয়েছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল। মনু ডুকবে কেঁদে উঠল, 'মার কাছি যাব।' সহায়রাম তার গালে চড় মারল! মনু আরও জোরে কেঁদে উঠল।

মনু আজ আর কাঁদছিল না। বিয়েবাড়ির ভাল ভাল খাবারের জন্যে মাঝে মাঝে ঘ্যানঘ্যান করছিল।

একা সহায়রামই খাবারের জন্যে হাজির হয়নি। রবাহুত ভিখারীরা সংখ্যায় কম নয়। সহায় কেন জানি না ঐ সব পেশাদারী ভিক্ষুকদের দু'চোখে দেখতে পারত না। সহায় ত বরাবরের মতো ভিক্ষে করবে না। আকাল চুকলেই আবার ক্ষেতের কাজে লাগবে। সোঁদা মাটির গন্ধ শুঁকবে। কবে? সে কবে?

সহায় একজন বাবুকে দেখে বলল, 'বিয়েবাড়ি দুটো পেসাদ পাবনি?'

বাবু তেড়ে উঠে বলল, 'তোদের আর পেসাদ পেতে হয় না। নেমন্তন্নের লোকদেরই ভয়ে ভয়ে খাওয়াতে হচ্ছে কখন ইনসপেকটরে ধরে, আবার তোদের খাওয়াতে গিয়ে হাতে দড়ি পড়বে?'

সহায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। খাওয়াতে গেলে হাতে দড়ি পড়বে কেন? এত লোক ত খাচ্ছে, কই কারুর হাতে দড়ি পড়ছে না ত? তাহলে বোধহয় ভাল জামা-কাপড় পরে এলে দড়ি পড়ে না। আহা, সেদিন মাসির বাড়ির সেই ভাল জামা-কাপড়টা যদি থাকত, ত মনুকে নিয়ে সহায় এক পেট শহুরে নেমন্তন্ন খেয়ে আসত।

একজন ভিখারী গায়ে পড়ে এসে বলল, 'আজ কাল তো এঁটোপাতও তেমন

জোটে না। আজ বোধহয় এঁটোপাত অনেক পড়বে। শুনন্ নিসপেকটর সাহেবের বাড়ি এক হাঁড়ি মিষ্টি গেছে। সাহেব আজ আর তল্লাটে আসছেননি। এখন আমাদের বরাত।'

একটু দূরে ভৃত্যেরা বালতি করে কিছু এঁটোপাতা খুরি গেলাস মড় মড় করে ফেলে দিয়ে গেল। ভিখারীর পাল শকুনের মতো উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে দিল। রকম দেখে সহায়রামের গা ঘিনঘিন করে উঠল। কিন্তু মনু কেবলই বায়না করতে লাগল, 'বাবা খাতি চল, বাবা খাতি চল।'

জনৈকা দাসী দয়া-পরবশ হয়ে বলল, 'এই ছোঁড়া, চিল্লাস কেন? নে গোটা দুই সন্দেশ ধর।'

মনু উচ্ছিষ্ট সন্দেশ গপগপ করে গিলতে লাগল। সে আরও খেতে চাইল। সহায় আপত্তি না করে পেশাদার ভিখারীদের সঙ্গে দু'চারটি উপাদেয় উচ্ছিষ্ট ভোজন করল। মনুও পেট পুরে খেল।

'আর খাসনি বাপ,' সহায় বলল।

মনু শুনতে চাইল না। যতক্ষণ ছিল সে মুখ চালিয়েই গেল। খাওয়া শেষে রাস্তার 'টিপকল' থেকে দুজনে ঢকঢক করে জল খেয়ে গভীর পবিতৃপ্তির সঙ্গে সহায় সপুত্র পা চালাল গাড়িবারান্দার তলায় যেখানে তাদের নতুন আস্তানা। বেশিদূর নয় সেটা। মনুকে নিয়ে সে সকাল সকাল ফুটপাথে শুয়ে পড়ল।

মনুটা তখন থেকে আইঢাই করছিল। বেশি খেয়েছিল কিনা। তার শরীরটা কেমন আনচান করতে লাগল। সে দু'চারটি ঢেঁকুর তুলল। তারপর সে কেমন যেন করতে লাগল।

সহায় চিন্তান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মনু, বাপ, এমন করতেছিস ক্যান?'

মনু কাঁদতে লাগল আর পেটে হাত বুলোতে লাগল।

সহায় বিব্রত হয়ে বলল, 'মনু, বাপ, কোথায় লাগতিছে?'

মনু আর কথা বলল না। তার পেটের যন্ত্রণা বেড়ে উঠল, সে যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল। তার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, সমস্ত শরীর মুহুর্মুহুঃ কাঁপতে লাগল। সহায় এবার ভয় পেয়ে গেল। কি তার মতিবিভ্রম হল মনুকে শুইয়ে রেখেই সে কাছাকাছি কোনও ডাক্তারবাবুর খোঁজে গেল। অচেনা শহর, রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। কোথায় ডাক্তার তাও জানত না। সন্ত্রস্ত হয়ে এধার ওধার দৌড়ঝাঁপ করে সে যখন কোন ডাক্তারের সন্ধান পেল না, ভাবল ছেলেটাকে নিয়ে তাহলে হাসপাতালেই যাবে। সহায় যখন গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে পৌঁছল, তার নতুন আস্তানায়, সে চোখে অন্ধকার দেখল। মনু নেই।

মনু নেই! সহায় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে প্রথমে ভাবল, তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল। কিন্তু ভাল করে চেয়ে দেখল তা ত নয়। সেই লোহার দোকান,

সেই ধোবিখানা। মেয়েলোকের বড় ছবি দেওয়া সেই সিনেমার বিজ্ঞাপন।

সহায় কাতর হয়ে চিৎকার করল, 'মনু বাপ. মনু রে! কোথায় আছিস, বাপ?'

মনুর কোন সাড়া পেল না। এদিক ওদিক সে খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু মনুর চিহ্ন কোথাও নেই। দোকানঘরগুলি বন্ধ। লোকজনও বেশি ছিল না। দু'চারটে ঝাঁকামুটে ফুটপাতে কিছুদূরে বসে গুলতানি করছিল। সহায় মনুর কথা তাদের জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তারা কেউ মনুর সন্ধান দিতে পারল না।

সহায় তখন আর থাকতে পারল না, সে চীৎকার করে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'মনু বাপ, মনু রে, তুই কোথায় গেলি রে—'

লিলি নিভাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, 'উকিলবাবু বলেছেন ভয়ের কিছু নেই। তোমার বাবা পাগল বলে ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। হয়ত তাঁকে পাগলা-গারদে আটক রাখবে।'

নিভা কাতর হয়ে বলল, 'তার চেয়ে ওঁর ফাঁসি হলেই ভাল হ'ত ভাই। সঙ্গে সঙ্গে আমিও যদি মরতে পারতুম।'

'ছি, ও কথা বলতে নেই।'

নিভার ক্ষোভ গুমরে উঠল, 'এমন অনাহারে পরের দয়ায় নির্ভর করে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? পশুরও বেঁচে থাকবার অধিকার আছে, সামর্থ্য আছে ক্ষুধার আহার যোগাড় করবার, কিন্তু মানুষ হয়েও আমাদের সে সামর্থ্য নেই। জানো ভাই কাজের জন্যে ঘুরলুম অনেক জায়গায়। কোথায় কাজ? যাও বা পাওয়া যায়, কাজ দিয়েই লোক সন্তুষ্ট নয়, ফাউ হিসেবে তারা চায় আমার দেহ, নির্লজ্জ লালসা মেটাবার জন্যে। অথচ এরাই সৃষ্টি করেছে ধর্ম, গড়ে তুলেছে পরিবার, সমাজ।'

'তুমি ওসব কথা ভাবছ কেন, ভাই।' লিলি আশ্বাস দিয়ে বলল, 'নাই বা পেলে চাকরি? আমার যতদিন সামর্থ্য আছে, ততদিন তোমার কোন ভাবনা নেই।'

নিভা কৃতজ্ঞচিত্তে বলল, 'তুমি আমায় বিপদে অনেক সাহায্য করেছ। বাবাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে জলের মতো টাকা খরচ করেছ। কিন্তু আমি কেন আজীবন তোমার দয়ার উপর নির্ভর করে থাকব? মানুষ হয়ে আত্মসম্মান বজায় রেখে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার এতটুকু অধিকার কি আমার নেই?'

লিলি চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'কে কাকে দয়া সহানুভূতি দেখায় ভাই। বিশ্বাস কর ভাই, আমি কোনদিন তোমায় দয়া করতে চাইনি, বরং তোমারই সহানুভূতি তোমারই

বন্ধুত্ব চেয়েছি। নিভা, আমি একা, বড় একা। তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, তোমার তেজ, তোমার দৃঢ়তা, তোমার প্রীতি দিয়ে আমায় বাঁচাও ভাই।'

'লিলি!' আর কিছু বলতে পারল না নিভা।

লিলি তার হাত ধরে আকুলভাবে বলল, 'আমায় বিশ্বাস কর ভাই, আমি বড় অসহায়!'

নিভার হাত ছেড়ে দিয়ে টেবিল থেকে একটি খবরের কাগজ তুলে নিয়ে বলল, 'আজকের কাগজ দেখেছ?'

'না, কি আছে খবর?'

লিলি বলল, 'ওঁর নামে মামলা চলছে। অনুপমার ব্যাপারে কাগজে সবিস্তারে বেরিয়েছে। হয়ত ওঁর শাস্তি হবে। একবার মনে হয়, হোক শাস্তি, বেশ খানিকটা শিক্ষা হোক। আবার ভাবি কি হবে শাস্তি হয়ে? আমরা বিচার করবার কে, শাস্তি দেবার কে? ওপরে ভগবান আছেন, যিনি নিয়ত ন্যায়ের চোখকে সজাগ রেখেছেন, তাঁর ওপরেই সব ছেড়ে দিই না কেন?'

নিভা ক্ষুব্ধস্বরে বলল, 'কি লাভ তাতে? যাঁর কথা তুমি বলছ, তিনি অন্ধ, তিনি অবিবেচক। তাঁর বিচারের শক্তি নেই এতটুকু। নইলে তিনি এই জগৎজোড়া অন্যায় অবিচার সহ্য করছেন কেমন করে?'

লিলি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'তাঁর কাজ তিনি ঠিক করে যাচ্ছেন, ভাই। আমাদের সামান্য চোখ দিয়ে তাঁর অন্তহীন কাজের পরিমাপ কি সম্ভব? তাঁকে আমি ডাকতে চেয়েছি, ঠিকমত পারিনি। কিসের একটা অজানা অতৃপ্তি আমায় অস্থির করে তুলেছে।'

উভয়ে খানিকক্ষণ মৌন রইল।

লিলি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা ভাই, তুমি সত্যি কোনও দিন কাউকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছ?'

নিভা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'চেয়েছি কিন্তু ভাগ্য সদয় নয়। জানি না, যা চেয়েছি, তা কোনদিন পাব কি না।'

'এখানেই আমাদের মিল।' লিলি বলল, 'আমরা অতৃপ্তির একই ভেলায় চড়ে ভেসে চলেছি, আজীবন কূলের অপেক্ষা করব।'

নিভা ঈষৎ অস্থির হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি হয়ত অপেক্ষার তর সইতে পারব না। সময়ে কূল না মিললে হয়ত নৌকাডুবিও আমি পছন্দ করব।'

লিলি এবার হালকা হয়ে বলল, 'তার দরকার হবে না ভাই। আমার বিশ্বাস তোমার আকাঙ্খার ধন তুমি নিশ্চয় পাবে। বিনয়বাবু কি বলেন?' লিলির কণ্ঠে রহস্যের সুর ছিল।

নিভা কথাটি এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল, 'তার সঙ্গে এ আলোচনার কি সম্পর্ক?'

লিলি হেসে বলল, 'সে কথা তুমিই ভাল জানো। আমার কাছে লুকিয়ে লাভ কি? তুমি যে বিনয়বাবুকে ভালবাস সে আমি জানি। তিনি তোমায়ও নিশ্চ য় ভালবাসেন।'

'তা কি করে জানব?' নিভার কণ্ঠে অনিশ্চ য়তা।

'বাঃ, তুমি জানো না? কিন্তু আমি বুঝতে পারি তিনি তোমাকে ভালবাসেন। নইলে তোমার বাবাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি আত্মভোলা হয়ে খাটতে পারতেন? আমি ভাই কল্পনা করছি তোমরা বিয়ে করবে, গড়ে তুলবে ছোট্ট নীড়, তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে শিশুর মধুর হাসিতে। সেদিন আমি খুব সুখী হব।'

'তোমার কল্পনা যদি সত্যি হ'ত!' নিভা নিজের সংশয় ব্যক্ত করল, 'কিন্তু আমি এখনও বুঝে উঠতে পারলুম না ঐ লোকটিকে। উনি একদিকে প্রাণখোলা মানুষ অন্যদিকে মনে হয় ভীষণ চাপা।'

কিন্তু ওদের নিভৃত আলাপ আর বেশিদূর অগ্রসর হল না। রামু দ্বিধাজড়িত পদে হাজির হয়ে আস্তে ডাকল, 'বৌমণি!'

লিলি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কি রামু, ওদের কোনও খবর পেলে?'

রামু হতাশ হয়ে বলল, 'কোথায় পাব তারে? তারপর ঈষৎ বিরক্ত হয়ে নিভাকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমিই বল দিদিমণি, এত বড় শহরে একটা লোককে খুঁজি বাইর করা সিধে কতা?'

নিভা জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে খুঁজছো রামু?'

'এট্টা গেঁয়ো ভূত আর তার চিমড়েপানা ছাওয়ালকে।' রামুর বিরক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

লিলি বারণ করে বলল, 'ছি, রামু ও কথা বল না।' সে নিভাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। সেদিন একটা ভিখিরি ছোট ছেলের জন্যে খাবার চাইল, খাবার আনতে না আনতে হঠাৎ চলে গেল। তাকেই খুঁজছি।'

রামু সহানুভূতিতে জানাল, 'আহা নিজের ত একটা হল না। তাই পরের ছাওয়ালের জন্যে এ্যাত মায়া। সব অদেষ্টের নেখন, সব অদেষ্টের নেখন।'

লিলি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি রামুর কথায় কান দিও না। বুড়ো হয়ে ও একটু বাজে বকে।'

রামু প্রশ্রয় পেয়ে প্রতিবাদ করল, 'বাজে বকি?' নিভাকে সে সালিশ মানল, 'তুমিই বিচের কর দিদিমণি। কোথাকার কে এট্টা রাস্তার ভিকিরি নিয়ে এল শুঁটকো চিমড়েপানা ছাওয়াল, বৌমণি বললেন, তাকে বড় করব, মানুষ করব।'

লিলি ব্যাখ্যা করল, 'আমার সময় কাটে না তাই ভাবলুম—'

নিভা হেসে বলল, 'তোমাদের এই বিবাদের আমি মীমাংসা করতে পারব না ভাই।' তারপর দীর্ঘশ্বাস চেপে সে মৃদু স্বরে মন্তব্য করল, 'এখন সত্যিই বুঝেছি, কত একা, কত অসহায় তুমি।'

নিভা উঠে পড়ল। বলল, আমি এখন উঠি ভাই। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

'আচ্ছা ভাই, তুমি কিচ্ছু ভেব না। দরকার পড়লে আমায় মনে রেখ।'

নিভা চলে গেল। লিলি ব্যগ্র হয়ে রামুকে জিজ্ঞাসা করল, 'রামু, তুমি ভাল করে খুঁজে দেখেছ?'

'কদিন ধরি জেরন নাই, খাবা নাই, ইদিক-সিদিক তন্ন তন্ন করি গরুখোঁজা খুঁজতেছি।'

'তাদের পেলে না?' হতাশ স্বর লিলির।

'কেমন করি পাব? এত বড় শহর। তার উপর বাইরি থেকে হুদোয় হুদোয় কাতারে কাতারে লোক এয়েছে, যেন বাবুদের বাড়ির মেলায় যাত্রাগান শুনতি চলেছে!'

'তাই না কি?'

'তুমি আজকাল বাড়ির বাইর হওয়া ছাড়ি দিইচ বৌমণি। নইলে দেখতি মাঠে ঘাটে আস্তায় গেঁয়ো নোকের ছড়াছড়ি, ছাওয়াল বৌ নিয়ে গাঁ ছেড়ে সব শহরে পালিয়ে আসতিছে। গাঁয়ে যে আকাল পড়িছে। উঃ সে কি দিশ্য! এক কণা খাবারের জন্যে সবাই হাহাকার করতিছে। কত নোক, কত ছাওয়াল বৌ না খায়ে পথে ধুঁকতিছে, কত খাবি খাতিছে, মরতিছে। এর মধ্যি কন্‌থি খুঁজে বার করি বল দিখি?'

'হুঁ।' লিলি গভীর চিন্তায় মগ্ন হল।

'কি চিন্তা করতিছ, বৌমণি?'

লিলি গভীর, কাতর কণ্ঠে বলল, 'জানো রামু, লোকটা আমায় ডাইনী বলে গেল, আমি তার কি করেছিলুম? শুধু বলেছিলুম থাকতে, বলেছিলুম তার ছেলেকে আদর করব, খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করব। আমায় বললে, ডাইনী!' লিলির গলার স্বরে চাপা অভিমান ফুটে উঠল।

রামু বলল, 'ব্যাটা ভেমো, চাষা কি না। অন্নপুন্নোর দয়া সইবে কেন? ছেলেকে সুদ্ধু ভাগাড়ে টেনে ফেলি দিবে।'

'না—না, রামু ও সব অলুক্ষণে কথা বল না। তুমি দেখ যদি খুঁজে পাও।'

'আমি আর খুঁজতি পারব নি? ঘরের মধ্যি চক্ষু বন্ধ করি আছি, বেশ আছি।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় আর কি বৌমণি? নিজের ত এটটা হলো নি। কপাল! নইলে পরের ছাওয়ালের জন্যি অস্থির হতেছ? এত করি বলতিছ যখন, একবার শেষ খোঁজা খুঁজি।'

রামু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ির বাইরে যাবার জন্যে দু'পা বাড়িয়েছে অমনি মনিব

চঞ্চলের হাঁক পড়ল, 'রেমো—এই রেমো—'

'এজ্ঞে,' রামু সাড়া দিল।

চঞ্চল নিজেই ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল, বলল, 'তুই এখনও উকিলবাবুর বাড়ি যাসনি? তোকে যে বললুম সকালবেলা?'

'এজ্ঞে, যাতি তো চায়েলাম, কিন্তু বৌমণি—'

'রাখ্ তোর বৌমণি। যা, এখনি যা হতভাগা। বলে আয় উকিলবাবুকে যেন বাড়ি ফিরেই আমার সঙ্গে দেখা করে।'

'এজ্ঞে, যাই। আমি খুঁজেও আসব, বৌমণি।'

রামু দ্রুতপদে চলে গেল।

চঞ্চল বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, 'কি, ধম্মপুত্তুরের শোক এখনও ভুলতে পারোনি দেখছি। দেখ তোমার যশোদা দুলাল মথুরায় রাজত্ব করছে কি না।'

লিলি ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'আমায় বিদ্রূপ না করে তুমি বুঝি থাকতে পার না?'

ব্যঙ্গের সঙ্গে চঞ্চল জবাব দিল, 'আমায় ভাল না বেসে তুমি যেমন থাকতে পার না।' তারপর সক্রোধে বলল, 'জানো তোমার উৎকট ভালবাসার অনুগ্রহে আজ আমার কি দশা হয়েছে? রাস্কেল হরিচরণ সাজান মামলা ঠুকিয়েছে। কাগজ-ওয়ালারা বড় করে তাই ছেপেছে। দেখোনি তোমার স্বামীর খ্যাতি! গর্ব হয়নি তোমার পতি যশে?'

লিলি নিরুত্তর।

চঞ্চল আবার প্রশ্ন করল, 'কি চুপ করে রইলে যে? কথার উত্তর দাও।'

'কি উত্তর দেব? তোমায় আমার বলবার কিছু নেই।'

'কেন আজ হঠাৎ কথা ফুরিয়ে গেল কেন? সেদিন বীরাঙ্গনার মতো বাক্যবাণ বর্ষণ করে আজ দেউলে হয়ে গেলে না কি?'

'যে চিররিক্ত, সে নতুন করে কি দেউলে হবে?'

'কেন? অর্থ তোমায় অহংকার শেখায়নি?'

'সে অনর্থের বোঝা হালকা করতে পারলেই বাঁচি। তখন হয়ত সর্বরিক্তদের সঙ্গে সমান আসনে বসতে পারব।'

'ও, আই সি!' চঞ্চল ব্যঙ্গ করল, 'তুমি সতী-সাধ্বী নারী। সত্যিই তুমি রিক্ত, তোমার স্বামী লম্পট, পরদারাসক্ত, তুমি নিঃসন্তান—'

লিলি কাতর হয়ে বলল, 'আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে তুমি আঘাতের পর আঘাতে আমায় জর্জরিত করছ? তোমায় টাকা দিইনি তাই? চাও টাকা? সব টাকা আমি তোমায় দিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমায় তোমার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাত থেকে নিষ্কৃতি দাও।'

'তোমার টাকায় আমি লাথি মারি। এখন কি হবে তোমার টাকায়? যা মন্দ হবার

তা হয়ে গেছে। সেদিন রাস্কেলটার পরামর্শে তোমার কাছে হাত পেতেছিলুম। তার সামনে অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে। আমিও উলটে আঘাত দিতে জানি।'

'সে আমায় বলতে হবে না। তা আমি ভাল করেই জানি।'

'না কিছু জানো না।' চঞ্চল বাগাড়ম্বর করে বলল. 'ভেবেছ চক্রান্ত করে আমায় শাস্তি দেওয়াবে? আদালতে আমার অপরাধ প্রমাণ করে আমায় জেলে পাঠাবে? সে আনন্দ তোমরা পাবে না. সে আশা তোমাদের বৃথা। আমায় শাস্তি দিতে পারে এমন কেউ জগতে জন্মায়নি।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকল সহায়রাম। তার পিছনে অতিব্যস্ত হয়ে ছুটে এল রামু।

রামু চিৎকার করল, 'তখন থেকি বলতেছি সে এবাড়ি নাই।'

সহায়রাম ক্ষিপ্তের মতো দাবি করল, 'আমার ছ্যালে কুথা? কুথা লুকায়ে রাখিছ তোমরা?'

রামু বলল, 'বৌমণি, লোকডার সঙ্গি আস্তায় হঠাৎ দেকা। আমারে ধরি মারে আর কি? বলে ওর ছাওয়াল-ডারে কনে মোরা লুকায়ে রাখছি। আমি কি করি জানব, ওর ছাওয়ালডা কনে গেল?'

চঞ্চল বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'যত্ত সব জঞ্জাল এখানে এসে জুটবে!'

লিলি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার ছেলের? কোথায় গেল সে?'

সহায় আকুল স্বরে ডুকরে উঠল, 'তুমি জানো, তুমি লুকায়ে রাখিছ। দেও আমার ছ্যালেকে, ফিরায়ে দেও। ওরা আমার বৌকে কাড়ি নিল, তুমি আমার ছ্যালেকে কাড়ি নিও না। মনু, আমার মনু রে, তুই কোথায় লুকায়ে আছিস বাপ?'

লিলি আশ্বাস দিতে গেল, বলল, 'আমি সত্যি তোমার ছেলেকে নিইনি। তোমার মতো আমিও তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোথায় গেল সে?'

'তুমি জানোনি? তুমি দেখনি? বাছা, দু'দিন ভাল খায়নি। এক জায়গায় এঁটো পাত পেয়ে খুব খানিকটে গিলে নিল, তারপর ভারী ছটফট করতি লাগল, কাঁপতি লাগল, তারপর—'

'কি হল?' লিলি ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল।

'পথের উপর শুয়ে রাখি বদ্যি ডাকবারে গেনু। কুথা বদ্যি! কুথা ছ্যালে! ফিরি আসি দেখনু বাছা সেখানে নাই। ওগো বলনি, তোমার পায়ে ধরি, কুথা আমার ছ্যালেডারে তোমরা লুকায়ে রাখিছ?'

লিলি বলল, 'বিশ্বাস কর, সত্যি আমি জানি না।'

তারপর ব্যগ্র হয়ে চঞ্চলকে সে অনুরোধ করল, 'ওগো, তুমি একবার পুলিসে খবর দাও, একবার হাসপাতালগুলোয় খোঁজ কর, যদি ওর ছেলেকে খুঁজে পাও। ওগো যাও, আমার একটা অনুরোধ রাখ।'

'তুমি ক্ষেপেছ! কোথায় পাব তাকে? শ্মশানে মড়ার গাদায় তাকে পেলেও পেতে পার!' চঞ্চল নির্লিপ্তের মতো বলল। সহায় আকুল কণ্ঠে চিৎকার করল, 'না, না, সে মরেনি।'

লিলি বলল, 'না সে মরতে পারে না।' সহায়কে উদ্দেশ্য করে লিলি বলল, 'এরা হৃদয়হীন পশু। পরের দুঃখে এদের মন টলবে না। তুমি এস। রামু, তুমিও এস। সুদর্শন সিং-এর গাড়ি নিয়ে সারা শহর তোলপাড় করে আমিই এর ছেলেকে খুঁজে বার করব।'

লিলি ওদের দুজনকে নিয়ে চলে গেল। চঞ্চল পাইপ থেকে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মন্তব্য করল, 'রটন্!'

দারুণ একটা অবসাদের ভার বিনয়ের মাথায় জগদ্দল পাথরের মতো চেপে ছিল। কদিন কিছুই তার ভাল লাগছিল না। লেখাও প্রায় বন্ধ। সামনে সাদা কাগজ উদ্ভাবনী শক্তিকে বন্ধ্যা করে রেখেছিল। কলমের দু'চারটি আঁচড় দেবার সঙ্গে সঙ্গে সূত্রহীন চিন্তাগুলি মনটাকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল। নিজের অক্ষমতা তাকে হতাশ করে তুলছিল।

সহায়রামকে ধারণায় রেখে সে লেখা শুরু করেছিল, মাঝে মাঝে তার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। জোড়া দিতে গিয়ে বিনয় প্রায় গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠছিল। ওর সেই ছোট ছেলেটা কোথায় গেল? বিনয় ঘটনাস্থলে গিয়ে নিজেই খোঁজখবর নিচ্ছিল, কিন্তু কেউ হদিশ দিতে পারল না।। শ্রীমতী লিলি রায় হাসপাতালে থানায় খোঁজ করেও তার সন্ধান পাননি। এখনও তিনি হাল ছাড়েননি। তবে কি ছেলেধরায় ধরে নিয়ে গেল? ঐ রুগ্ন মুমূর্ষুকে কে আবার নিয়ে যাবে? বিনয়ের মাথায় এল হয়ত কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ রাস্তায় মরা শিশু দেখে অসুবিধা বোধ করেছিল, হয়ত মৃত্যু গোপন করতে চেয়েছিল। প্রায় ত শোনা যায় অনাহারে লোক মারা যাচ্ছে আর সরকার তরফ থেকে সরবে প্রতিবাদ করা হচ্ছে। বিনয় নিজের সন্দেহের কথা একটি চিঠিতে লিখে স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিল। চিঠিটা আবার কাগজে বের হল। কার চোখে পড়ল কি না পড়ল ঠিক নেই, থানার ও.সি. কনস্টেবলকে দিয়ে বিনয়কে হঠাৎ ডেকে পাঠাল, তারপর বিনয়কে শাসাল, 'বিনয়বাবু, আপনি এমন অভিযোগ করলেন, তার প্রমাণ দিন।' বিনয় আমতা আমতা করল। ও. সি. রাগত স্বরে বলল, 'প্রতিবাদ নিশ্চয় সংবাদপত্রে বার করা হবে কিন্তু বিনা প্রমাণে ঐ সব মিথ্যে অভিযোগ করলে আপনাকে বিনা বিচারে

আটক করা হতে পারে। দেখছেন খাদ্য নিয়ে লোকের মন মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে, তার ওপর আপনার মতো একজন শিক্ষিত লোক যদি অকারণ লোক ক্ষেপাতে থাকে তবে আমরা ত চুপ করে বসে থাকতে পারি না।'

'কিন্তু শহর থেকে একটা ছেলে হারিয়ে গেল তার কি ব্যবস্থা করলেন মশায়?' বিনয় সাহস করে জিজ্ঞাসা করল।

'রাখুন, মশায়। দিন কতজন হারানো লোকের খোঁজ করতে আসে থানায়, তার হিসেব রাখেন?'

'কেন হারায়?'

'সে আমরা কি করে বলব? আপনি বলবেন শুধু গরীবের ছেলে হারায়। তা নয়, মশায়, অনেক ধনীর ছেলেও হারায়, বুড়ো বুড়ো লোকও হারায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেন না, হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ।'

'সে হারান আর এ হারান কি এক?' বিনয় জিজ্ঞাসা করল।

'যাক্, আপনার সঙ্গে আর অনর্থক তর্ক করতে চাই না।' ও. সি. বলল, 'নেহাত আপনার সঙ্গে জানাশোনা তাই আপনাকে সাবধান করে দিলুম।'

বিনয় চলে আসছিল। ও. সি. তাকে বসতে বলল, তারপর চুপি চুপি তার কানে বলল, 'সেদিন আপনি যে মিছিলটা নিয়ে আসছিলেন, সেটা ত ছত্রভঙ্গ হল। দেখলুম আপনিও পেটন খেলেন। পড়ে গেলেন। আপনার হাতের কাগজ একটা পড়ে গেল। আমি সেটা তুলে নিলুম। পরে পড়ে দেখলুম, আবেদন। খাদ্যের দাবিতে লেখা, কার লেখা, মশায়?'

বিনয় দ্বিধা না করে বলল, 'কেন? আমার।'

'বেড়ে লিখেছেন কিন্তু', ও. সি. বলল, 'যা লিখেছেন খাঁটি সত্য! লেখাটা আমি ওপরওয়ালাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'তাই না কি?'

'আপনারা আমাদের শত্রু ভাবেন। ও. সি. বলল, 'আসলে আমরা তা নই। আরে মশাই সস্তা দরে খাবার জুটলে আমাদের আত্মীয়পরিবারেরও ত সুবিধে। তবে পুলিসের ঘুষ নেওয়াটেওয়া না লিখলেই পারতেন।

বিনয় বলল, 'তা আপনারা, মশায়, ঘুষ নেন না কি?'

'আরে মশায় সব দেশে সব কালে ঘুষ চলে।' ও. সি. সাফাই গাইল, 'যা দিনকাল পড়েছে উপরি না হলে চলে কি করে?'

খুব কড়া কথা শুনিয়ে দেবার ইচ্ছা হল বিনয়ের। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই চেপে গেল। কি হবে বৃথা বাক্যব্যয় করে। বিনয় দেখতে লাগল, গলির মোড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে

কালোবাজারে চাল বিক্রি হয়ে চলছিল। ঐ সব গরীব বিক্রেতাদের পিছনে যে মহাজনেরা আছে সে খবর বিনয়ের জানা ছিল। একদিন কিছু দলবল নিয়ে কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে পিকেটিং করেছিল। দু'একদিন ফল পাওয়া গেল। পরে আবার যখন ওরা চাল নিয়ে বসল, বিনয় বারণ করতে গেলে, পাড়ার অনেক ভদ্রলোক তেড়ে এল, মারমুখী হয়ে বলল, 'আপনার দরকার কি মশায় মাতব্বরী করার? ঐ গরীবেরা দুটো পয়সা পাচ্ছে তা বুঝি সহ্য হচ্ছে না?'

বিনয় কি জবাব দিতে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই ক্রেতারা কেউ কেউ চিৎকার করল, 'যা চাল পাই রেশনে, তাতে চলে না। আমাদের পয়সা আছে বেশী দামে কিনছি। আপনার বাবার কি?'

কার সঙ্গে তর্ক করবে বিনয়?

ও. সি.-র সঙ্গে পরিচয় ছিল বিনয়ের দু-চারটে গল্প উপন্যাসের মারফত। তাছাড়া পরেশবাবুর ব্যাপারেও আরও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ও. সি. সাবধান করে বলেছিল, 'আপনি মশায় গল্প-উপন্যাস লেখেন, লিখুন। ওসব পিকেটিং মিছিলে যাবেন না। কিছুই হবে না, কেন মিছিমিছি আপনার ট্যালেণ্ট নষ্ট করবেন? আমার কাছে শুনে রাখুন, মশায়। যারা সভাসমিতিতে লম্বা চওড়া বক্তিমে ঝাড়ে কালোবাজারের বিরুদ্ধে, তাদের অনেকেই লুকিয়ে বখরা রাখে। এমন কি দলগুলোও ওদের কাছ থেকে কিছু কিছু ভাগ পায়।'

বিনয় বিশ্বাস করেনি কথাটা। আবার অবিশ্বাসও করতে পারেনি। প্রতিকারহীন অপরাধের কারণে সে নিজের মনে মনে গুমরে উঠছিল।

ও. সি. বলল, 'শুনেছি খাদ্য নিয়ে একটা বড় আন্দোলন হবে। বড় রকমের গোলমাল হতে পারে।

বিনয় নিজেই একটা গোলমালে পড়ে রয়েছিল। সে হল নিভাকে নিয়ে। একই বাড়িতে ওরা থাকত। প্রায়-ই দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত। কিন্তু মেয়েটি এত সংযত যে ইচ্ছা থাকলেও বিনয় আলাপ করতে ভরসা পায়নি। সেদিন রেশনের দোকানে চাল ফুরিয়ে যাওয়ায় হঠাৎ সে সুযোগ এসে গেল। তারপর মেয়েটি হঠাৎ খুব কাছে এল। কত ঘরোয়া পরিবেশে বিনয় তাকে কাছ থেকে দেখল। মনে হল সে যেন তার কত আপনার, কত দিনের পরিচিতি। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করে, বিনয় তার বেশী এক পাও এগোতে চাইল না। কি জানি এই যে সঙ্গ সাহচর্য পাওয়া যাচ্ছিল, একটা ভুল বোঝাবুঝিতে যদি সেটাও বাতিল হয়ে যায়? এই ভয়ে বিনয় নিজেকে খুব সংযত

করে রাখত। মেয়েটিকে দেখতে তার খুব ভাল লাগত, তার সঙ্গ ভাল লাগত, তার হাতে হাত লাগলে ভাল লাগত। কিন্তু ভাললাগা থেকে ভালবাসা কত দূরে সেটা বিনয় বুঝে উঠতে পারছিল না।

নিজের দারিদ্রের জন্যেও বিনয়ের গভীর সংকোচ ছিল। অবশ্য মেয়েটির পরিবারও খুবই কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলেছিল। কিন্তু ওরা ত আগে সুখের দিন দেখেছিল। ওদের সঙ্গে ধনী পরিবারের পরিচয় ছিল। ওর মতো মেয়ে কি বিনয়ের মতো গরীব লেখককে মন দিতে পারে? হয়ত অনুকম্পাবশেই মেয়েটি কাছাকাছি এসেছিল। এর বেশী কিছু আছে কি না, বিনয়ের সাহস হয়নি যাচাই করবার। কি জানি যদি তার কল্পনার স্বর্গ ভেঙ্গে যায়?

বিনয় নিভাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করত। আশ্চর্য! কি লড়াই করছিল সে। অথচ কোনদিন তার ব্যবহারে বেচাল লক্ষ্য করা যায়নি। চঞ্চল রায় মিথ্যে অভিযোগ করলে কি হবে, বিনয় ত নিজের কানে শুনেছিল নিভা চঞ্চলকে বারণ করে দিল তাদের বাড়ীতে আসতে। পরে অবশ্য চঞ্চল এসেছিল, সঃ গুপরিবারকে নিয়ে বাগানবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়েছিল। বিনয় মনে মনে কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। সে নিভাকে কিছু বলতে পারেনি, আর বলবেই বা কোন্ অধিকারে। একদিন কি খেয়াল হল, সে চঞ্চলের বাগানবাড়ির আশেপাশে ঘুরে এল। ভদ্রলোকের মোটেই সুখ্যাতি নেই। প্রতিবেশীরা তাকে নিয়ে অনেক কুৎসা শোনাল। বিনয়ের সন্দেহটা ঘনীভূত হল। অবশ্য নিভাদেবীর মা-বাবাও সঙ্গে ছিলেন সেদিন। বাবা না হয় পাগল, কিন্তু মা ত স্নেহপ্রাণা ধর্মপরায়ণ মহিলা। তবু একটা খোঁচা মনের মধ্যে পীড়া দিত। তারপর পরেশবাবুর মামলার ব্যাপারে চঞ্চলদের বাড়ীতে সে দু'একবার গেল নিভাদেবীর সঙ্গে। অবশ্য মিসেস রায়ের সঙ্গেই দেখা করতে। চঞ্চলবাবু নিজের মামলার কেলেঙ্কারি নিয়ে ব্যস্ত। তবু ওদের ঐশ্বর্যের বহব দেখে বিনয় নিজেকে আরো সংকুচিত মনে করল। আদালতে মামলা চলাকালীন হরিচরণবাবুর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক নিজেই গায়েপড়ে আলাপ করলেন। ফৌজদারী বিভাগে চঞ্চলের মামলা চলছিল। হরিচরণবাবু খবর দিলেন নিভাদেবীকে চঞ্চলবাবু বাগানবাড়িতে ধর্ষণ করতে গিয়েছিল। কিন্তু তার মাথা ফাটিয়ে নিভাদেবী নিজের মান বাঁচাতে পেরেছিলেন। অবশ্য হরিচরণ নিজে লোকটা সুবিধের নয়। তবু তার এই কথায় নিভার ওপর বিনয়ের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।

কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন তার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেটি হল নিভাদেবীর ভবিষ্যৎ।

এই রকম একটি সুন্দরী, সংযত, সাহসী মহিলার কি হাল হয়ে পড়েছে। এখন কি করবে সে? যে অস্থায়ী চাকরিটা বিনয় যোগাড় করে দিয়েছিল, সেটার মেয়াদ ফুরিয়েছে। এত বড় বিপদ গেল তার কোন আত্মীয়-স্বজনের পাত্তা নেই। তবু মিসেস রায় যদি পাশে

এসে না দাঁড়াতেন, নিভাদেবীর কি হত তা ভাবতেও পারে না বিনয়। হয়ত মিসেস রায় নিভার ওপর তাঁর স্বামীর অন্যায় অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। কিন্তু এর পর?

বিনয় নিজের ঘরে হাতের লেখাটা নিয়ে বসেছিল, কিন্তু এই সব চিন্তা তার মনে তোলপাড় করছিল সন্ধ্যার অন্ধকার যেন তার মনেও কালি ঢেলে দিল। হঠাৎ মুখ হাঁড়ি করে হাজির হল বাড়িওয়ালা নন্দ নন্দী।

নন্দ আফসোস করে বলল, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেল, বিনয় সর্বনাশ হয়ে গেল।'

বিনয় লেখা থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'কি সর্বনাশ হল আপনার?'

নন্দ বলল, 'এ্যাঁ বল কি? আমার এতবড় সর্বনাশ হল আর তুমি জানতে চাইছ কি হল? লোকটা বৌকে গলা টিপে মারল, কিন্তু আমাকে ধনেপ্রাণে মেরে গেল।'

বিনয় ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'কি বলতে চান খুলে বলুন।'

'ভেবেছ এ বাড়িতে আর ভাড়াটে জুটবে? আমরা কেউ বসবাস করতে পারব?'

'কেন?'

'এ হল হানাবাড়ি, বিনয়, এ হল হানাবাড়ি।'

'কি ছেলেমানুষের মতো বকছেন! বিনয় ধমক দিল।'

'ছেলেমানুষের মতো?' নন্দ সভয়ে বলল, 'তুমি শোননি কান্না? সারা রাত্তির ধরে কে গুমরে গুমরে কাঁদে! রাম, রাম, রাম, রাম! বিনয় তুমি গয়ায় পিণ্ডি দেবার ব্যবস্থা কর ভায়া! না হয় আমি সব খরচা দেব।'

বিনয় বিদ্রূপ করে বলল, 'জ্যান্ত থাকতে ত তাঁর অনেক পিণ্ডি চটকেছেন, এখন উনি মারা গেছেন। এখন আর সে দয়া নাই বা করলেন।'

'তুমি বল কি বিনয়? পিণ্ডি দেব না? একে অপঘাতে মৃত্যু, তায় মেয়েছেলে। পিণ্ডি না দিলে এই বাড়িতে তিষ্টতে পারব না। রাম, রাম, রাম, রাম!'

হঠাৎ নন্দবাবু অন্ধকার দরজার দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে বিনয়ের কাছে সরে এল!

বিনয় বলল 'কি হল আবার?'

নন্দ ত্রস্তকণ্ঠে বলল, 'ঐখানে কিসের ছায়া? রাম, রাম!'

'কেন মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন?' বিনয় সাহস দিল, 'কেউ কোথাও নেই।'

'ভায়া, আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় ধড়ফড় করছে।'

বিনয় বলল, 'যান, নিজের ঘরে গিয়ে গিন্নীর আঁচল ধরে বসে থাকুন গিয়ে।'

'তাই যাই, তাই যাই।' নন্দ দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, 'ভাল কথা মনে পড়েছে। আচ্ছা, বিনয়, খুনেটার শাস্তি হল না? শুনছি পাগলা গারদে গেল। আবার এসে জ্বালাবে না ত খুনেটা?'

'কে খুনে?'

'ঐ যে গো! তোমারও কি মাথা খারাপ হল? ঐ যে লোকটা তার বৌকে খুন করল।'

'না, তিনি খুনে নন,' গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বিনয় বলল, 'খুন তিনি করেননি।'

'তুমি আমায় অবাক করলে, বিনয়! তবে আবার কে খুন করল?'

বিনয় অন্ধকারে দৃষ্টি রেখে আচ্ছন্নের মতো বলল, 'খুন করেছে এই সমাজ। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সমাজ। একটা কেন, হাজার হাজার খুন করে চলেছে। পারবেন শাস্তি দিতে এই সমাজকে?'

'কি যে বল তুমি বিনয়, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। ভাই নিদেন একটা নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করাই। নইলে বাড়িতে ভাড়াটে জুটবে না।'

নন্দ নন্দী দরজা পর্যন্ত গিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে পিছিয়ে এল।

বিনয় ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কি হল! কি হল আপনার?'

নন্দ চোখ বুজে বুকে হাত দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে শুধু বিড়বিড় করে বলে চলল, 'রাম, রাম, রাম রাম!'

নিভা ঘরে ঢুকল। যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি।

বিনয় সাদর অভ্যর্থনা করল, 'ও! আপনি? আসুন। নন্দবাবু হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছেন।'

নন্দ মিটমিট করে চেয়ে বলল, 'কে, কে? ও উনি উনি? আমি ভাবলুম ওঁর মা—'

'আঃ, নন্দবাবু', বিনয় ধমক দিয়ে বলল, 'আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? কি বলছেন আপনি? যান এখান থেকে।'

নন্দ তখনও হাঁফিয়ে বলল, 'যাই, তাই যাই।'

নন্দ বিদায় হলে হাঁফ ছেড়ে বিনয় বলল, 'উঃ, আপদ বিদায় হল, আসুন, বসুন!'

নিভা নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থেকে আঙ্গুলে আঁচল জড়াতে লাগল।

বিনয় দরদের সঙ্গে বলল, 'কি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কি ভাবছেন? কিছু বলবেন?'

নিভা কাতরকণ্ঠে বলল, 'বাবাকে ত রাঁচীর পাগলা গারদে পাঠানো হল। যাবার সময় ওরা একবার দেখা করতেও দিল না। শুনলুম তিনি নাকি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। কখনও কাঁদছেন, কখনও হাসছেন, কখনও মাথার চুল ছিঁড়ছেন।'

'সে আমিও শুনেছি। বিনয় বলল, 'আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। কেউ কোন কথা বলতে পারল না। দুজনের মধ্যে কথা যেন

ফুরিয়ে গিয়েছিল। আবছায়া অন্ধকারে স্তব্ধতা যেন কঠিন বোঝার মতো হয়ে দাঁড়াল।

নিভা নিজেই শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আমি দাঁড়াই কোথায়?'

বিনয় মহা ফাঁপরে পড়ল। কি জবাব দেবে সে? সুন্দরী যুবতী, যার বাবা পাগল হয়ে পাগলা গারদে আশ্রয় নিয়েছে, মা অপঘাতে প্রাণ হারাল, সে মেয়েটির আশ্রয় কোথায়? হোস্টেল. আশ্রম? আত্মীয়ের বাড়ি মনে পড়ল। কিন্তু আত্মীয়দের ত কারুর টিকি দেখা গেল না।

বিনয় চিন্তিত হয়ে বলল, 'তাই ত?' আপনি কোথায় দাঁড়াবেন? এ এক মহা সমস্যায় ফেলেছেন। আচ্ছা, আপনার কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই?'

'যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ত চলে গেলেন। এখন আমি আপনার মতোই একা।'

'বেশ ত, আপনি যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন না।'

'নন্দবাবু থাকতে দেবেন কেন? তাছাড়া ওঘরের হাওয়া আমার বিষাক্ত লাগছে।'

বিনয় বলল, 'তবেই ত মুশকিল!'

নিভা হঠাৎ আবেগের সঙ্গে বলল, 'আপনি আমায় আশ্রয় দিন। নইলে কোথাও আমার গতি নেই।'

বিনয় আশ্বাস দিয়ে বলল, 'বেশ ত, ও ঘরের হাওয়ায় যদি আপনার কষ্ট হয়, আপনি থাকুন না এই ঘরে।'

'কিন্তু এখানে আমি থাকব কোন্ অধিকারে?'

'এই অধিকারে যে আপনি বিপদে পড়েছেন।'

'কিন্তু সমাজ সে অধিকার স্বীকার করবে না। আপনার নির্মল চরিত্রে কালি ছেটাবে।'

'তা উপেক্ষা করবার মতো সাহস আমার আছে।'

'তার চেয়ে বড় অধিকার কি আপনি আমায় ভিক্ষে দিতে পারেন না?'

'আপনি—' বিনয় আশ্চর্য হয়ে বলল, 'মানে কি মীন্ করছেন? ও বুঝেছি। আপনি —তুমি মানে, এই কপর্দকহীন গরীবকে—'

'হাঁ, হাঁ তাই, লজ্জার মাথা খেয়ে বেহায়ার মতো আপনার কাছে—' নিভা কথা শেষ করতে পারল না, তার কণ্ঠে গভীর আকুতি।

বিনয় যেন নিভার ইঙ্গিত বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, 'নিভা, এ তুমি কি বলছ? আমি ভাবতুম এই ছন্নছাড়া গরীবকে অনুকম্পা কর, দয়া কর—তাকে তুমি—'

নিভা আবেগে বলল, 'ভালবাসি, মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তুমি আমায় ত্যাগ কর না।'

বিনয় গভীরস্বরে বলল, 'আমিও তোমায় ভালবাসি, নিভা। কিন্তু কোনও দিন

প্রকাশ করবার সাহস করিনি। ভয় হ'ত তুমি যদি আমায় ফিরিয়ে দাও। তুমি যদি রাগ কর আমার খারাপ আচরণে, তুমি যদি নিজেকে সরিয়ে নাও। আমি মনের গভীর ভালবাসা মনের মধ্যে চেপে রেখে গুমরে মরেছি।'

'আমারও মনে ভয় ছিল,' নিভা বলল, 'আমিও ভাবতুম তুমি যদি আমায় না চাও। এখন আর তবে আমাদের বিয়ের বাধা কি?'

'না, না, নিভা। বিনয় ঈষৎ চিন্তা করে পরিতাপের সঙ্গে বলল, 'আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি না।'

যেন আকাশ ভাঙ্গল নিভার মাথায়। সে আহত হয়ে বলল, 'কেন? কেন? তুমি আমায় অবিশ্বাস কর? বিশ্বাস কর আমার কুমারীদেহ শুচিশুদ্ধ।'

'ছি, ছি, এ কথা তুমি কেন তুলছ নিভা, আমি তোমায় ভালবাসি, তোমায় বিশ্বাস করি। কিন্তু—'

'তবে কেন তোমার দ্বিধা?'

'নিভা, বিশ্বাস কর, আমি বড় গরীব। আমার দু'বেলা ভাত জোটে না। এই দারিদ্র্যের মধ্যে আমি তোমায় কেমন করে টেনে আনব? তাঁর চেয়ে তুমি অন্য কাউকে বিয়ে কর, যার কাছে খাওয়া-পরার ভাবনা হবে না। তুমি যুবতী, তুমি সুন্দরী, তোমার যোগ্য উপযুক্ত পাত্রের অভাব হবে না, নিভা।'

নিভা ব্যাকুল হয়ে বলল, 'না না, আমি আব কাউকে চাই না, আমি আর কিছু চাই না। তোমায় পেলে আমি দারিদ্র্যের শত কষাঘাত হাসিমুখে সইতে পারব।'

'নিভা তুমি অবুঝ হয়ো না। তুমি স্থির হয়ে ভেবে দেখ। দারিদ্র্যের তাড়নে, অভাবের দংশনে তোমার বাবার আজ কি অবস্থা হয়েছে? তোমার মা আজ কোথায়? তাঁদেরই সন্তান তুমি আজ কোথায় দাঁড়িয়েছ? এ জেনে-শুনেও আমরা তারই পুনরাবৃত্তি করব?'

'দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সয়ে গেছে, ও আর নতুন করে কি কষ্ট দেবে? আমরা দুজনে সব কষ্ট সইতে পারব।'

'আমি হয়ত সইব, তুমি সইবে। কিন্তু তারপর যাদের আমরা এই পৃথিবীতে আনব, সরল নিষ্পাপ শিশু তারা কোন্ অপরাধে এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করবে? তাদের পেটে পড়বে না ভাত, গায়ে জুটবে না কাপড়, দিতে পারব না শিক্ষা। পশুর মতো তারা জন্মাবে, পশুর মতো এক গ্রাস খাবারের জন্যে তারা কাড়াকাড়ি করবে, পশুর মতোই মরবে। কি লাভ তাতে?'

'আমরা দারিদ্র্যকে অতিক্রম করব। তুমি লিখবে বই। আমি করব চাকরি। দুজনের উপার্জনে আমরা অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে নেব। সাজিয়ে তুলব আমাদের ছোট্ট সংসার।'

'তা পারবে না নিভা, তা কিছুতেই পারবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আজীবন

উদয়াস্ত খেটে গেলেও মরণকালে দেখবে, যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানেই হয়েছে সারা। এই হল আমাদের জীবনকাব্য। আমায় ক্ষমা কর নিভা। তুমি কোনও যোগ্য ভাগ্যবানকে বিয়ে কর।'

'তুমি আমায় কিছুতেই বিয়ে করতে পার না?' স্ত্রীর সামান্য বোঝা বহন করার সাহস তোমার নেই?' নিভার কণ্ঠস্বরে বিক্ষোভের ধ্বনি।

বিনয় অনুনয় করল, 'আমায় ভুল বুঝ না। সামাজিক অক্টোপাসের যে বাঁধনে আমরা বাঁধা পড়েছি, সে বাঁধন থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে সবার আগে।'

নিভা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'থামাও তোমার কথার মার-প্যাঁচ। তোমরা পুরুষ শুধু স্তোকবাক্যই দিতে শিখেছ। এই যদি তোমার মতলব ছিল, তবে কেন তুমি আমায় এতখানি প্রশ্রয় দিলে? কেন তুমি আমায় এত কাছে আসতে দিলে? কেন তোমার ঘরকন্না আমার হাতে তুলে দিয়ে আমায় লোভ দেখালে?'

'আমার মনে সত্যি কোনও পাপ ছিল না। কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না। আমার আচরণ যদি তোমায় ভুল বুঝিয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা কর।' বিনয় মিনতি করল।

'ক্ষমা!' নিভার বিদ্রোহী মূর্তি প্রকাশ পেল। সে বলল, 'আমি কাউকে ক্ষমা করব না। আমি তোমায় ক্ষমা করব না। ক্ষমা করব না সমাজকে। আমি অনেক সয়েছি, আর সইব না। শাস্তি দেব, কঠিন শাস্তি দেব। আগুন জ্বলবে, পুড়িয়ে ছারখার করব। সেই আগুনে নিজেও যদি ছাই হয়ে যাই—সেও ভাল।'

নিভা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ

আগুন জ্বলছিল শহরের দিকে দিকে।

সকাল থেকে ছোট ছোট মিছিল বেরিয়েছিল খাদ্যের দাবিতে, মূল্য হ্রাসের দাবিতে, কালোবাজারী রোখার দাবিতে। মিছিলগুলি একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশে জমায়েত হয়েছিল। তারপর শ্লোগান দিতে দিতে বড় মিছিলটি এগিয়ে চলল সরকারী দপ্তরের দিকে। বিরাট মিছিল। পুলিস বাধা দিল। তারপর খণ্ডযুদ্ধ একই জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকল না। ছড়িয়ে পড়ল শহরের দিকে দিকে। পথে পথে ব্যারিকেড্ পড়ল। পুলিশবাহিনী এসে সরিয়ে দিতে গেল। প্রথম ইট পাটকেল। পুলিস তেড়ে গেল লাঠি নিয়ে। মার খেল অনেকে। আরও ইট পাটকেল। পুলিসও ছুঁড়ল ইঁট। বোমা ফাটল। টিয়ার গ্যাস। ধোঁয়ায় ধোঁয়া।

চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। অনেকে জখম হল দুই পক্ষে। শুরু হল পুলিস বাহিনীর সঙ্গে লুকোচুরি। পুলিসদল কাছে আসে, জনতা সরে পড়ে। গলি ঘুঁজির মধ্য থেকে ইট পাটকেল ছোঁড়ে, বোমা ফাটায়। পুলিসও গলির ভিতরে টিয়ার গ্যাসের শেল ছোঁড়ে। সেটা সশব্দে ফেটে গিয়ে চোখের জল ঝরতে থাকে।

সহায়রাম প্রথমটা এসব দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কি কাণ্ড রে বাবা! পুলিসের সঙ্গে লড়াই! যে পুলিসকে দেখলে সে দশ হাত দূরে পালিয়ে যায়, তাদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছিল। গাঁয়ে জমির দখল নিয়ে, ফসলের ভাগ নিয়ে মাঝে মাঝে মাথা ফাটাফাটি হয়, উভয়পক্ষ লাঠিসোঁটা নিয়ে লড়ে, সড়কি বল্লমও চলে, কিন্তু পুলিস এলে যে যেখানে পারে পালিয়ে যায়। কটাই বা পুলিস থাকে, কিন্তু তাদের হাতে বন্দুক। লড়াই কি করে হবে তাদের সঙ্গে? কিন্তু শহরের ব্যাপারই আলাদা। এখানে বন্দুকধারী পুলিসকে কেউ তোয়াক্কাই করছিল না। দমাদম ইট মারছিল।

সহায়রাম নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে একটা দোকানের পাশে ঘাপটি মেরে ছিল। দুম করে একটা ইট টিনের ওপর এসে পড়ল। যাক মাথাটা খুব বেঁচে গেল। ঐ আধলা ইটটা এসে মাথায় পড়লে, আস্ত থাকত না মাথা, খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছিল, সহায়ের চোখ দিয়েও জল পড়ছিল। ময়লা কাপড়ে ঘষে ঘষে চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল, চোখে সে ভাল করে দেখতেও পাচ্ছিল না। যদি দেখতে পেত, তাহলে সে হয়ত অন্য কোথাও পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারত। কিন্তু কিছু বোঝবার আগেই একটা পুলিস সহায়কে দোকানের পাশ থেকে টেনে বলা নেই কওয়া নেই মোটা লাঠি দিয়ে বেধড়ক ঠেঙ্গিয়ে গেল। সহায় অনেক কাকুতিমিনতি করল কিন্তু নির্দয় মারের হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেল না। এই কদিন ভাল করে পেটে ভাত পড়েনি, ভিক্ষেও জোটে নি, ছেলের খোঁজে টহল দিতে দিতে ভিক্ষে করবার অবসরও সে পায়নি। মার খেয়ে সে রাস্তায় পড়ে গেল। পুলিসটা ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল।

খানিকক্ষণ সে পড়ে রইল। তারপর আরক্ত চোখ মেলে দেখল এ দিকটা অনেকটা ফাঁকা। রাস্তা ইঁটের টুকরোয় লাল হয়ে গিয়েছিল। সহায়ের গা-গতরে ভীষণ ব্যথা! তবু ক্ষেত মজুরের শরীর, রোদে জলে পোড় খাওয়া। ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। সহায় টেনে টেনে নিজেকে দাঁড় করাল। মাথাটা টলছিল, পা কাঁপছিল, মনে হচ্ছিল পৃথিবী যেন ঘুরছে। তবু সহায় দাঁড়িয়ে উঠে এক পা এক পা করে এগুতে লাগল। হল্লাটা যেন ওদিকে গিয়েছে। গলির মোড়ে কতকগুলো ছোট আর মাঝারি ছেলে জটলা করছিল। তাদের পিছনে দু'একজন ছোকরা উস্কানি দিচ্ছিল, বলছিল, 'পুলিসের ভ্যান এলে দমাদম ইট মারবি।'

ছোট ছেলেরা ইট হাতে নিয়ে পিছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুলিসের গাড়ির প্রতিক্ষা করে।

সহায় ভয় পেয়ে বলল, 'বাপজানেরা ঘরে যাওনি। পুলিস আসি পড়িবে, আবার মার দিবে।'

এক ছোকরা ধমক দিয়ে উঠল, 'ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না, বুড়ো। পুলিসের দালালি যদি করিস ত বোমা মেরে খুলি উড়িয়ে দেব।'

সহায় ভয় পেয়ে আর কিছু বলল না।

সে একটু দূরে নিজেকে টেনে নিয়ে চলতে লাগল।

একটা পুলিস ভ্যান আসতেই ছোট ছোট ছেলেরা তার ওপর দুমদাম করে ইট ফেলল। গাড়ি থামল। কতকগুলি পুলিস গাড়ি থেকে টপাটপ নেমে শিশু আক্রমণকারীদের পিছু ধাওয়া করল। ছোকরাসুদ্ধু সবাই গলির মধ্যে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। একটি ছোট ছেলে পড়ে গিয়েছিল, সে সভয়ে দেখছিল একজন পুলিস তেড়ে আসছে লাঠি হাতে, ছেলেটা কাতর চিৎকার করে উঠল, তার মুখ দেখে সহায়ের মনে পড়ল মনুর মুখ। পুলিসটা এখনই ঘা বসাবে ছেলেটার ওপর। সহায় তৎক্ষণাৎ রাস্তা থেকে একটা বড় ঢিল কুড়িয়ে নিল। লক্ষ্য করে ছুঁড়ল পুলিসটার দিকে। ঢিল মেরে আম পাড়া অভ্যাস ছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য! পুলিসের কানের কাছে সে ঢিলটা সজোরে লাগতে সে যন্ত্রণায় বসে পড়ল। হাতের লাঠি ছিটকে পড়ল। ছেলেটা উঠে প্রাণপণ দৌড়ে পালাল। সহায়ের মনে একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগল, সে পুলিসকে মেরেছে!

তার দিকে এবার পুলিস তেড়ে আসার আগেই সহায়রাম অন্য একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। রাস্তার আলোগুলি কারা নিভিয়ে দিয়েছিল। দোকানপাটও বন্ধ! বাড়ির জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়া দু-চারটে আলোর রেখায় পথচলা দায়। সহায় এক জায়গায় বসে ঝিমোতে লাগল। সমস্ত এলাকাটায় একটা যেন থমথমে ভাব।

সে ভাবল আজকের ঘটনার কথা। সব কেমন যেন গুলিয়ে যেতে লাগল। এ পোড়া শহরে আর সে থাকবে না। মনু ত গেল। সদুকে যেমন করে হোক টেনে নিয়ে আবার গাঁয়ে ফিরতে হবে। শহরের চেয়ে গাঁ অনেক ভাল। গলির জমা ময়লার পচা দুর্গন্ধকে ছাপিয়ে যেন তার নাকে একটা ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ লাগল। যদি আবার ভাল বৃষ্টি হয়, আকাল দূর হয়, ঐ মাটি চষেই সে ফসল ফলাবে, পরের জমিতে মুনিস খাটবে। হোক না পরের জমি, তবু ফসল ত সে ফলায়। কিছু মজুরি পায়, খেতে পায়। তবু পেটভরে খেতে পায় না। কেন খেতে পায় না? তারা খাটে, তারা রোদে জলে তেতে পুড়ে ভিজে দিনের পর দিন ফসল ফলায় তবু তারা পেট ভরে খেতে পায় না

কেন? জমিতে সে গায়ের ঘাম ঝরিয়ে ভিজিয়ে দেয়, তবু জমি তার নয় কেন? কেন? কেন?

সহায় কোন সদুত্তর পেল না, পায়ও না। একমুখ ভরতি থুতু ফেলল। গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল। একটু জল না খেলে চলে না। সে উঠবার চেষ্টা করল, গায়ে গতরে ভীষণ ব্যথা। সব টনটন করছিল। তবু বড় তেষ্টা। জল, বড় রাস্তার পাশে একটা টিপকল আছে, ছেলেগুলো কাঁদানে ধোঁয়া থেকে চোখের যন্ত্রণা কমাবার জন্যে ঐ টিপকল থেকে জল টেনে নিচ্ছিল। সহায় আস্তে আস্তে সেদিকে পা বাড়াল।

রাস্তায় পড়তেই সহায় দেখল, ভীষণ বিপদ্। কোথায় যেন আগুন লেগেছে। অন্ধকার আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে।

সহায় চেয়ে দেখল, ওপাশের রাস্তায় একটা মোটরগাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সহায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেলিহান শিখার নাচ দেখতে লাগল। তৃষ্ণার কথা সে ভুলে গেল। কেন আগুন দিল ওরা? নরেন সামুইর ধানের গোলায় আগুন লেগেছিল। সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, গাঁয়ের সবাই মিলে কলসী কলসী জল দিয়ে সে আগুন নিবিয়েছিল। কে জানে ঐ আগুন ছড়িয়ে পড়ে কার খড়ের চালা পুড়িয়ে দেবে। কিন্তু এখানে কই কেউ ত আগুন নেভাতে আসছে না!

হাতে টিন নিয়ে দু'তিনটি ছোকরা ছুটে এল, একজন সহায়কে দেখে বলল, 'এই বুড়ো পালাও, পালাও পুলিস আসবে, গুলি চালাবে।'

'আগুন লাগলে পুলিস গুলি চালাবি কেন?' সহায় জিজ্ঞাসা করল।

'বুদ্ধু কোথাকার!' ছোকরা বলল, 'আগুন কি লেগেছে? আমরা লাগিয়েছি।'

'কেন?'

'আমরা পায়ে হেঁটে চলব, আর ওরা গাড়ি চড়বে? আমরা ভুখা মরব, ওরা পোলাও কালিয়া ওড়াবে? এ আর নয়। এই চল্, ঐ গুমটিটা জ্বালিয়ে দি।'

কি বলে এরা? সহায় তাজ্জব হয়ে ভাবতে লাগল।

বিনয় ভাবতে লাগল, কি বলে নিভা? বলে, 'আগুন জ্বালব, পুড়িয়ে ছারখার করব। সেই আগুনে নিজেও যদি ছাই হয়ে যাই—সেও ভাল।'

এর মানে কি? শান্ত অথচ তেজস্বিনী মেয়েটি কি বলতে চেয়েছিল? এটা কি শুধু আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধ বিস্ফোরণ, না প্রতিশোধের তীব্র স্পৃহা? বিনয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। যাকে দূর থেকে দীর্ঘদিন লক্ষ্য করেছে, যে কাছে আসতে সে সুখী হয়েছে, যাকে সে স্নেহ প্রীতি করুণা দিয়ে অভিষিক্ত করেছে, যাকে নীরবে ভালবেসেছে, সেই মেয়েই

যখন নিজেই আত্মনিবেদন করল. বিনয় যেন সানন্দ আকস্মিকতায় পুলকিত হয়েছিল। কিন্তু তার মনে হয়েছিল মেয়েটির প্রেম হয় ত স্থায়ী হবে না. দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দলিত হলে তা চুরমার হয়ে যাবে। বিনয় এ প্রেমকে হারাতে চাইল না, চাইল তাকে মনের অন্তঃস্থলে নিবিড় করে ধরে রাখতে। বিবাহ ত শুধু দেহের মিলনের ছাড়পত্র নয়। দায়িত্ব. নির্ভরতা. দৈনন্দিন দুঃখ সইবার মিলিত ধৈর্য. একঘেয়েমি—এসবের উর্ধ্বেও প্রেমকে স্থায়ী আসনে বসাতে হবে। কিন্তু সে পরীক্ষার সময় কি এসেছিল ? শুধু অন্তরে অন্তরে সংঘাত নয়, বাইরের রূঢ় আঘাত সইবার মতো সহনশীলতাও চাই। যে সামাজিক নিষ্পেষণে তার একক জীবনও নিপীড়িত হচ্ছিল, তারও চাপ এই অপাপবিদ্ধা যুবতীর ওপর চাপিয়ে দেবার কি অধিকার বিনয়ের ? যুক্তি বলছিল, না, বিবাহ নয়, বন্ধন নয়, সামনে সংগ্রাম, আরও তীব্র জীবনযুদ্ধ , সামাজিক অত্যাচারের পেষণযন্ত্র উৎখাত করবার লড়াই, এর মধ্যে প্রিয়তমার স্থান কোথায় ? ভাবাবেগ বলছিল, ভুল কর না, যে তোমার কাছে স্বেচ্ছায় আত্মনিবেদন করেছে, যে তোমায় ভালবাসে, যাকে তুমিও ভালবাস, তাকে ফিরিয়ে দিও না, তাকে গ্রহণ কর। বিনয় কি করবে নিজেই স্থির করতে পারছিল না। এর ওপর আবার নিভা বলল, 'পুড়ে ছারখার হয়ে যাই, সেও ভাল।' তবে কি সে আত্মহত্যা করবে, গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালবে ? সবটাই মিথ্যা আশঙ্কা।

সারাদিন নিভার সঙ্গে দেখা হয়নি। সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল, তার খবর বিনয় জানে না। একবার সে নিভার খোঁজ করেছিল কিন্তু তার দরজায় তালাবন্ধ। বিনয় ভাবল আপাততঃ একটা ব্যবস্থা নিভার জন্যে করা দরকার। একটা উপন্যাস তার লেখা ছিল। পৌর প্রতিষ্ঠানের ধাড়ঙ্গদের জীবন নিয়ে লেখা। অনেক পরিশ্রম করে সে ঐ উপন্যাসটা লিখেছিল, তাদের সুখদুঃখ প্রেমভালবাসা নিয়ে। পাণ্ডুলিপিটা বগলে করে সে তার পরিচিত প্রকাশকের কাছে গেল। সমস্ত ব্যাপার খুলে বলতে ভদ্রলোকের বোধহয় করুণা হল। তিনি বললেন বইটা ছাপবেন। কিছু টাকাও নগদ ধরে দিলেন। খুশী হল বিনয়। যা টাকা পাওয়া গেল, তা দিয়ে নন্দবাবুর হাতে দু'মাসের ঘরভাড়াও অগ্রিম দেওয়া যাবে। নিভা বিনয়ের ঘরে থাকবে। আর বিনয় একটা মেসে নিজের ব্যবস্থা করে নেবে। এর মধ্যে রয়ালটির কিছু টাকা সে নিভার হাতে তুলে দেবে। চলুক না কিছুদিন। এর মধ্যে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারলে নিভার চলে যাবে। হয়ত শহরের বাইরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদ যোগাড় করে নেওয়া শক্ত হবে না।

টাকা কটি নিয়ে সে খুশী মনে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল, ইচ্ছা হল তার পরিকল্পনার কথা নিভাকে সে বলে। কিন্তু এরই মধ্যে ও অঞ্চলে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। ইঁট পাটকেল, লাঠি চার্জ. টিয়ার গ্যাসের দাপটে বিনয় ক্ষণিকের জন্য ব্যক্তিগত সমস্যা ভুলে গেল। হাঙ্গামা এড়িয়ে একটু ঘুর পথে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ততক্ষণে অগ্নিসংযোগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এতদূর আশঙ্কা করেনি বিনয়। খাদ্যের দাবিতে সে আবেদন লিখেছিল, শান্তিপূর্ণ মিছিলের সামনে থেকে থানার দিকে গিয়েছিল। পুলিসের মার খেয়েছিল। কিন্তু এই অগ্নিযুদ্ধ তাকে বিব্রত

করল। চোখের সামনে কারা দুধের স্টলে আগুন দিল। ছোকরাগুলি এপাড়ার নয়। কোথা থেকে হাজির হল কে জানে? হাতে পেট্রলের টিন। দাউ দাউ করে স্টলটা জ্বলতে লাগল। ছোকরারা মহা উল্লাসে নৃত্য করতে লাগল, যেমন হোলির সময় খড়ের অসুরকে জ্বালিয়ে লোকে উৎসব করে। এ যেন নতুন বহ্ন্যুৎসব।

সামনের একটা মনিহারী দোকান ভেঙ্গে কারা লুঠ করছিল। ছোটবড় অনেকগুলি লোক রাস্তার প্রায় অন্ধকারে ঠুকে ঠুকে তালা ভাঙ্গল। তারপর যে যা পারল, লুটেপুটে নিয়ে গেল। এ কি কাণ্ড! এ জিনিস ত বিনয় চায়নি; সমাজকে বদলাতে হবে ঠিক, কিন্তু লুঠেরাদের ঠেকাতে কি লুঠেরারা পারবে?

দুধের স্টলটা তখনও জ্বলছিল। কারা বোধহয় খবর দিয়েছিল দমকলকে। ঘণ্টা বাজিয়ে পাড়া সচকিত করে দমকল ছুটে আসছিল, কিন্তু রাস্তার ব্যারিকেডে দমকল আর এগুতে পারল না। তারপর দমকলের ওপর ইট-পাটকেল পড়তে লাগল। স্টলের আগুনে বিনয় দেখল শুধু ছেলে-ছোকরা নয়, দু'চারজন বয়স্কও ঐ ইটপাটকেল ছুঁড়ছিল। এবার একজনকে সে চিনতে পারল। লোকটা আর কেউ না সহায়রাম। আশ্চর্য! শেষে সহায়রাম দমকলের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে! প্রবল আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে দমকলটা ব্যাক করে চলে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু জনতার এক অংশ বাধা দিল। কে বা কারা চোখের সামনে দমকলে আগুন দিল। গভীর ধিক্কার গুমরে উঠল বিনয়ের মনে। বোধহয় পুলিস আসছিল, হুড়মুড় করে লোকগুলি যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। জ্বলন্ত কাঠ হাতে একজন ছুটে এল বিনয়ের দিকে। বিনয় তাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল, 'এই সহায়রাম, কি করছিস?'

সহায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'বাবু, আজ আর আমায় বকনি। আজ আমি সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করি দিব।'

বিনয় ধমক দিল, 'পাগল হলি না কি?' ফেলে দে মশাল। পুলিস আসবে এখনি। এবার গুলি চালাবে।'

বিনয় নিজেই সহায়রামের হাত থেকে জ্বলন্ত মশাল ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। মশালটা নিভে গেল। কিন্তু প্রৌঢ় সহায়রামের মনের আগুন নিভল না। সে বলে উঠল, আজ আর আমায় পুলিসের ভয় দেখাওনি, বাবু। পুলিসকে আর আমি ভয় করি না। আজ আমি পুলিসডারে মারিছি। সুম্বুদ্ধি এক ঢিলে কাত।'

'ছি, সহায়রাম,' বিনয় বলল, 'তুমি পাগল হলে না কি?'

সহায় বলল, 'না বাবু, এতদিন পাগল ছিনু। আজ দাউ দাউ আগুন আমার চোখ খুলি দিছে! আজ আমি সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করি দিব।'

সহায়রাম আবার ছুটে গেল যেদিকটায় দমকল জ্বলছিল।

সাত

জ্বলছিল নিভার মন। সেও ক্ষুব্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠছিল। সেও আগুন জ্বালবে। সে তার রূপের আগুনে পুড়িয়ে মারবে সমাজের লোলুপ নেতাদের। কিসের ধর্ম? কিসের নীতি? তার মা আজীবন পতিপ্রেমে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল, কিন্তু পরিণামে কি পুরস্কার পেল? সে নিজে সাহসের সঙ্গে কামার্ত নরপশুর কাছ থেকে কৌমার্য রক্ষা করেছিল, কিন্তু কি ফল পেল সে? গভীর প্রেমে আকুল হয়ে সে আত্মনিবেদন করল প্রেমাস্পদের কাছে, সেও তাকে প্রত্যাখ্যান করল। আত্মীয়-স্বজন কেউ এগিয়ে এল না। আছে শুধু লিলি, কিন্তু সেও তার নিজের ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত। নিভা কাউকে আর পরোয়া করবে না, মানবে না কোন নীতি, কোনও সামাজিক অনুশাসন।

হরিচরণবাবুকে একদিন সে ঘৃণা করত। আজ তার মনে হল হরিচরণবাবুই তার সহায়ক। না, না, কিসের লজ্জা, কিসের শরম? নিভা সহায়রামের বউ সদুর মতো নোংরা বেশ্যাপল্লীতে আশ্রয় নেবে না। সে তার রূপের জাল বিস্তার করবে সমাজের ওপরতলায়, হোটেলে, বারে, মোটরকারে, রেলের কুপেতে। নিভা কল্‌গার্ল হবে। ভাল ফ্ল্যাটে থাকবে। ভাল পোশাক-আশাক পরবে। তার মূলধন রূপ, যৌবন, শিক্ষা। সবার ওপরে রূপ-যৌবন। চঞ্চল যদি ওর জন্যে পাগল হয়, আরও ধনী, ধনীর সন্তানেরা কি হবে না? হরিচরণকে দালালির কাজে লাগাতে হবে। তার ঠিকানাটাও জোগাড় করেছিল নিভা। উত্তর কলকাতার একটা কুখ্যাত গলিতেই তার আস্তানা। তা হোক তার সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হবে।

মা বলেছিল, 'মাথার এই যে সিঁদুর, হাতের এই যে নোয়া, এর চেয়ে দামী কি আছে রে?' মাথায় সিঁদুর দিতে চেয়েছিল নিভা, পরতে চেয়েছিল নোয়া, কিন্তু সে ত সম্ভব হল না। যাকে সে ভালবাসে, যাকে গোপনে মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছে, নিজের কুমারী দেহটাকে যার হাতে তুলে দিতে চেয়েছে, সে ত সিঁদুর পরাল না। নোয়া পরাল না। 'মা, তুমি কিছু মনে কর না মা,' নিভা কাতর হয়ে স্বগতোক্তি করল। 'তোমার মেয়ে এমন রাস্তা ধরেছে, যেখানে সে আর সাধ্যসাধনা করবে না, করবে তারা যাদের ধন আছে, ঐশ্বর্য আছে, সবার ওপরে আছে লালসা।'

নিভা দেখেছিল শহরের বড় বড় হোটেলে জোড়ায় জোড়ায় স্ত্রীপুরুষ চলাফেরা করে। তারা কি সবাই স্বামীস্ত্রী, তারা কি সবাই প্রেমিকপ্রেমিকা? নিশ্চয় নয়। তাদের অনেকেরই ক্ষণিকের সম্পর্ক, অর্থের বিনিময়ে রূপ-যৌবনের উপভোগ। সমাজ

তা ঘৃণা করে, কিন্তু সে ঘৃণা ত বাইরের। ভিতরে ভিতরে লালসাকে চরিতার্থ করার জন্যে কত আয়োজন, কত উপচার। নতুন পথের পথিক হবে নিভা। সে নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করবে সমাজের এই বাইরের খোলসটাকে।

ঐ যে বিবাহিত প্রৌঢ় নন্দবাবু। বাড়ির মালিক, দোকানের মালিক, ঘরে স্ত্রী রয়েছে। সে কি নিভার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে দেখত না? নিভা মিষ্টি কথা বললে সে কি গলে যেত না? চুলে কলপ লাগিয়ে ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে নিভার মনোরঞ্জন করতে চাইত না? সমাজের উনিও ত একজন ভদ্র ব্যক্তি। কিন্তু উদগ্র লালসায় রেশন দোকানের সামনে লাইনের ছোকরা থেকে এ লোকটিও ত কম যায় না?

ঐ চঞ্চলদা। ঘরে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, অথচ নিভার জন্যে পাগল হয়ে গুরুতর অপরাধ পর্যন্ত করতে দ্বিধা করল না। শুধু কি নিভার জন্যে? আরো কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে। কিন্তু নিজের লালসার জ্বালায় নিজে ত পুড়ে মরছে।

কিন্তু বিনয়বাবু? অদ্ভুত মানুষ। কি চান তিনি? এদিকে বলেন আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু এ কি ভালবাসা? ভালবাসার পাত্রী যখন নিজেকে উজাড় কবে দিচ্ছে তার পায়ে, হেলায় সরিয়ে দিতে দ্বিধা করল না লোকটি। কাপুরুষ, স্বার্থপর, আত্মবিলাসী। কি জানি? অন্তত সাধারণের ব্যতিক্রম সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম নিয়ে তার কি হবে? সাধারণের মধ্যেই নিভা অসাধারণ হযে উঠবে।

হরিচরণ লোকটিকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। লিলির কাছে ওর কুকীর্তির কথা সে কত শুনেছে। বাগান-বাড়িতে চক্রান্তের মূলেও ছিল ঐ হরিচরণ। কিন্তু ঐ রকম লোককেই নিভার চাই, রূপের দালালি করতে, যৌবনের দুতিয়ালী করতে। কিন্তু আজ আর যাওয়া হল না লোকটার বাড়িতে। রাস্তায় হাঙ্গামা বেধেছিল। মিছিল, শ্লোগান, ইট-পাটকেল, টিয়ার গ্যাস, গুলি, আগুন! দুপুরে বাড়ি ফেরার পর আর বেরবার সুযোগ মিলল না। যাক একদিনে আর কি আসে যায়? লোকটার ঠিকানা তো জানা আছে, কাল খুঁজে নেওয়া যাবে।

অসতর্ক মুহূর্তে সে একবার বিনয়ের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রোজ রোজ গিয়ে গিয়ে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ওর ঘরে যাওয়া। আজও সে অভ্যাসমত অন্যমনস্ক হয়ে হাজির হয়েছিল সেখানে। ভালই হল ঘরে তালাচাবি লাগান। যদি দেখা হ'ত? মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে আসত নিভা। বিনয়কে সে আর গ্রাহ্য করবে না, আর আমল দেবে না। নিভা আর তার মুখ চেয়ে চলবে না। না, কিছুতেই না।

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছিল। নিভার মনেও অন্ধকার। ঘরের মধ্যে

আবহাওয়া বিযাক্ত লাগছিল। অন্ধকারেই বসেছিল নিভা। বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে আকাশ পাতাল ভাবছিল। হঠাৎ আবার মার কথা মনে হল, ঠিক ঐ জায়গায় মাকে খুন করল পাগল বাবা। উঃ সে কি বীভৎস দৃশ্য। মার চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। গলায় আঙুলের দাগ! বুকটা দুরদুর করে উঠল নিভার। 'মা, মা। তোমায় আমি ত ভয় করি না। অপঘাতে মৃত্যু। তবু তুমি আমার ত কোন ক্ষতি করবে না।'

হঠাৎ দরজায় একটা আওয়াজ হল ক্যাচ করে। কার যেন পদশব্দ! 'কে, কে!' সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল নিভা।

'চুপ। চেঁচিও না!' কে যেন চাপা গলায় বলল। গলাটা ঠিক চিনতে পারল না নিভা। সে ছুটে গিয়ে আলোটা জ্বালল। অস্পষ্ট আলোয় সে দেখল একটা জোয়ান পাঞ্জাবী ঘরে ঢুকেছে। একমুখ গোঁফ দাড়ি, পরনে পাঞ্জাবীর পোশাক, মাথায় একটা পাগড়ি।

লোকটা নিজের ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করল চুপ করে থাকতে। নিভা আতঙ্কভরা চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। চারিদিক সাবধানে দেখে সহজগলায় লোকটা বলল, 'আমায় চিনতে পারছ না?'

এবার চিনতে পারল নিভা, বলল, 'চঞ্চলদা? তোমার এ বেশ কেন?'

চঞ্চল বলল, 'আস্তে! আমি লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আদালতের বিচারে আমার দু'বছরের জেল হয়েছে। কিন্তু ওদের আমি কলা দেখিয়েছি, ধরবার আগেই ফেরার হয়েছি। তোমার সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করার জন্যে কদিন ধরে চেষ্টা করছি, কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারিনি। আজ দেখা হয়ে গেল।'

'কিন্তু কি চাই তোমার এখানে?'

'তোমার কাছে আবার এসেছি, নিভা, এবার বিজয়ীর অহঙ্কারে নয়, ভিখারীর আকুলতা নিয়ে। তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবে কি?'

'কি প্রার্থনা তোমার?'

'যে প্রার্থনা আগেও করেছি, আজও তাই করছি। ক্ষমতার গর্বে যে দাবী একদিন করেছিলুম, প্রেমের আবেগে সেই ভিক্ষাই আজ চাই।'

'তুমি আমায় চাও, চঞ্চলদা?'

'হাঁ, নিভা, তোমায় আমি চাই, বিলাসের খেলনা হিসাবে নয়, জীবনের সঙ্গিনী হিসাবে। পুরনো দিনের কথা ভুলে যাও নিভা, এস, পুরনো কালিমা আমরা মুছে ফেলি। চল তোমায় নিয়ে চলে যাই কোনও দূর দেশে, যেখানে কেউ আমাদের জানবে না, চিনবে না, যেখানে পরস্পরকে আমরা নিবিড় করে পাব। বিশ্বাস কর নিভা, তুমি যা

চেয়েছিলে সব আমি দেব। আমাদের থাকবে ছোট্ট বাড়ি, আমি—আমি বিয়ে করব তোমায়—'

নিভা স্পষ্ট বলল, 'না, আমি আর তা চাই না। আমি যা চাই, পারবে তা দিতে?'

আগ্রহের সঙ্গে বলল চঞ্চল, 'বল, বল নিভা, কি চাও তুমি। যা চাইবে সবই আমি দেব।'

নিভা বলল, 'ছোট্ট বাড়িতে আমার মন উঠবে না। দেবে মস্ত বাড়ি?'

'নিশ্চয় দেব।'

লুব্ধস্বরে নিভা বলল, 'দেবে অনেক টাকা হীরে জহরৎ, মোটরকার?'

'দেব, কোনও কার্পণ্য করব না। যেমন করে পারি যোগাড় করে দেব।"

'আমি তোমায় কিছুতেই বিয়ে করব না! তুমি আমার কাছে আসবে, যাবে। আমি দুবেলা তোমার অর্থ শোষণ করব আর তোমায় মনে-প্রাণে ঘৃণা করব। পারবে সইতে?'

'নিভা, তুমি কি আমায় উপহাস করছ?'

'না, না, উপহাস নয়, এই আমার ঐকান্তিক কামনা। বলো পারবে তুমি? চাও এই শর্তে আমায় পেতে?'

'নিভা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমিও কি পাগল হলে?'

'না, পাগল হইনি। এতদিন আমি ভুল বুঝেছিলুম। আজ আমার চোখ খুলেছে। আজ বুঝেছি দারিদ্র্য অপরাধ।'

'তার মানে?'

নিভা উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে চলল, 'আজ বুঝেছি আমার টাকা চাই, ক্ষমতা চাই। আমি জানি আমার রূপ আছে, জানি তার দাম আছে, জানি এই রূপের বিনিময়ে পাব ঐশ্বর্য, পাব লুব্ধ স্তাবকের দল, পাব বেহায়া সমাজকে জীর্ণ করার, ধ্বংস করার শক্তি।'

'নিভা, তুমি এসব কি বলছ?' অবিশ্বাসের সঙ্গে চঞ্চল বলল।

'তোমার মত কত বড়লোকের ছেলে আসবে আমার কাছে। বিলিয়ে দেবে তাদের ঐশ্বর্য আমার পায়ে। আমি বাধা দেব না, দু'হাত দিয়ে লুটে নেব। যেদিন তারা রিক্ত হবে, সেদিন তাদের দেব দূর করে তাড়িয়ে, কত গর্বিত মাথা ধুলোয় লুটোবে, কত ধনীর ঘর যাবে ধুলিসাৎ হয়ে।'

চঞ্চল সভয়ে বলল, 'নিভা, তোমার এই নিষ্ঠুর রূপ আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

নিভা দৃঢ়স্বরে বলল, 'ভেবেছ আঘাত শুধু তোমরাই দিতে জানো, আমি জানি না?' এ রূপ যদি তোমার পছন্দ না হয়, পছন্দ করার মতো ধনীর অভাব হবে না। হরিচরণ মারফৎ মুক্তহস্ত লোকের সন্ধান আমি করে নেবই।'

'নিভা, কত টাকা চাই তোমার? কত হীরে জহরৎ চাই? আমি যেখান থেকে যেমন করে পারি এনে দেব। বিনিময়ে শুধু তোমায় চাই। চল, তুমি আমার সঙ্গে।'

হঠাৎ ঘরের বাইরে পদশব্দ হতে চঞ্চল চমকে উঠল, 'সাবধানে বলল, 'কে আবার আসে? পুলিস নাকি? আমি লুকই।'

চঞ্চল ত্রস্তপদে পাশের ঘরে লুকিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি দরজা ভেজিয়ে দিল।

বাইরে থেকে ঘরে ঢুকল বিনয়। ক্লান্ত, অবসন্ন তার চেহারা। তার মনের স্ফূর্তি যেন লোপ পেয়েছিল।

তাকে দেখেই নিভা তিক্তস্বরে বলল, 'আপনি, কি চাই আপনার এখানে?'

'কিছু না। শুধু একটা খবর দিতে এলুম। আমি এবাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাব তার ঠিক নেই। হয়ত কোন মেসে উঠব।'

'আপনি থাকবেন কি যাবেন, তা জেনে আমার কোন লাভ নেই। এমন নাটকীয়ভাবে না জানালেও চলত।' নিভা ঝাঁঝাল সুরে বলল।

'না, আমি বলছিলুম, আমার ঘরটা পড়ে থাকবে। নন্দবাবুর কাছে দু'মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে গেছি, আপনি ঐ ঘরেই থাকতে পারবেন।'

নিভা ব্যঙ্গ করে বলল, 'আপনার অসীম দয়া! কিন্তু আমি আপনার দয়ার ভিখারী নই। কিসের জন্য আপনি আমায় দয়া দেখাতে এসেছেন?'

'না, না, দয়া নয়।' বিনয় লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনার টাকা, মানে যে বই লিখতে আপনি অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, তার কপিরাইট বেচে এই টাকা পেয়েছি। প্রকাশক বলেছেনে মাসে মাসে কিছু করে দেবেন, তাতে আপনার একার খরচের কিছুটা সুরাহা হবে।'

আপনার এই ভিক্ষের মাসোহারা না পেলেও আমার চলে যাবে, আর ভালভাবেই চলবে।'

'টাকা অতি সামান্য, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এইটুকুই আমার সামর্থ্য।'

আশ্চর্য লোকটি! নিভা মনে মনে ভাবল, নিজের সামান্য সামর্থ্য দিয়ে অল্প দিনের জন্যে হলেও একটা নিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছে। অথচ নিজে কোন দাবি রাখছে না তার ওপর, তার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে নিভার কোন দুর্নাম না হয়। বিনয়কে জড়িয়ে লোকে কুৎসা প্রচার করার সুযোগ না পায়। কি মতলব লোকটির? এ ত স্বার্থপরতার লক্ষণ নয়, আত্মবিলাসের লক্ষণও নয়।

একটু নরম হয়ে নিভা বলল, 'দয়া করে আপনার কথা সংক্ষেপ করলে বাধিত হব।'

'রাগ করছেন?' বিনয় অবসাদের সঙ্গে বলল, 'তা হয়ত করতে পারেন। হয়ত আমিই আপনার কাছে অপরাধ করেছি। ক্ষমা করুন আর নাই করুন, আজ একটা মনের কথা শুধু আপনাকে জানাব।'

'আপনার অবান্তর কথার মারপ্যাঁচ শোনার বেশী অবসর আমার নেই। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।'

বিনয় গভীর কণ্ঠে বলল, 'আমার চোখে আপনি আদর্শ নারী, দৃঢ় হয়েও আপনি কোমল মধুর, বিপদে আপনি সাহসী অবিচল। গঙ্গার বুকে হয়ত ক্ষণিকের উত্তাল তরঙ্গ, কিন্তু তলায় গভীর প্রশান্ত স্রোতের ধারা।'

নিভা বিব্রত হল। লোকটি ত তাকে ঠিক চেনেনি। ভুল করছে লোকটি। তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

'না, না, আপনি আমায় ভুল চিনেছেন,' নিভা ব্যগ্র হয়ে বলল, 'আমি বাঁধ ভাঙ্গতে পারি। ঘর বাড়ি ভাসিয়ে দিয়ে ধ্বংস করতে পারি।'

'সে ধ্বংস শুধু নিছক ধ্বংসের আনন্দে নয় সৃষ্টির আশায়,' বিনয় স্বপ্নালু দৃষ্টিতে নিভার দিকে চেয়ে বলল, 'নদীর তীরে তীরে যে পলিমাটি পড়ে তাতে দেখা দেয় নবজীবনের অঙ্কুর। আমার বিশ্বাস আপনার দেওয়া আঘাতও সেই রকম।'

উঃ। এই অবুঝ লোকটিকে বোঝান যায় কি করে? নিভা মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। লোকটি কি তার বিবেকের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত করছে? না, কিছুতেই শুনবে না এই স্বর।

নিভা প্রতিবাদ করে বলল, 'না, না, ও আপনার মিথ্যা কল্পনা। আপনি যা ভেবেছেন আমি তা নই। আমি ধ্বংস করতে চাই, প্রতিশোধ নিতে চাই।'

বিনয় প্রগাঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'সে আপানার স্বভাব নয়।'

নিভা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'আপনি বিশ্বাস করবেন যদি বলি আমি রূপের বেসাতি করতে যাচ্ছি?'

'আমি জানি সে আপনি পারবেন না।'

কি জ্বালা এই লোকটিকে নিয়ে! এর সঙ্গে কথায় পারা যাবে না। তবে কি প্রমাণ দিতে হবে? নিভা বলল, 'পারব, পারব, নিশ্চয় পারব। আপনাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেব।'

নিভা দ্রুতপদে ছুটে গিয়ে পাশের ঘরের দরজা খুলল। বিনয় আবছায়া অন্ধকারে দেখতে পেল একটি পাঞ্জাবী আত্মগোপনের চেষ্টা করছে। নিভা হাত ধরে তাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। তারপর বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল, 'এই দেখুন, এবার বিশ্বাস হয়েছে? চিনতে পারছেন একে?

বিনয় আপাদমস্তক দেখে চঞ্চলকে চিনতে পারল। ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'ও, এ ত মিস্টার চঞ্চল রায়। কিন্তু এ বেশে এখানে কেন?'

নিভা বলল, 'পুলিসের হাত এড়াতে ছদ্মবেশে এসেছে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করতে। আমি একে দিয়েই আমার যৌবনের ব্যবসা শুরু করব। এবার বিশ্বাস হল ত?'

এক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বিনয় বলল, 'না আমি বিশ্বাস করি না, নিশ্চয় জানি এটা একটা অভিনয়। ঐ কামার্ত পশুটাকে আপনি কি করে শায়েস্তা করেছিলেন, সে কথা আমার শোনা আছে।'

এবার চঞ্চল গর্জে উঠল, 'গেট আউট্!'

বিনয় বিচলিত না হয়ে বলল, 'আজ বুঝি আপনি আমার উপর বদলা নিলেন? সেদিন নিভাদেবীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার জন্যে আপনি আমার ঘরে এসেছিলেন, সেদিন আমি আপনাকে বিশ্বাস করিনি, বলেছিলুম গেট্ আউট্। আপনাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলুম।'

'গেট্ আউট্!' চঞ্চল ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মত এগিয়ে গেল বিনয়ের দিকে, চিৎকার করে বলল, 'অর্ আই'ল স্ম্যাশ্ ইওর্ হেড্।'

নিভা ছুটে গেল, দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'দাঁড়াও, চঞ্চলদা।'

'দাঁড়াব কি, নিভা?' চঞ্চল দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে বলল, 'স্কাউন্ড্রেলটা তোমার সামনে আমায় অপমান করছে আর তুমি তা সহ্য করছ? শালার নিজের পেট চলে না, আবার তোমায় মাসোহারা দেবার ধৃষ্টতা, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! লোকটাকে তুমি মোটেই পাত্তা দিলে না দেখে আমার যা আনন্দ হল।'

নিভা অতিকষ্টে নিজের কান্না চেপে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চঞ্চল তার এই ভাবান্তর দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি? তোমার কি হল?'

'কিছু না', বলে নিভা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। চোখে আঁচল দিয়ে সে কান্না চাপতে চাইল। কিন্তু সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

বিনয় পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। তার মনেও ভাবের তাণ্ডব চলছিল। কিন্তু কি করবে সে ভেবে পাচ্ছিল না।

চঞ্চল নিভার কাঁধ ধরে দরদী হয়ে বলল, 'তোমার চোখে জল। তুমি কাঁদছ! না—না নিভা চোখ মোছ। তোমার অশ্রু আমাদের যাত্রাপথকে পিচ্ছিল করে তুলবে।'

রোদনভরা কণ্ঠে নিভা বলল, 'চঞ্চলদা, আমি পারব না, তোমার সঙ্গে যেতে পারব না।'

'তার মানে?' চঞ্চল অবাক হয়ে বলল।

'আমায় ক্ষমা কর চঞ্চলদা।' নিভা ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, 'আমি মরে গেলেও

তোমার সঙ্গে যেতে পারব না।'

'কেন, তুমি ত একটু আগেই বললে?' চঞ্চল সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করল। নিভা নিরুত্তর। চঞ্চল হতাশ হয়ে বলল, 'বুঝেছি তুমি ভালবাস, ঐ ছন্নছাড়া লোকটাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাস।'

নিভা কান্না চেপে অস্ফুটস্বরে বলল, 'হ্যাঁ, এই আমার যন্ত্রণা। ওকে আমি আমার যথাসর্বস্ব দিতে চাই, কিন্তু ও ত আমায় চায় না।'

বিনয় আর স্থির থাকতে পারল না। তার অসার যুক্তি ভেসে গেল। প্রেমের আবেগ তাকে উতলা করে তুলল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'আমিও তোমায় চাই নিভা। আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। বুদ্ধি র অহংকারে আমি তোমার জীবনটাকে ধ্বংস করতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু এখন বুঝেছি আমি ঠিক করিনি। নিভা, এই ছন্নছাড়া লোকটাকে সত্যিই তুমি বিয়ে করবে?'

নিভা বিনয়ের পাশে এসে দাঁড়াল, গভীর আবেগের সঙ্গে বলল, 'আমিই ত বিয়ের কথা তুললুম।

'তবে তাই হোক।' বিনয় বলল।

'অনুষ্ঠান পরে হবে।' নিভা বলল, 'আমার মায়ের সিঁদুর কৌটায় এখনও সিঁদুর আছে। তুমি আমার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দাও। মার হাতের নোয়া আমি খুলে রেখেছিলুম, সেটাও পরাও।'

নিভা দ্রুত সিঁদুর কৌটো আর নোয়া আনল। বিনয় গভীর প্রেমের সঙ্গে নিভার সিঁথিতে সিঁদুর পরাল, হাতে নোয়া পরিয়ে দিল।

বাইরে কোলাহল মুখর হয়ে উঠল। কাছেই কোথাও অগ্নিসংযোগ হয়েছিল। আগুনের লাল আলো মাঝে মাঝে ঘর রাঙিয়ে দিচ্ছিল। দু'একটা বোমার আওয়াজ, তারপর অনেক গুলির শব্দ শোনা গেল।

নিভা বলল, 'কোথাও আগুন লেগেছে দেখ, দেখ। ঐ অগ্নিসাক্ষী করেই আজ আমাদের মিলন, ঐ কোলাহলই উৎসবের উল্লাস।'

নিভা আর বিনয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আগুন দেখতে লাগল। মাঝে মাঝে তাদের মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল। ওরা চঞ্চলের অস্তিত্বও যেন ভুলে গেল। চঞ্চল এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো ওদের এই অভূতপূর্ব বিবাহ-অনুষ্ঠান নীরবে লক্ষ্য করছিল। পরাজিতের গ্লানি তার মুখে। সে লঘু পদক্ষেপে বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেল, নিভা আর বিনয় তার দিকে লক্ষ্যও করল না। কিন্তু চঞ্চল যেতে পারল না। তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল তার স্ত্রী লিলি। তার কোমরে কাপড় জড়ান। মুখ শ্রান্ত, কিন্তু নতুন এক অনির্বচনীয় ভাবে উজ্জ্বল।

চঞ্চলকে দেখে লিলি বলল, 'এ কি? তুমি এখানে? এ বেশে?'

চঞ্চল নিরুত্তর। লিলি বলল, 'আমার কাছে তোমার আর কোন ভয় নেই। আমি তোমায় ধরিয়ে দিতে আসিনি। তোমার বিরুদ্ধে আমার আর কোন অভিযোগ নেই। আমি জীবনের অন্য অবলম্বন খুঁজে পেয়েছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

চঞ্চল জিজ্ঞাসা করল, 'বাইরে হাঙ্গমা। গুলি চলছে, বোমা ফাটছে, তুমি এখানে কেন এসেছ? কি চাই তোমার?'

'রামুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গলির মধ্যে দিয়ে এলুম। রামু বাইরে আছে।' লিলি বলল, 'তোমার কাছে কিছু চাইবার নাই আজ। আমি ভিক্ষে চাইতে এসেছি নিভার কাছে।'

নিভা বলল, 'আমার কি দেবার আছে? আমি ত নিঃস্ব।'

'না, তুমি নিঃস্ব নও ভাই', লিলি বলল, 'তোমার আছে স্নেহ, আছে প্রেম, আছে মাতৃত্বের বাৎসল্য, আমি আজ তাই ভিক্ষে চাই, ভাই।'

চঞ্চল বলল, 'বুঝেছি, সেই ভিখিরির ছেলেটাই তোমার মাথা খেয়েছে। তার সন্ধান পেলে?'

লিলি বলল, 'না, পেলুম না। সারা শহর তোলপাড় করেও তার সন্ধান মিলল না। কিন্তু এক মনুকে খুঁজতে গিয়ে চোখে পড়ল হাজার হাজার শিশু—শীর্ণ, ক্ষুধিত, মৃতপ্রায়। একটা দুটো করে বাড়ি আনলুম। বাড়ি ভরে উঠল। অন্নপথ্য কিছুরই বাকি রাখলুম না। অর্থে যদি কুলোয় ত সামর্থ্যে কুলোয় না। তাই এই বিপদ মাথায় করেও ছুটে এলুম নিভা তোমার সাহায্য ভিক্ষা করতে। একটুখানি সেবা, একটুখানি যত্ন পেলে তারা বেঁচে যায়। নিভা দেবে তাদের সেই সেবা, সেই যত্ন?'

'কিন্তু এতবড় কাজ আমি কি পারব?' নিভা দ্বিধার সঙ্গে প্রশ্ন করল।

'পারবে', লিলি বলল, 'তুমিই পারবে। বিনয়বাবু তোমার পাশে দাঁড়াবেন। এই মহান যজ্ঞে তোমরাই হবে হোতা।'

নিভা বিনয়ের মুখের দিকে চাইল। বিনয়ের মৌন সম্মতি স্পষ্ট হল। নিভা বলল, 'লিলি, আমাদের তুমি সঙ্গী করে নাও ভাই। আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে যদি একটি শিশুরও প্রাণ রক্ষা করতে পারি, একটি বালকের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, একটি কিশোরকে মানুষ করতে পারি আমাদের জীবন হবে সার্থক।'

বাইরে মাঝে মাঝে কোলাহল দূর থেকে ভেসে আসছিল। দু'একটা গুলির আওয়াজও কানে আসতে লাগল।

চঞ্চল ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বলল, 'তাহলে দেখছি বাড়িতে একটা অনাথ আশ্রম খুলে বসলে, কাচ্চাবাচ্চা গিজগিজ করবে—।'

'এঁকে ব্যঙ্গ করবেন না, মিস্টার রায়,' বিনয় বাধা দিয়ে বলল, 'মিসেস রায় ভাল কাজই করছেন। আমরা তাকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হব। আপনিও এই শুভ কাজকে আশীর্বাদ করুন। এই অনাথদের মানুষ করার দায়িত্ব ইনি নিয়েছেন। আমরা সবাই ধন্য হব যদি এদের মধ্যে একজনও বড় হয়ে সমাজকে এমনি ভাবে বদলে দেয়, যাতে বুভুক্ষু পায় অন্ন, গৃহহীন পায় গৃহ, প্রেমিক পায় প্রেমিকাকে।'

চঞ্চল মুহূর্তকাল কি ভাবল। তারপর সে একটা সংকল্প করে দৃঢ় পদক্ষেপে দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

লিলি ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'বাইরে গোলমাল, পুলিস। গুলি চলছে। এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

চঞ্চল গম্ভীর স্বরে বলল, 'থানায়। ধরা দিতে। তোমাদের কাছে আমি আজ হার মানছি।'

স্মর-গরল-খণ্ডনম্

একটা অতিকায় অজগর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল, তার চাপে হাড় পাঁজরা যেন চুরমার হয়ে যাবে। হিস্-হিস্ করে আওয়াজ কানে আসছিল। গরম নিঃশ্বাস ত্বকে আগুন জ্বালছিল। সোমদেব প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছিল না, তার সমস্ত মাংসপেশী যেন অবশ হয়ে আসছিল। সোমদেব ত্রাহি ত্রাহি রবে চিৎকার করতে গেল। কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, গলায় চাপ পড়ে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সোমদেব এবার শেষবারের মতো আপ্রাণ শক্তি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। সে কি পারবে নিজেকে মুক্ত করতে? হঠাৎ অজগরের মুখটা বদলে গিয়ে হল দেবীজীর মুখ। সেই গভীর চাহনি। মধুর স্মিত হাসি। কামনার নিবিড় ব্যঞ্জনা। সোমদেবের দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। তার ঘুম ভাঙল। আশ্চর্য! সবটাই তবে স্বপ্নের বিভীষিকা?

সোমদেব বুঝতে চেষ্টা করল। তবু ভাল, সে স্বপ্ন দেখছিল। তার স্বপ্নজড়িমায় বাস্তব ও কল্পনা মিশে কিম্ভুত রূপ ধারণ করেছিল। সত্যি তার দেহ বেষ্টন করেছিল—না, অজগর নয়—দেবীজীর দুই বাহু। সুডৌল নগ্ন বাহু দিয়ে দেবীজী সুপ্তির মধ্যে সোমদেবের দেহ সবলে আলিঙ্গন করেছিল, তুঙ্গ স্তনের চাপে সোমের পিঠ ঘেমে উঠেছিল। দেবীজীর নিঃশ্বাস কাঁধের উপর এসে পড়ছিল। ঘুমন্ত দেবীজীর মৃদু নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। আশ্চর্য, এই প্রসুপ্ত প্রেমিকাকে সোমদেব স্বপ্নঘোরে ভাবল অজগর! অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে! কবে ছোটবেলায় সুর করে পড়েছিল সোমদেব। জীবনে সে কখনও অজগর দেখে নি। তবু তার দুঃস্বপ্নে অজগরকে কল্পনা করে সে যেন কেঁপে উঠছিল।

আ-য়ে আমটি খাব পেড়ে। এখন কোথায় আম? চোখের সামনে দেবীজীর ডালিম-রংয়ের অধর। সোমদেব নিদ্রিত দেবীর অধরে সপ্রেম চুম্বন এঁকে দিল। তবু ঘুম ভাঙ্গল না প্রেমাস্পদার। সে পাশ ফিরে শুল।

কিছুক্ষণ আর ঘুম এল না সোমদেবের। পাশে শায়িত দেবীজীর যৌবনপুষ্ট আঁটসাঁট দেহরেখা চোখে পড়ল। সে পিছন ফিরে শুয়েছিল। রাত্রির আবছা অন্ধকারেও তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সোমদেব বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পাশের টেবিলে চাপা দেওয়া ছিল দু'গ্লাস জল। সে ঢক্ ঢক্ করে এক গ্লাস প্রায় শেষ করল।

সোমদেব দেখল দেবীর দিকে। কি গভীর তৃপ্তির সঙ্গে সে ঘুমিয়ে আছে। পরম নির্ভরতা তার শোবার ভঙ্গীতে।

এই—! সোমদেব মৃদুস্বরে ডাকল।

উঁ?

তুমি ঘুমোচ্ছ?

হুঁ।

ফেরো না আমার দিকে।

দেবী ফিরল না। পাশ ফিরে সে ঘুমিয়েই রইল।

সোমদেব আবার তার পাশে শুয়ে পড়ে প্রেমিকার কোমল অঙ্গ আলিঙ্গন করল। একটা পরম পরিতৃপ্তির প্রবাহ সোমদেবের শিরায় শিরায় ছুটে গেল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল কে এই অপরিচিতা রমণী যে অল্পদিনের মধ্যে নিজেকে সোমদেবের কাছে উৎসর্গ করেছিল। যে নিষ্পাপ কুমারীদেহ একদিন দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল, তা এখন সোমদেবের বাহুবেষ্টনে বদ্ধ। পরিজনদের প্রণমা দেবীজী সোমদেবের সখী, দয়িতা, প্রেমিকা। আর সোমদেবও তার সমস্ত আত্মীয়দের ভুলে এই অপরিচিতাকে পরমাত্মীয়া করে তুলেছিল। সন্ন্যাসিনী দেবীজী সংসার ত্যাগ করলেও সোমদেবের প্রেমের পিঞ্জরে ধরা পড়েছিল।

দেবীজীর কেশের মৃদু সুবাস সোমদেবের মিষ্টি লাগছিল। সোমদেবের চুম্বন নেমে এল দেবীজীর নিটোল স্কন্ধের উপর।

দেবীজী পাশ ফিরল। দুজনে পরস্পরকে গভীর আলিঙ্গনে বেঁধে রাখল। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সোমদেব।

* * * *

এক সপ্তাহের ছুটি কাটাতে কাশীতে এসে সোমদেব একটা জীবন কাশীবাসী হবার উপক্রম করল, সেও এই দেবীজীর আকর্ষণে। কাশীর অসংখ্য মঠ-মন্দিরের মধ্যে মীরঘাটের কাছে কৌশিকী মঠের নামও শোনেনি সোমদেব। খুব কম লোকই সেই মঠের কথা জানে। গঙ্গার ধারে ঘাটের অগণিত সিঁড়ির পাশে ছোট্ট এই মঠটি শুধু অল্প কিছু ভক্তের কাছে পরিচিত ছিল। ঘাটে যাবার পথের পাশে বড় একটি ফটক বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায় লুকিয়ে থাকত। ফটক দিয়ে ঢুকলেই ছোট এক উঠান। তার পরেই ততোধিক ছোট কৌশিকী মন্দির। কিন্তু সেখানে নিয়মিত পূজাপাঠ হ'ত। পূজারী শাস্ত্রমতে দেবীমূর্তির চরণে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করত। কাঁসর-ঘণ্টা বাজত, আরতি হ'ত, চণ্ডীপাঠ হ'ত। বেলেপাথরে মোড়া প্রাচীন মঠ-ভবন ছিমছাম, পরিষ্কার; মঠ-নিবাসিনী কতিপয় নারীর করস্পর্শে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন। সেই মঠের পরিচালনা করে কোনও পুরুষ নয়, নারী। সবাই তাকে বলে দেবীজী। তার আসল নাম কি, কেউ জানে না। সোমদেব জানতে চেষ্টা করেছিল, প্রথমটায় পারে নি। দেবীজীকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল। দেবীজী

বলে আমি সন্ন্যাসিনী। এই আমার পরিচয়। কি হবে আমার ফেলে আসা নামে, যা পুরাতন জীবনের স্মৃতি বহন করে আনবে? সন্ন্যাস নিয়ে আমি পেয়েছি নতুন জীবন। আর তুমি দিয়েছ নতুনতর জীবনের আস্বাদ, সোম।

কিন্তু সোমদেব জানতে পেরেছিল দেবীজীর আসল নাম। উর্মিলা, উর্মিলা দেবী শ্রীবাস্তব। উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুরে ছিল উর্মিলার পূর্বপুরুষের নিবাস। উর্ধ্বতন একপুরুষ শেঠ কাশীপ্রসাদ শ্রীবাস্তবজী কৌশিকী মঠের প্রতিষ্ঠাতা। হীরা জহরতের ব্যবসায়ে কাশীপ্রসাদ বহু অর্থ সঞ্চয় করে গঙ্গা তীরে জরাজীর্ণ ভবন ক্রয় করে সংস্কার করে নিজ মাতার ইচ্ছায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কৌশিকী দেবীর মূর্তি স্থাপন করে। মঠের অর্থ বিধবাশ্রম। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কাশীপ্রসাদ চৌকের একটি ভবন দান করে মঠ-পরিচালিকার হাতে। সেই ভবনে অনেক দোকান। মোটা ভাড়া পাওয়া যায় মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্যে। ভাড়া আদায়ের এক মামলার তদ্বির করতে গিয়ে সোমদেব আর্জি থেকে দেবীজীর নাম জানতে পারে।

সে একদিন অবাক করে দেয় দেবীজীকে নাম ধরে ডেকে।

উর্মিলা!

চমকে ওঠে দেবীজী। ও নাম তুমি কি করে জানলে সোম?

তুমি না বললেও জেনেছি। উকিলবাবুকে তোমার নাম জানাতে তুমি বাধ্য। তার কাছ থেকে তোমার নাম জানা আর শক্ত কি?

ও নামে তুমি আমায় ডেকো না।

না, তোমায় ডাকব উর্মি বলে, জানো উর্মি মানে কি?

কি?

সাগরের ঢেউ, তুমি আমার জীবনে ঢেউ তুলেছ। ডাকব তোমায় উর্মি বলে?

বেশ ডেকো। তবে অন্য পাঁচজনের সামনে নয়।

অন্য পাঁচজনের সামনে তুমি দেবীজী, কিন্তু আমার কাছে একান্তভাবে তুমি উর্মি, সাগর জলের উর্মি।

তুমি এত মিষ্টি করে কথা বলতে শিখলে কোথায় সোম?

সোমদেব বলল, কবির দেশে আমার জন্ম উর্মি, আমার নিবাস বঙ্গভূমে, জয়দেব, চণ্ডীদাস, রবি ঠাকুরের জন্মভূমিতে। মিষ্টি কথায় আমাদের জন্মগত অধিকার উর্মি, উর্মিলা, উর্মিমালা।

দেবীজী নিবিড় হয়ে বলে, আবার বল, আবার বল সোম, তোমার মুখে আমার ফেলে আসা নাম শুনতে ভারি ভাল লাগছে। ও নামে কেউ আমায় ডাকবার নেই।

উর্মি, উর্মিলা, উর্মিমালা, সোমদেবের গুঞ্জন যেন দেবীজীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করে।

সোমদেব দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে ছুটি কাটাতে এসেছিল। ভেবেছিল তারা কোন হোটেলে, লজে, নিদেন ধর্মশালায় ব্যবস্থা করে নেবে, তাই বাসস্থানের অগ্রিম আয়োজন করা হয়নি। সেবার কাশীতে প্রচুর যাত্রীর ভিড়। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। যদিও বা কোথাও ঠাঁই মেলে তো খাঁই অনেক বেশী, ভাড়া গোঁজবার মোটা ব্যবস্থা বন্ধুদলের বাজেটের বাইরে। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে আস্তানার সন্ধানে এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে যাত্রীরা শ্রান্ত হয়ে পড়ল। কুলীরাও হল বিরক্ত। প্রথমে তাদের বিরক্তি, কথা-কাটাকাটি থেকে কলহ। গলির মধ্যে মাল নামিয়ে ফেলে কুলিরা মজুরী দাবী করল। যাত্রীরা ধমক দিল। শুরু হল বচসা, একজন কুলি তেরিয়া হয়ে ফস করে বলে ফেলল, শালে বাঙ্গালিয়া, পয়সা দে।

আর যায় কোথায়? চিৎকার, গালিগালাজ, প্রায় খুনোখুনির উপক্রম। গলির মধ্যে ভিড় জমে গেল। আশপাশের বাড়ি থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মজা দেখতে লাগল। জনতার মধ্যে দুটি দল হল, তারা দু'পক্ষ গ্রহণ করল। প্রায় প্রাদেশিক দাঙ্গার উপক্রম।

এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল এক বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী লোক। তার ধমকে কুলিবাহিনী চুপ করল। একজন বুঝি ফোড়ন কাটতে গিয়েছিল, কিন্তু আগন্তুকের সবল হাতের প্যাঁচে কাবু হয়ে মুখ বুজে ফেলল। আগন্তুক সব শুনে বলল, বাবুজী, আপনারা বদমাশগুলোর পয়সা ফেলে দিন। আপনাদের থাকার কোই ভাওনা নেহি। দেবীজী ঝরোকা থেকে আপনাদের তকলিফের কথা জানতে পেরেছেন। হামাকে তাই পাঠালেন। যদি আপনাদের ওজর না থাকে আপনারা ক'দিন কৌশিকী মঠে থাকতে পারেন সেবায়েত দেবীজীর মেহমান হয়ে।

সোমদেব বলল, ওজর হবে কেন? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরছিলুম, আপনার দেবীজী আশ্রয় দিলেন। চলুন, কোথায় আপনাদের মঠ।

এই তো সামনেই। বলল পালোয়ান লোকটি।

সোমদেব সেই প্রথম কৌশিকী মঠ দেখল। দ্বিতলে একটি ঝোলা বারান্দা, তারের জাল দিয়ে আঁটা বাঁদরের উৎপাত এড়াবার জন্যে। সোমদেব সেদিকে চেয়ে দেখল। কিন্তু শূন্য বারান্দা, দেবী-দর্শনের আশা পূর্ণ হল না। দয়াময়ী দেবীজীর প্রতি একটি অব্যক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপেক্ষায় রইল।

আগন্তুক গম্ভীর স্বরে কুলিদের হুকুম করল, সব সামান উঠাও, অন্দর লাও, তব্ পয়সা মিলেগা।

সেই প্রথম সোমদেব মঠের ভিতরে প্রবেশ করল, পরে মঠাধীশার অন্তরেও।

মজুরীর ওপর উপরি বখশিশ পেয়ে কুলিরা শান্ত হয়ে চলে গেল। উঠানের পাশে

একটি ঘরে আগন্তুক সোমদেবদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। ঘরটি ছোট হলেও বেশ খোলামেলা। নিচু তক্তার উপর পুরু গদি পাতা। জানলা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়, এইটাই ঘরটির আশাতীত আকর্ষণ।

বাবুজী হামার নাম মিশির, লল্লন মিশির—লল্লন পহলবান্ বলেই আমায় সবাই জানে। আমি মঠের দেখভাল করি। হামার কামরা সামনেই। যখন জরুরৎ হবে, বোলবেন। এখন গোসল সারুন। খানার এন্তাজাম—?

তার দরকার নেই, সোমদেব বলল, দেবীজী দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন, এই যথেষ্ট। আমরা স্নান সেরে হোটেলে খেয়ে নেব। তারপর খুঁজে-পেতে একটা আস্তানা যোগাড় করেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

ছি, ছি, কি বোলেন বাবুজী? লল্লন বলল, দেবীজী দুঃখ পাবেন, হামার উপর নারাজ হবেন। এ কামরা তো পড়েই আছে। আপনারা যতদিন খুশি থাকুন।

সঙ্গী সুধীর বলল, আমরা থাকব বলেই তো এলুম মিশিরজী, সোমদেব যাই বলুক না, পয়সা দিলেও এমন গঙ্গার ওপর ঘর আমরা কোথায় পাব?

হরেন বলল, এখানে বুঝি পয়সা লাগবে না?

লল্লন বলল, নেহি নেহি বাবুজি, আপলোগ্ দেবীজীকে মেহমান্।

ছুটি ফুরোবার মুখে সুধীর হরেন ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু সোমদেব ছুটি কাটিয়েও রয়ে গেল, দেবীজী তাকে কিছুতেই যেতে দিল না। সুধীর হরেনের পিছুটান ছিল, শুধু চাকুরীর মায়া নয়, পুত্রকলত্রের বিরহও বটে। সোমদেব চাকরীর পরোয়া না করে রয়ে গেল, স্ত্রী-পুত্রের আকর্ষণ তার নেই। সে অবিবাহিত। সে জানে কিছু দিন চাকুরীতে ফিরে না গেলেও চট করে চাকুরী যাবে না। লীভ্ উইদাউট্ পে পাওনা ছুটির অন্তে আদায় করে নেওয়া যাবে ইউনিয়নের পাণ্ডাদের সুপারিশে। পরিজনদের দাবী সোমদেবের কাছে অতটা জোরালো নয়। কিছুদিন বিদেশে থাকলে বাপ-মাও তেমন চিন্তা করবেন না।

* * * *

কৌশিকী মঠ খুব ভাল লাগল সদল সোমদেবের। পূজাপাঠ, আরতি, কাঁসর-ঘণ্টা, চণ্ডীপাঠ, ভজন, সমস্ত মিলিয়ে মধুর পরিবেশ। তার উপর জানালা খুললেই গঙ্গা। কাশীবাসের এটা মস্তবড় আকর্ষণ। বড় হোটেলে থাকলেও সব সময় এ সুযোগ মেলে না। ভোরে চোখ খুলে বাইরে তাকালেই গঙ্গা-দর্শন। পূব আকাশ লাল হয়ে যায়। কুয়াশার প্রলেপ মুছে ওপারের ধূসর বালুচর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওপার জনহীন। এপার ভক্ত জনতার কলগুঞ্জনে মুখর। ওপারে বক ওড়ে। এপারে কাক-চড়াইয়ের চেঁচামেচি। কৌশিকী মঠও জেগে ওঠে। লল্লন মিশির আখড়ায় ব্যায়াম করে ল্যাংগট পরে, দীর্ঘ কঠিন পেশীবহুল চেহারা, মেদবাহুল্য নেই। যেন মাপজোপ করে বিধাতা তার দেহটা গড়েছেন। লল্লন

অনেক ডন বৈঠক দেয়, দু'হাতে ভারী মুগুর ভাঁজে, তার সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে ধুলো মেখে পাঁয়তারা কষে। তাদের আখড়া কৌশিকী মঠের একটু নিচে গঙ্গা-তীরে। মঠের ঘণ্টা বাজে। প্রাতঃনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। মঠবাসিনী নারীরা পূজার সময় হাজির থাকে। তাদের বিচিত্র বেশভূষা দেখে মনে হয় তারা সবই অবাঙালী। সোমদেব দরজাব ফাঁক দিয়ে দেখে তাদের দিকে, ওদের মধ্যে কে দেবীজী সোমদেব বা তার বন্ধুরা জানে না,

সুধীর বলল, দু'দিন কেটে গেল, দেবীজীর দয়ায় আশ্রয় মিলল, কিন্তু তার দর্শন মিলল না।

হরেন বলল, ঐ মেয়েদের মধ্যে কে দেবীজী বল তো সোমদেব?

একজন মোটাসোটা প্রৌঢ়া মহিলার দিকে ইঙ্গিত করে সোমদেব বলল, বোধহয় ঐ মহিলা। বেশ ভারিক্কী চেহারা, কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে উনিই বোধহয় দেবীজী।

দূর! সুধীর বলল, ওর নাম লখিয়াকি মা।

তুই কি করে জানলি? সোমদেব জিজ্ঞাসা করল।

ওপর থেকে কাল মিষ্টি গলায় কে ডাকল, লখিয়াকি মা, লখিয়াকি মা বলে। ঐ মহিলা সাড়া দিল, হাঁ জী, আ রহী হুঁ। মুরুব্বির মত বলল।

হরেন বলল, সোমদেব, তোর যেমন টেস্ট;ঐ পাছাভারী বুড়ী লখিয়াকি মাকে তুই দেবীজী বানিয়ে দিলি? আমার মনে হয় দেবীজী তন্বী তরুণী। মিষ্টি তাঁর স্বর, ঐ যে লখিয়াকি মা যাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। তিনিই বোধহয় দেবীজী।

সুধীর বলল, তাই হবে, হাঁ জী বলে খাতর করল যখন। কিন্তু যাই বল আমাদের দর্শন দেওয়া উচিত ছিল।

সোমদেব বলল, কেন দেবেন? তিনি তো আর গুরুমা নন যে ভক্তবৃন্দকে অমৃতবাণী শোনাবেন দর্শন দিয়ে।

সুধীর বলল, আচ্ছা সোমদেব, বাজী রাখ্ তো দেবীজী ছুঁড়ি না বুড়ী?

সোমদেব বলল, প্রৌঢ়াও ত হতে পারেন।

এ সমস্যা মেটে কি করে? তার ওপর তিনি রোগা না মোটা,সুন্দরী না বিচ্ছিরি, কুমারী না বিবাহিতা?

না, বিধবা। হরেন বলল, বিধবাশ্রম চালান যখন নিজে বিধবা তো হতে পারেন।

ও সব ঠিকুজীর দরকার কি? তোরা কি তার বিয়ের ঘটকালি করতে চাস? সোমদেব বিদ্রূপ করে বলল। নিখরচায় আছিস, তোফা আরাম করছিস, পূজোপাঠ দেখছিস, ব্যস।

তা বলে মেহমান অর্থাৎ অতিথিদের আপ্যায়ন করবেন না? সুধীর অভিযোগ করল।

বাকিটা কি রইল? সোমদেব ঝাঁঝিয়ে বলল, ঐ তো লল্লন মিশির আমাদের

দেখভাল করছে। সে এমন কি দু'বেলা পাত পাড়বার নিমন্ত্রণ করল।

আমরা কি বিধবা যে তাদের সঙ্গে শাকপাতা আর ভাজি খেয়ে থাকব? সুধীর বলল।

আমরা মিথ্যে ঝগড়া করছি, হরেন প্রস্তাব করল, তার চেয়ে লল্লনকে বল আমরা দেবী দর্শন করে কৃতজ্ঞতা জানাব।

আমার বয়ে গেছে দেবী দর্শন করতে, সোমদেব বলল। কাশীর পথে-ঘাটে অনেক দেবী ঘুরে বেড়ান। কথায় আছে, কাশীর চার বিশেষত্ব—রাঁড়, ষাঁড়, নুড়ি, সিঁড়ি।

আমি বলি কি সোমদেব, তুই গলা ছেড়ে গান ধর। তোর দরাজ কণ্ঠের জন্যে মেয়েমহলে তুই পপুলার। অফিসের দিদিমণিরা পর্যন্ত তোর গুন গুন গান শুনতে কান উঁচিয়ে আছে। শ্যামের বাঁশীর মতো তোর গানের সুর দেবীজীকে অভিসারে টেনে আনবে। সুধীর বলল।

কভী নেহি, পাত্রী-অপাত্রী না দেখে আমি উলুবনে মুক্তো ছড়াতে চাই না। সোমদেব বলল।

তখনকার মত তর্কের অবসান, কিন্তু সমাধান নয়।

সোমদেব অবশ্য গান শোনাল। অজান্তে শ্রোতা লল্লন পহলবানকে। পরের দিন সকালে খুব ভোরে সোমদেবের ঘুম ভাঙল। পাশে হরেন আর সুধীর কমপিটিশন করে নাক ডাকাচ্ছিল। সেদিন ওদের সারনাথ যাবার কথা। সোমদেব প্রাতঃকৃত্য সেরে লল্লনের আখড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তখন আকাশে সবে আলোর রেখা। লল্লন ডন বৈঠক করছিল। সোমদেব আপন মনে গুন গুন করে ভৈঁরো ধরল, ভজলোঁ প্যাঁরে মন মন্দিরমে শিউশংকর কা নাম, শিউশংকর নাম প্যাঁরে পরমেশ্বর কা নাম।

কখন গলাটা বোধহয় একটু চড়েছিল, কানে যেতে লল্লন বৈঠক ছেড়ে গলদঘর্ম হয়ে এগিয়ে এসে বলল, আরে, বাহ্ বাহ্, বাবুজী বড়িয়া গান করেন। কোন্ ওস্তাদের কাছে নাড়া বাঁধলেন?

ওস্তাদ আর কোথায় জুটবে মিশিরজী, সোমদেব বলল, করি চাকুরী, অফিসে হিসেব মিলাতে গিয়ে যখন মনটা বেহিসাবী হয়ে যায়, তখন গান গেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠি। আপনি যেমন মুগুর ভাঁজেন, আমিও তেমনি সুর ভাঁজি।

বহুত খুব, লল্লন বলল। আমি আজই দেবীজীকে খবর পৌছে দেব। তিনি নিশ্চয় আপনাকে মন্দিরে ভজন গাইতে বলবেন।

সর্বনাশ! সোমদেব বাধা দিল। অমন কাজটি করবেন না, সবার সামনে আমি বেইজ্জত হব?

আপনি মজাক্ করছেন বাবুজী, লল্লন বলল। হামি অনেক ওস্তাদের গান শুনেছে, আপনার মত মিষ্টি গলা খুব কম ওস্তাদের আছে। দেবীজী শুনলে খুশী হবেন।

এবার সোমদেব সাহস করে বলল, কিন্তু ক'দিন আছি, আপনার দেবীজীর দর্শন মিলল না। তিনি পর্দানশীন নাকি?

নেহি নেহি, লল্লন বলল, তিনি খুব ভাল মেয়ে, কাজের মেয়ে, পাঁচজনের সামনে হল্লাগুল্লা করতে ভালবাসেন না। অথচ সবদিকে নজর। আমি ওকে বচ্‌পনসে জানি। হামার বড় দুঃখ বাবুজী, বহ্ বিয়েসাদি করল না, সন্ন্যাস নিল এই জোয়ান বয়সে।

কেন, দুঃখতাপ পেয়েছেন?

সে কথা থাক বাবুজী, লল্লন বলল, আপনি কুস্তি লড়তে পারেন?

লল্লন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল।

মাপ কর। সোমদেব বলে উঠল।

আসুন পাঞ্জা লড়ি। লল্লন খপ করে নিজের বলিষ্ঠ হাতে সাঁড়াশির মত সোমদেবের আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরল। সোমদেব কষ্ট সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পাঞ্জা লড়ল। কিন্তু লল্লনের কসরতি প্যাঁচের কাছে পারবে কেন? লল্লন জিতেও সোমদেবের তারিফ করল, বাবুজী, আপনার হাতের জোর আছে, কব্জি বেশ মজবুত।

ওদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠল। স্নানার্থীদের যাতায়াত তো চলছিলই। এ ঘাটটা ছোট, ভিড়ও কম। হঠাৎ সোমদেবের চোখ পড়ল লখিয়াকি মা-র দিকে। সে স্নান সেরে ভিজে কাপড় পাকিয়ে হাতে নিয়ে থপ থপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল। তার পিছনে সদ্যস্নাতা এক যুবতী। পরনের রক্তাম্বর ভোরের আলোয় আরো রঙীন দেখাচ্ছিল। সারা দেহে উথলে ওঠা যৌবন, স্নিগ্ধ রঙ, আলুলায়িত কুঞ্চিত কুন্তল, মুখের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছিল, আয়ত দুটি চোখের গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এক কথায়, তাকে দেখলে সহজে চোখ ফেরানো যায় না, সোমদেবও শালীনতার কথা ভুলে নিষ্পলক নেত্রে স্নানস্নিগ্ধা যুবতীর দিকে তাকিয়ে রইল। যুবতীর দৃষ্টিও সংলগ্ন হয়ে থাকল সোমদেবের চোখের উপর। যুবতীর চাহনিতে কি একটা মাদকতা ছিল, যা সোমদেবকে নিমেষে মুগ্ধ করে তুলল। শোনা যায়, হরিণ যেমন অজগরের চাহনিতে চলচ্ছক্তিরহিত হয়, তেমনি।

কোন কথা না বলে তরুণী সামনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল।

সোমদেব সম্বিত ফিরে পেল লল্লনের কথায়। লল্লন ফিসফিস করে বলল, বাবুজী, ওহি দেবীজী।

লল্লন তার কথা রেখেছিল। সেই দিনই দেবীজীর কানে সোমদেবের গুণের কথা তুলে দিতেই সন্ধ্যায় মন্দির-চত্বরে ভজন গাইবার অনুরোধ এল। সোমদেব একটি শর্তে রাজী হল দেবীজী স্বয়ং আসরে বসে গান শুনবে। লল্লন খবর দিল, দেবীজী খুশী মনে

রাজী হয়েছেন।

সোমদেব দেবীজীকে গান শোনাবার বাসনায় মশগুল হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সারনাথ গেল না। ঘাটে বসে বসে সে কি কি গাইবে তা গুন গুন করে ভেঁজে নিল, যেন দেবীজীকে সন্তুষ্ট করাই তার কাজ। অনেকক্ষণ একা একা এধার ওধার ঘুরল। বার বার তার সামনে দেবীজীর মুখ ভেসে উঠতে লাগল। সেই রক্তাম্বর, কৃষ্ণ কুন্তল, নিবিড় গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। খানিকটা ঘুরে বিশ্বনাথের গলির মুখে সে একটা শরবতের দোকানে ঢুকে পড়ল। একগ্লাস লস্যি নিয়ে পাথরের টেবিলের ধারে বসে যাত্রীদের স্রোত দেখতে লাগল। ঘুরে ফিরে বার বার প্রথম দেবীদর্শনের কথা তার মনে পড়তে লাগল।

আরে ভাইটি, কবে এলে?

সোমদেব প্রশ্ন শুনে দেখল, মহাদেও পাণ্ডা একগাল হেসে এগিয়ে আসছে।

মহাদেও কলকাতায় যজমানদের বাড়ি গেলে সোমদেবের বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে ভোলে না। লোকের ঠিকুজি-কুলুজি তার নখদর্পণে। একবার গল্পে বসলে সে জমিয়ে তুলতে পারে। বাংলা ভাষাও তার ভালই রপ্ত আছে। সকলকে জানিয়ে দেয় যেন সে তাদের কত চেনা।

তিনদিন হল এসেছি, সোমদেব বলল।

ব্যোম্‌শংকর, মহাদেও বলল এতদিন হল আর আমাকে খবর দাওনি?

দরকার হয়নি। আমরা কয় বন্ধুতে বেড়াতে এসেছি, পুণ্যি করতে নয়।

কোথায় উঠেছ?

জায়গা পেলুম না, শেষে কৌশিকী মঠে আশ্রয় নিয়েছি।

কৌশিকী মঠ? ঐ মীরঘাটের পাশে? ব্যোম্‌শংকর, আর জায়গা পেলে না?

কেন, আশ্রয় খারাপ নয় তো, তাছাড়া পয়সাও লাগছে না।

বদনাম আছে মঠের।

কি বদনাম? আমি ক'দিন আছি, কোন বেচাল দেখিনি।

ঐ তো মজা, বাইরে থেকে বুঝবে না ভাইটি, কিন্তু ভেতরে নানা গোলমাল। উইপোকা যেমন কাঠ ফোঁপরা করে দেয় বাইরে থেকে বোঝার উপায় থাকে না, সেইরকম।

আমাদের আর কি? ক'দিন বাদে চলে যাব। বার্থ রিজার্ভেশন হয়ে গেছে।

এ্যাঁ? এত তাড়াতাড়ি যাবে কেন? থাক দু'চার দিন, দেওয়ালী দেখে যাও, অন্নকূটের প্রসাদ খাও। বিশ্বনাথজীর পূজো দাও ভাল করে। আমি সব বেওস্থা করে দেব, তুমি আমার ডেরায় ওঠ।

আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে, যাওয়া ঠিক হয়ে আছে। পরের বারে তোমার কাছে থাকব, কি বল? সোমদেব একটু থেমে বলল, কিন্তু মঠের গোলমালটা কি?

সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলুম। মহাদেও বলল, ওখানে কোন নওজোয়ান টিকতে পারে না। উমাশংকর মিশির বলে এক নওজোয়ান পূজারী ছিল, সে মঠে পূজা করত, হঠাৎ একদিন মন্দিরের ঘণ্টার শিক থেকে তার মৃতদেহ ঝুলতে দেখা গেল। ডাক্তার বলল আত্মহত্যা, আদালত তাই রায় দিল, কিন্তু লোকে বলে, কেউ খুন করে লটকে দিয়েছে তাকে।

কে আবার খুন করবে?

লোকে বলে লল্লন পহলবান্, সে বেটা এককালে গুণ্ডা ছিল, কাশীর ডাকসাইটে গুণ্ডা। এখন মঠে দারোয়ানি করছে।

কেন মারল?

শোনা যায় দেবীজীর সঙ্গে নাকি তার গড়বড় হয়েছিল।

এসব নোংরা কথা কেন রটাচ্ছ পাণ্ডাজী?

তুমি নারাজ হচ্ছ কেন ভাইটি? দেবীজী কি তোমায় বশ করেছে? ঐ যে তোমরা বল কামিখ্যের ভেড়া? কাশীজীর ভেড়া হলে?

বাজে কথা, সোমদেব বিরক্ত হয়ে বলল।

উমাশংকর না হয় নিজেই ঝুলেছিল, কিন্তু শিউসুরত সিং গুম হল কেন?

কে সে?

ঐ যে মঠের ম্যানেজার ছিল, এই কিছুদিন আগেই সে নিখোঁজ হয়েছে। এই নিয়ে কোতোয়ালিতে হুজ্জোত হল। তবে রুপেয়ায় সব কসুর চাপা পড়ে যায়।

সেও কি ঐ দেবীজীর সঙ্গে গড়বড়?

কে জানে? বাবা বিশ্বনাথের রাজ্যে পাপ-পুণ্য পাশাপাশি বাসা বেঁধে আছে।

এত সব কাণ্ড যদি সত্যি হয়, দেবীজীর বাড়ির লোক কিছু বলে না? সোমদেব জিজ্ঞাসা করল।

বাড়ির লোক আর কোথায়? বাপ-দাদা রইস আদমি ছিল। বহুত রূপেয়া কামিয়েছিল। যা হয়ে থাকে, বাপ বাঈজী রেখেছিল, ফাটকায় বাপের সব নুকসান হয়। দাদা আগেই ঐ মঠের ট্রাস্ট করে যায়। তাই খোরপোষের অভাব ঘোচে। মহাজনেরা কিছু করতে পারে না।

ওঁরা বেঁচে আছেন?

না। কুছ বরষ আগে ওদের মৃত্যু হয়েছে। দাদা মরল, বাপ ভি মরল। মা এক তান্ত্রিক সাধুর কাছে দীক্ষা নিল, লেড়কিকে নিজেই সন্ন্যাসিনী বানাল। ঐ লেড়কীই তো এখন দেবীজী। মঠের বেশ পয়সা আছে। চৌকের মকান থেকে অনেক কিরায়া পায়। কুছ উব্‌কার ভি করে, বিধোওয়ারা দুটো-রোটি পানি পায়।

তবু লোকে দুর্নাম রটায়?

কি করে জানব ভাইটি! যা শুনি তাই বলি। যাক্ সাবধানে থেকো। কুছু হরজা হলে, খবর ভেজো। আমার পত্তা তো জানই. ভি ৩৪ ৭০৩ গণেশ মহল্লা। গণেশজীর মন্দিরের নজদিকে মকান। ব্যোমশংকর।

মহাদেও চলে গেল, কিন্তু রেখে গেল একরাশ কৌতূহল সোমদেবের মনে। সে ঢক ঢক করে লস্যি খেয়ে দাম চুকিয়ে আস্তানার দিকে পা বাড়াল। আজ গানের আসর সে জমাবেই। লল্লন বলেছিল, হারমোনিয়াম মঠেই আছে। ডুগি তবলা বাজাবার লোকও পাওয়া যাবে। সোমদেব একবার হারমোমিয়ামটা দেখে নেবে। সেটা সাধারণ না স্কেল চেঞ্জিং।

মঠে ঢুকতেই লল্লন বলল, কোথায় ছিলে বাবুজী? হামি তালাস করছিলুম।

দোকানে লস্যি খেতে গেছলুম, সেখানে পাণ্ডাজীর সঙ্গে দেখা।

কোন পাণ্ডা? লল্লন জিজ্ঞাসা করল।

মহাদেও পাণ্ডা, গণেশ মহল্লায় যার বাড়ি।

লল্লন বিরক্ত হয়ে বলল, মহাদেও পাণ্ডা? সে বেটা ফোরটোয়েণ্টি। কত খালি বাড়ি সে বেদখল করেছে। এ বাড়িতেও তার যাতায়াত ছিল মাতাজীর আমলে। দেবীজী কি মা। কিন্তু দেবীজীর আমলে আমি বেটাকে হাঁকিয়ে দিয়েছি।

তাই বুঝি তোমার ওপর রাগ? সোমদেব বলল।

বলেছে বুঝি? আর কি কি বলেছে? হামি গুণ্ডা ছিলাম?

হ্যাঁ।

এটা ঠিক বলেছে, লল্লন বলল, আমি কাশীজীর গুণ্ডা ছিলাম। জেল মেয়াদ ভি খাটিয়েছে পাঁচ বরষ তিন মাহিনা। লেকিন্ গুণ্ডাবাজি ছোড় দিয়া।

হঠাৎ সাধুসজ্জন বনে গেলে কেন?

ওহি দেবীজীর জন্যে। হামি ওর মাতাজীকে পয়ছানতুম্। হামায় দেখে বচ্‌পন্‌মে দেবীজীর ডর লাগত। হামি কোলে নিতে গেলে কাঁদত, গুণ্ডা গুণ্ডা বলে চিল্লাত। হামি কুছ বললেও মানত না। একদিন হামি বললুম, গুণ্ডামি ছেড়ে দেব। মুন্নি বলল, তবে আমি তোমার কোলে যাব। হামি সেই থেকে গুণ্ডামি ছাড়লুম। মরণের পহলে ওর মাতাজী কইল, লল্লন, মুন্নির তুমি জিম্মেদার। তোমার জিম্মায় হামি ওকে রেখে যাচ্ছি। তুমি ওর দেখভাল্ কর। সেই অবধি হামি মুন্নিকে পাহারা দিয়ে থাকি। ঐ মুন্নিও হামার কোলে-পিঠে বড় হয়ে দেবীজী বনল।

লল্লনের চোখে জল এসে গেল। সে চোখ মুছে বলল মহাদেও হারামজাদা আর কি কইয়েছে?

নাঃ, আর কিছু নয়। সোমদেব মিথ্যা বলল।

অপ্রিয় নোংরা কথা চাপা দেবার জন্যে সোমদেব প্রসঙ্গান্তরে গেল। সে বলল মিশিরজী, চল, দেখি তোমাদের হারমোনিয়াম।

বাবুজী, আপনার লিয়ে ভাল হারমোনিয়াম মাঙ্গায়েছি হরগৌরী সংঘ্‌সে বড়িয়া বাজানা। আইয়ে, তারিফ কিজিয়ে।

* * * *

সেদিন সন্ধ্যায় কৌশিকীজীর মন্দিরের উঠানে সোমদেবের সঙ্গীতের আসর জমে উঠল। অনেক লোকের সমাবেশ; স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, বেশির ভাগই অন্য প্রদেশের। সোমদেব হারমোনিয়াম নিয়ে সুর দিল, কে এক ছন্নু সিং সঙ্গত করবে। লল্লন কিছু অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। হরগৌরী সংঘের সচীব আশুতোষ চ্যাটার্জী হাজির হয়েছিল। সুপরিচিত সমাজসেবী নেড়ুবাবুও উপস্থিত। বেচারা প্রায় অন্ধ, লাঠি ধরে হাঁটে, গোল মুখ, ছাঁটা-ছাঁটা চুল, বেনিয়ান পরে, জনসেবার কাজ করে পণ্ডিত সমাজের কাছে জনসেবক খেতাব পেয়েছে। চিত্তরঞ্জন পার্কে সার্বজনীন দুর্গোৎসব, কালীপূজা, হরিসভা প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠান চালায়। সোমদেব এই জনপ্রিয় মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেল। আরও অনেক অভ্যাগত কলকাতার বাঙালীবাবুর ভজন শুনতে হাজির হয়েছে।

কিন্তু উপস্থিত সবার মধ্যে একজনের অভাব সোমদেব অনুভব করল। মহিলামহলে দেবীজী অনুপস্থিত। সোমদেব বার বার নজর বুলিয়েও সেখানে দেবীজীকে খুঁজে পেল না। ঐ ভিড়ের মধ্যে দেবীজীকে দেখলেই সোমদেব চিনে নেবে। তাকে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। তার যৌবনোচ্ছল দেহ, ঢলঢলে মুখ, আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টি সোমদেব প্রায়ই মানসচক্ষে দর্শন করে। সোমদেব দেবীজীর অনুপস্থিতিতে গান ধরল। প্রথম গানটা তেমন জমল না বলেই তার মনে হল। কিন্তু দ্বিতীয় গান ধরার আগেই লখিয়াকি মা যাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল, সে-ই দেবীজী।

সকালের মতো এ-বেলায়ও ঐ রক্তাম্বর পরেছে সে। যেন এক ঝলক চলন্ত আগুন। তার ভাবগম্ভীর মুখ স্মিত হাসিতে নরম হয়ে উঠেছিল, চোখে সেই গভীর দৃষ্টি। মেয়েরা দেবীজীর বসবার জন্য জায়গা করে দিল। তার বিশেষ কোন আসনের ব্যবস্থা হয়নি। আর পাঁচজনের মধ্যেই সে বসল, কিন্তু আর পাঁচজন থেকে কি পৃথক তার ব্যক্তিত্ব। সোমদেবের মনে হ'ল দেবীজীর উপস্থিতি সভাকে শোভন করে তুলল।

দ্বিতীয় গান থেকেই সোমদেব আসর জমিয়ে তুলল। ছন্নু সিং সংগত করল ভালই। সোমদেব একের পর এক গান গেয়ে চলল, ভজন, রামপ্রসাদী, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল, অতুপ্রসাদ, ভক্তিমূলক বাংলা গান, হিন্দী ভজনও সে বাদ দিল না। সে তো ধাতুময়ী

কৌশিকীজীকে গান শোনাচ্ছিল না, শোনাচ্ছিল মনোময়ী মানবীকে ভাবাপ্লুত পরিবেশে। সোমদেবের চোখ প্রায়ই দেবীজীর মুখের উপর আছড়ে পড়ছিল। সে লক্ষ্য করল গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেবীজী তার গান শুনছে। চোখে চোখ পড়ছে। তবু দেবীজী চোখ সরিয়ে নিচ্ছে না। তার আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টি যেন সোমদেবের অন্তর্ভেদ করে হৃদয়ের অতলে প্রবেশ করছে।

গানের পালা শেষ হল প্রায় দু'ঘণ্টা পর। একটানা একাই সে গেয়ে চলেছিল, সময়ের দিকে হুঁশ ছিল না! শ্রোতারাও তারিফ করছিল, দেবীজীও। হঠাৎ রিস্টওয়াচের দিকে চোখ পড়তে সোমদেব পালা সাঙ্গ করল। অনেকে বাহবা দিল, তারিফ করল। হরগৌরী সংঘের আশুবাবু বলল, কালই আমাদের ক্লাবে গান শোনান মশায়। নেড়ুবাবু বলল, আপনাকে ছাড়ছি না, আপনি মশায় কালীপুজো কাটিয়ে যান। চিত্তরঞ্জন পার্কে সার্বজনীন কালীপূজোয় আপনার গানের ব্যবস্থা করব, ডি. এস. পি. আসবে, হিন্দু ইউনিভারসিটির প্রফেসাররা আসবে। অনেক লোক আসবে। আপনার গান আসর মাতিয়ে দেবে। ভারী সুন্দর দরাজ কণ্ঠ আপনার। চড়া অথচ মিষ্টি, মাইক দরকার হয় না। কথা-ঠিক রইল, কি বলেন?

সোমদেব ওদের ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আমি পরশু চলে যাচ্ছি কলকাতায়।

সেকি? নেড়ুবাবু বলল, কালীপূজো অবধি থাকুন। উদ্বোধনের আসরে গাইলে আপনার খুব নাম হবে।। সন্মার্গ, আজ, নর্দার্নের রিপোর্টাররা আসবে। কাগজে আপনার নাম ছাপবে। থেকে যান মশায়।

সোমদেব ওদের প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হল। অফিসের ছুটি ফুরিয়ে এল, এবারের মতো ভ্রমণপর্বও শেষ হবে। ওরা চলে গেল। দেবীজীও উঠে গেছে কোন্ ফাঁকে। সোমদেব আশা করছিল নিজের মুখে দেবীজী তার গানের তারিফ করবে, ধন্যবাদ দেবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় সোমদেব একটু ক্ষুণ্ন হল। সে কামরায় গিয়ে বিছানায় শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

হরেন আর সুধীর এখনও ফেরে নি। এত রাত অবধি নিশ্চয় তারা সারনাথে নেই। হয়তো ফেরার পথে একেবারে সিনেমা দেখে খেয়েদেয়ে আসবে। গানের আসরের ব্যাপারে তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না, বরং মনে মনে কিছু ঈর্ষা ছিল বলেই সোমদেবের ধারণা।

সোমদেবের মনটাও অবসন্ন, যাকে উদ্দেশ্য করে সে এতগুলি গান দরদ দিয়ে গাইল, সেই দেবীজী একবারও তাকে ধন্যবাদ দিল না, তারিফ করল না। দমে গেল সোমদেবের মন। কিন্তু সে পরক্ষণেই চাঙ্গা হয়ে উঠল লখিয়াকি মা-র উপস্থিতিতে।

লখিয়াকি মা বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে সোমদেবকে বলল, বাবুজী, দেবীজী আপনাকে

এত্তেলা দিয়েছেন।

পুলকিত হয়ে সোমদেব বলল, কোথায় যেতে হবে?

আপ মেরে সাথ উপর আইয়ে।

সোমদেব লখিয়াকি মা-র পিছনে সাগ্রহে অগ্রসর হল, সিঁড়ি দিয়ে দোতলার একটি ঘরে ঢুকল। এই প্রথম সে উপর তলায় প্রবেশের অধিকার পেল।

ঘরটি আধুনিক আসবাবে সাজানো। সোফাসেটি, একটি সেক্রেটারিয়েট টেবল, তাতে লেখার সরঞ্জাম, কিছু কাগজপত্র, হিসাবের খাতা, আদালতের নথি, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল দেওয়ালজোড়া আলমারি-ভর্তি বই। এক নজরে সোমদেব দেখে নিল ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত গ্রন্থের সমাবেশ। কার বই? কে পড়ে? না সবই সাজানো? সাজাবার ইচ্ছা থাকলে তো একতলাতে রাখতে পারত, যেখানে সাধারণের গতিবিধি, এত বই দোতলার অন্দর মহলে কেন?

বৈঠিয়ে বাবুজী। দেবীজী আভি আ রহী হ্যাঁয়।

লখিয়াকি মা চলে গেল। সোমদেব আবার বইগুলি দেখতে লাগল। দূর থেকে যতটা দেখা যায়, সে লক্ষ্য করল বেশীর ভাগই ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু নাটক-নভেলও আছে, রবীন্দ্রনাথের শতাব্দী সংস্করণ, বিদ্যাপতি কাব্যসংগ্রহ, তন্ত্রগ্রন্থ, নাগরী লিপিতে বিভিন্ন পুরাণ।

এমন সময় দেবীজী ঘরে ঢুকল। সোমদেবের মনে তরঙ্গ উত্তাল হল। দেবীজীর কণ্ঠ সোমদেবের কর্ণে সুধাবর্ষণ করল। বাবুজী, আজ আপনার গান ভারী সুন্দর হয়েছে।

বাঃ, চমৎকার বাংলা বলে দেবীজী। সোমদেব সসম্ভ্রমে বলল, আপনার ভাল লেগেছে জেনেই আমি খুশী। কিন্তু আপনি বাংলা শিখলেন কি করে?

কেন, ছোটবেলায় আমি অনেকদিন যে কলকাতায় কাটিয়েছিলুম, নারীশিক্ষা সদনে পড়েছি। আমাদের প্রফেসররা অনেকেই তো বাঙালী ছিলেন। অনেকদিন বাদে আপনার কণ্ঠে বাংলা গান খুব ভাল লাগল।

আপনি গাইতে পারেন? সোমদেব প্রশ্ন করল।

গান আমার আসে না, শুনতে ভাল লাগে। একদিন গান শুনিয়ে আপনি লোভ লাগিয়ে দিয়েছেন, আরও শুনতে ইচ্ছা করে। শুনলুম আপনারা শীঘ্র ফিরে যাবেন?

হ্যাঁ।

আরও কিছুদিন থেকে যান। কৌশিকীজীকে গান শোনাবেন, আমরাও শুনব।

কিন্তু ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, টিকিটও কাটা আছে।

তাতে আর কি? ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে নিন, টিকিটও রিফাণ্ড করে দিন। আমার অনুরোধে দেওয়ালী অবধি থেকে যান।

দেওয়ালী কাটিয়ে যাবার প্রস্তাব এর আগে দু'জন দিয়েছিল, কিন্তু সোমদেব তা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু দেবীজীর অনুরোধ সোমদেব এড়াতে পারবে না। ইতস্তত করে বলল, বেশ, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। তবে আমার বন্ধুরা থাকতে পারবে না। ওদের অফিস ছাড়াও পরিবারের টান আছে।

আপনার বুঝি পরিবারের টান নেই?

সোমদেব সলজ্জ হেসে বলল, কেউ আমাকে বরণ করে নি, আমিও কাউকে করি নি।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে দেবীজী বলল, আজ রাতে কোথায় খেয়ে এলেন?

আজ আর খাব না।

বলেন কি? দু'ঘণ্টা একটানা গাইলেন, শ্রান্ত হলেন। না খেলে রাতে খিদে পাবে যে। ব্যস্ত হয়ে দেবীজী বলল।

না, ঠিক আছে। সোমদেব আশ্বাস দিল।

তা কি হয়? আপনাকে খেতেই হবে। বন্ধুরা কোথায়?

তারা এখনও ফেরে নি। বোধহয় সিনেমা দেখে খেয়েদেয়ে ফিরবে, সোমদেব জবাব দিল।

ভারী বন্ধু তো;আপনাকে একা ফেলে তারা খেয়েদেয়ে ফিরবে? ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে দেবীজী বলল।

রাত দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

তবে আপনি আমার এখানেই খান, অবশ্য শাকান্ন, নিরামিষ। মঠে আমরা মাছ-মাংস খাই না। আপনার পছন্দ হবে তো?

নিশ্চয় পছন্দ হবে।

লখিয়াকিমা, লখিয়াকি মা—দেবীজী ডাকল।

হাঁ জী, লখিয়াকি মা হাজির হল।

তুরন্ত বাবুজীকে লিয়ে খানেকা ইন্তাজাম কর।

জী হাঁ। লখিয়াকি মা চলে গেল।

সোমদেব ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। আজ দেবীজীর সঙ্গে গল্প করার অনেক অবকাশ পাওয়া যাবে। যাকে সকালবেলা দেখে কিছুটা গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মনে হয়েছিল, সে কেমন সহজভাবে আলাপ করছে। সোমদেবের সমস্যা হল, আলাপ-চর্চাতে কতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। আবার লোভ করতে গিয়ে অভদ্রতা না হয়, যার ফলে সুযোগ হারাতে হয়। সোমদেব একটু মৌন থেকে বলল, আজ সুযোগ পেয়েছি নিজের আর বন্ধুদের তরফ থেকে আপনাকে সাক্ষাৎ ধন্যবাদ দেওয়ার।

কেন?

কেন আবার? আপনি সেদিন আশ্রয় না দিলে আমাদের গাছতলায় ডেরা বাঁধতে হ'ত।

এ আর কি করেছি? হল্লা শুনে ঝরোকা দিয়ে দেখলুম কিছু নবীন মুসাফির বিপদে পড়েছেন, তাই লল্লন মিশিরকে বললুম আপনাদের ডেকে আনতে।

এ আপনার অশেষ করুণা। আপনি তো শুধু আমাদের আশ্রয় দেন নি, দেখলুম তো কত বিধবা বিপন্না আপনার আশ্রয়ে পালিত হচ্ছে, সোমদেবের কণ্ঠে অনুগ্রাহী সুর.।

আ মার আশ্রয় বলবেন না, কৌশিকীজীর আশ্রয় বলুন। আমিও তাঁর আশ্রিতা। আমার দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদাদা এই মঠ আর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমি তার বর্তমান ট্রাস্টি আর সেবাইত। দেখুন না, একেই বলে নিয়তি। সংসার এড়াতে সন্ন্যাস নিলুম, একটা বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসল।

সোমদেব জিজ্ঞাসা করতে চাইল, কেন সন্ন্যাস নিলেন? কেন যৌবনে যোগিনী হলেন? ব্যর্থপ্রেম, না অন্য কিছু? রোগ, শোক, তাপ কি কারণ?

কিন্তু এই নিছক ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হল না। মহাদেও পাণ্ডে বলেছিল, 'মাতাজী নাকি মেয়েকে সন্ন্যাসিনী বানিয়েছিলেন। কিন্তু কেন, কেন? শিক্ষিতা, সুন্দরী, যুবতী মেয়ের বিয়ের বাসনা সব হিন্দু মা-ই করে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে কেন এই ব্যতিক্রম? সোমদেব চুপ করে ভাবতে লাগল।

দেবীজী বলল, এই বৃহৎ সংসার আমাকে একাই বইতে হচ্ছে। কেউ সাহায্য করবার নেই। কোথায় সন্ন্যাসিনীর কর্তব্য সাধন ভজন নিয়ে থাকব, তা নয় হাট-বাজার, ঘরবাড়ি, ভোজনের নিত্য আয়োজন, পূজাপাঠের ব্যবস্থা, মায় নালিশ আদালত আমাকেই সামলাতে হয়। এক এক সময় ভারী খারাপ লাগে। মনে হয় সব ফেলে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই, যেখানে শান্তি পাব। কিন্তু কম্‌লি নেহি ছোড়তা! নিয়তিঃ কে ন বাধ্যতে।

আপনি ম্যানেজার রাখেন না কেন?

তা আর রাখি নি? রেখেছিলুম শিউসুরত সিংহকে ম্যানেজার, সে তহবিল তছরূপ করে নিখোঁজ হল। এখনও তার নামে হুলিয়া ঝুলে আছে।

সংবাদটা পেয়ে সোমদেব খানিকটা আশ্বস্ত হল। মহাদেও পাণ্ডে ঐ ম্যানেজারকে নিয়ে দেবীজী সম্পর্কে কুৎসা রটনা করেছিল। দেবীজী স্বয়ং ম্যানেজারের অন্তর্ধানের কারণ জানাল। তহবিল তছরূপের অভিযোগটা সাজানো নয় তো? সোমদেব এই প্রশ্ন মনের মধ্যে চাপা দিয়ে দিল। কিন্তু উমাশঙ্করের ব্যাপারে গুরুতর অভিযোগের এখনও নিষ্পত্তি হল না। নাই হোক, কি দরকার অপরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোয়?

সোমদেব ফস্ করে বলে বসল, যদি দরকার মনে করেন, যে ক'দিন আছি আমাকেও

কাজে লাগাতে পারেন। চাকুরীর ব্যাপারে হিসাবপত্র দেখার অভিজ্ঞতা আমার আছে।

বেশ তো! আপনি অতিথি! আপনাকে খাটিয়ে নেব? দেবীজী সরস সুরে বলল।

এ আর কি খাটনি!

কিন্তু আমাদের হিসাব তো নাগরীতে। আপনার পড়তে অসুবিধে হবে, লেখাও জড়ানো, দেবীজী একটু থেমে বলল, বেশ দরকার হলে আমিই পড়ে দেব।

সোমদেব মনে মনে খুশি হল। হিসাব পরীক্ষার ছলে দেবীজীকে কিছুটা সময় কাছে পাওয়া যাবে। কিন্তু শিউসুরত সিংও কি দেবীজীকে কাছে পেতে চেয়েছিল? কি হবে ও সব পুরনো কাসুন্দীতে?

লখিয়াকি মা খবর দিল খানা তৈয়ার।

পাশের ঘরে ভোজনের আয়োজন। নিরাভরণ ঘর, কিন্তু পরিচ্ছন্ন, পিঁড়ির উপর বসার ব্যবস্থা ছিল, স্টেনলেস স্টিলের ঝকঝকে বাসনে সাধাসিধে খানা। আটার পাতলা পুরি, আলুকা শাক, রেওতা, অড়হর ডাল, দহিবড়া, আচার, মিঠাই।

এ সব শাকপাতা খেতে আপনার ভাল লাগবে তো? দেবীজী বলল।

কেন বার বার ঐ কথা বলেন? সোমদেব বলল, চমৎকার রান্না হয়েছে। আমাদের ঘরেও নিরামিষ রাঁধে। কিন্তু এমন আস্বাদ হয় না।

এ আপনার বিনয়। দেবীজী বলল, আমি ছাত্রাবস্থায় বাঙালী বন্ধুদের বাড়ি প্রায়ই খেতুম, আমার বাঙালী রান্না ভালোই লাগে।

ভোজনের মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কথা। তার ফাঁকে দেবীজী সোমদেবের ঘরের কথা জেনে নিল। বি. কম. পাস করে সোমদেব একটা ভাল চাকুরী পেয়ে গেল। সে ঐ গানের কল্যাণে। ম্যানেজার সাহেব কলেজের ফাংশনে তার গান শুনে তার চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিল। অল্প দিনে কন্‌ফারমেশন, পদোন্নতি, কেন না সোমদেব কাজে ফাঁকি দেয় না। সে স্বভাবত একটু সিরিয়াস টাইপের ভাবপ্রবণ ছেলে। যেটায় সে হাত দেয় সেটা সে ভালভাবে নিষ্পন্ন করতে চায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের সচ্ছল সংসার। বাবাও ভাল কাজ করেন, দাদারাও। সকলের রোজগারে মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে সংসারে অনটন নেই। ছোট ভাইবোন এখন পড়ে। এককথায় সুখের সংসার বলা যায়।

সোমদেব কিন্তু দেবীজীর পরিবারের ব্যাপারে কিছু জানল না। জানবার সাহস হল না। সবুরে মেওয়া ফলে।

ভোজনপর্ব সমাধা করে নিচে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতেই, হরেন আর সুধীর হৈ হৈ করে উঠল। তারা এর মধ্যে ফিরে এসে শুয়ে পড়েছিল। সারাদিনের পরিশ্রমে তারা শ্রান্ত। যা ভেবেছিল তাই, ওরা সিনেমা দেখে খেয়েদেয়ে ফিরেছে।

হরেন বলল, কি বাব্বা, সিঙ্কিং সিঙ্কিং ওয়াটার ড্রিঙ্কিং, শিভাস্ ফাদার কাণ্ট ক্যাচ্?

ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাপেরও ধরা অসাধ্য!

সুধীর বলল, গানের বাঁশী সোমদেবকে দেবীজীর অন্দরে টেনে নিয়ে গেছে, জানিস হরেন?

র‍্যাপিড প্রোগ্রেস! হরেন বলল, আমাদের শালা দেবীর দর্শন পর্যন্ত হল না।

সুধীর বলল, কেমন মাল মাইরি? আমার সেদিনের প্রশ্নগুলোর জবাব কি? অন্দরে কি খেলি মাইরি, চুমু—?

সোমদেব বিরক্ত হয়ে বলল, যাঃ, তোদের ইয়ার্কি ভাল লাগে না। শোন, আমি তোদের সঙ্গে ফিরছি না।

সেকি! মাইরি? টিকিট কাটা হয়েছে, এক যাত্রায় পৃথক ফল? সুধীর বলল।

আমি ছুটি এক্স্‌টেণ্ড করব। থেকে যাই দু'দিন বেশী। সার্বজনীন কালীপূজোয় গাইবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, নেড়ুবাবু বলে গেছে, উদ্বোধনের আসরে গাইতে হবে।

উঁহু চাঁদু, নেড়ুবাবুর কথায় প্রোগ্রাম পাল্টানোর পাত্র তুমি নও। আসল মতলবটা কি বল তো?

দেবীজী যেতে দিচ্ছে না। হরেন টিপ্পনী কাটল।

যদি তাই হয়, তোদের হিংসে হচ্ছে? সোমদেব পাল্টা আক্রমণ করল।

হবে না! অমন একটা রোম্যান্টিক ব্যাপার পেকে উঠেছে যার হীরো হচ্ছে সোমদেব, আর আমাদের হিংসে হবে না? হরেন নকল দুঃখ জানাল।

সোমদেব যখন নিভৃতে রসালাপ করবে প্রেয়সীর সঙ্গে, আমরা তখন বউয়ের সঙ্গে বাজার-খরচা নিয়ে তর্ক করব, এ কখনও সহ্য করা যায়? সুধীর বলল।

সোমদেব বৃথা তর্কে মাতলো না। দেবীজীর ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সুধীর আর হরেন চলে গেল। সোমদেব রয়ে গেল, কিন্তু সম্পূর্ণ একা পড়ে রইল। প্রথম পরিচয়ের সেই আন্তরিকতা সত্ত্বেও দেবীজী তাকে ক'দিন আমলই দিল না। সোমদেব লখিয়াকি মাকে দেবীজীর কুশল জিজ্ঞাসা করলে হাঁ জী, তবিয়ৎ, আচ্ছী হ্যায়। ব্যস, আর অন্য কথা নয়।

লল্লন পহলবানের হৃদ্যতায় ভাঁটা পড়ল। আগের মতো সে আর কথাবার্তা বলে না, দেখা হলে সোমদেবকে এড়িয়ে যায়। আর ভজনের আসর জমাবার ডাক পড়ে না তার, যদিও পূজাপাঠ মন্দিরে নিয়মিত চলতে থাকে। হঠাৎ যেন মনে হল, সোমদেব ঐ মঠে অবাঞ্ছিত অতিথি। সে সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যে স্থানত্যাগের চিন্তা করতে লাগল। এমন কি বিশ্বনাথের গলির কাছে মহাদেও পাণ্ডার খোঁজ নিল। তার দেখা পেল না। হঠাৎ নেড়ুবাবুর কথা মনে পড়ল। এ এলাকায় অনেকেই তাঁকে চেনে। খুঁজে বার করতে সোমদেবের অসুবিধা হল না। ভদ্রলোক সার্বজনীন

কালীপূজার চাঁদা আদায়ে ব্যস্ত ছিলেন। তবু সোমদেবের সংকল্পের কথা শুনে বললেন, তার আর কি? আপনি আম্মর বাড়িতে উঠুন। বাড়িটা বড় গলির মধ্যে। গঙ্গার হাওয়া পাবেন না, তবে থাকতে অসুবিধে হবে না। আমার ওখানে লাইট, ফ্যান আছে, আপনাকে তিনতলার ঘরটা ছেড়ে দেব।

কত ভাড়া দিতে হবে?

আপনি গুণী লোক! আমার এক কথায় রয়ে গেলেন। আপনি আর কি ভাড়া দেবেন? যা খুশী হয় দেবেন।

নেড়ুবাবু ঠিকানা দিতে সোমদেব আশ্বস্ত হল। সে সেদিনেই বাসা বদল করতে মনস্থ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সঙ্কল্প ভেস্তে গেল। মঠে ফিরতে লখিয়াকি মা খবর দিল; দেবীজী ভজন শুনতে চাইছেন।

কোথায়?

তাঁর কামরায়।

সোমদেব আশাতীত আমন্ত্রণে পুলকিত হল। সে বলল, চল, যাই।

সোমদেব কম্পিত বক্ষে রমণীর অনুসরণ করল। দোতলায় ভোজন-কক্ষের পাশে দেবীজীর শয়নকক্ষ। ফাঁকা ঘর, কোন আসবাব নেই। মেঝেয় শুধু কম্বল বিছানো, তার উপর চাদর পাতা, একটা ছোট বালিশ, পাশে জলের কুঁজো, তার পাশে কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ। দেবীজী কম্বলের উপর বসে একটা কি মোটা নাগরী গ্রন্থ পড়ছিল। সোমদেব প্রথমদিন যে ঘরটায় বসেছিল, তার সঙ্গে এ ঘরটার আকাশ-পাতাল তফাত, এটি সম্পূর্ণ রিক্ত, নিরাভরণ। কিন্তু স্বয়ং দেবীজী তাকে পূর্ণ করে রেখেছেন।

বাবুজী, বসুন। দেবীজীর অনুরোধ।

সোমদেব বসল। এ ক'দিনের উপেক্ষার কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে দেবীজী বলল, আজ অনেকক্ষণ তন্ত্র পড়েছি। হঠাৎ আপনার গান শুনতে ইচ্ছা করল। তাই ডেকে পাঠালুম। শোনাবেন ভজন?

নিশ্চয়, কি শুনবেন বলুন?

যা আপনার প্রাণ চায়। হারমোনিয়াম চাই?

দরকার নেই।

সোমদেব দ্বিরুক্তি না করে ভজন আরম্ভ করল। মীরার ভজন। আবার গানের পর গান। খালি গলায় তার উদাত্ত কণ্ঠে ছোট কামরা গমগম করতে লাগল।

দেবীজী তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগল।

সোমদেব অন্তরের আবেগ উজাড় করে দিয়ে গান গাইতে লাগল, একের পর এক। আজ আর অন্য শ্রোতা নেই। সামনে শুধু রক্তাম্বরধারিণী যুবতী সন্ন্যাসিনী যার

নিবিড় গভীর দৃষ্টি সোমদেবের রক্তে আগুন ছোটাতে লাগল। তার এত কাছাকাছি বসেও কিন্তু যেন কতদূর, শুধু গানই তাদের যোগসূত্র।

কতক্ষণ গান চলল সোমদেবের খেয়াল ছিল না। এবার গলা বিদ্রোহ করল। বাধ্য হয়ে সোমদেব গান থামাল।

এবার তবে বিদায় নি, সোমদেব বলল।

হ্যাঁ। একটু থেমে দেবীজী বলল, আপনার বন্ধুরা তো চলে গেছে। নিচের ঘর নিশ্চয় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তাই আজ থেকে আপনি দোতলায় বাইরের গেস্টরুমে শোবেন। ওঘর থেকে গঙ্গাজীর দর্শন আরও ভাল পাওয়া যায়। ঘরটা আমাদের লাইব্রেরী ঘরের পাশেই। ওটা আমাদের গেস্টরুম।

দোতলার ঘরে প্রমোশন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সোমদেব নেড়ুবাবুর বাড়ি যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করল। লখিয়াকি মা এর মধ্যেই সোমদেবের সামান দোতলায় তুলেছিল। ঘরে ডবল বেড, ড্রেসিং টেবল, ক্যাবিনেট, সংলগ্ন বাথরুম। যাকে বলে মডার্ণ ফারনিশড্ রুম। এ যেন রাজসিক ব্যাপার।

দোতলার ঘরে উঠে সোমদেবের একটি সুবিধা হল, সে রোজই দেবীজীর দর্শন পেত। কিন্তু দেবীজীর অদ্ভুত ব্যবহারের কোন মানে খুঁজে পেত না সোমদেব। কখনও দেবী তার সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করত, হাসত, কথা বলত, আবার কখনও এমন ভাব করত যেন সে সম্পূর্ণ অপরিচিত, সোমদেব কথা বলেতে গেলে অসৌজন্যের সঙ্গে নীরবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যেত। অবশ্য সোমদেব লক্ষ্য করত সারাদিন দারুন খাটে দেবীজী। অন্ধকার থাকতে গঙ্গাস্নান, তারপর সুর করে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ, মঠের পরিচালনা ব্যাপারে দপ্তরে বা লাইব্রেরী ঘরে পরিজনদের সঙ্গে কাজকর্ম। দিবানিদ্রা নেই তার, দ্বিপ্রহর গ্রন্থপাঠেই কাটে। সায়াহ্নে আবার স্তোত্র পাঠ, পরে আশ্রমের বিধবাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা। মন্দিরের সার্বজনীন পুজোপাঠের সব ব্যবস্থা করলেও দেবীজী নিজে কালে ভদ্রে সেখানে উপস্থিত থাকত। বাঁধা-ধরা রুটিন মাফিক সরল জীবন, ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রসাধন, প্রাচুর্যের সুযোগের মধ্যে থেকেও স্বেচ্ছা দৈন দেবীজীর লক্ষ্য।

সোমদেব সম্পর্কে তার অনিশ্চিত ব্যবহারের মধ্যেও সোমদেব একটি নতুন অধিকার লাভ করল, তা হল গ্রন্থাগারের বই পড়ার।

এ সব বই কার? সোমদেব জিজ্ঞাসা করল একদিন।

যে পড়ে তার, দেবীজীর উত্তর।

আপনি সব বই পড়েছেন?

পাগল নাকি? অত বিদ্যে আমার নেই। যখন যেটা ভাল লাগে তাই পড়ি।

ঐ যে নাটক নভেল রয়েছে, তা পড়েন?

আগে পড়তুম। এখন পড়ি না। ওতে চিত্ত বিক্ষেপ হয়।

তবু বইগুলো রেখেছেন কেন?

ওগুলো চোখের সামনে থাকবে, প্রলুব্ধ করবে, তবু পারবে না প্রলুব্ধ করতে।

সন্ন্যাসিনীরা তো সব ছেড়ে-ছুড়ে পালায়।

পালিয়ে মুক্তি কই? কমলি ছাড়ে না। চাই চিত্তসংযম।

হঠাৎ সোমদেবের মনে হল সে নিজেও যেন একটি নাটক-নভেল, সে দেবীজীর চোখের সামনে আছে, হয়তো প্রলুব্ধ করছে, তবু পারছে না। সে কি তবে দেবীজীর সাধনার গিনিপিগ? ঐ যে উমাশংকর মিশির, শিউসুরত সিং—যাদের কথা নিয়ে মহাদেও পাণ্ডা কুৎসা রটাচ্ছিল, তারাও কি ছিল এক একটা গিনিপিগ? প্রশ্নের কোন জবাব পেল না সোমদেব। তবে এ কথা সত্যি, দেবীজীর ব্যবহারে এখনও পর্যন্ত কোন অসংযম সে লক্ষ্য করল না।

কিন্তু এক রাত্রের ঘটনা তার ধারণা বদলে দিল।

সে রাত্রে হঠাৎ দরজায় টোকা পড়তে সোমদেবের ঘুম ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে শয়নকক্ষের দ্বার খুলল, দেখল লখিয়াকি মা উত্তেজিত হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে কি বলছে। ঘুম চোখে তার কথা বুঝতে একটু সময় লাগল, কেন না খুব চাপা গলায় রমণী কথা বলছিল।

বাবুজী, বাবুজী, খতরনাক হুয়া। আপ অভি আইয়ে।

লেকিন হুয়া ক্যা?

দেবীজী কী তবিয়ৎ অচানক খরাব্ হো গয়ী।

চলিয়ে।

সোমদেব দ্রুতপদে লখিয়াকি মা-র পিছু চলল। রমণীর গতিবিধিতে বেশ কিছু গোপনতা। দেবীজীর নিরাভরণ শোবার ঘরে একটি নীল আলো জ্বলছিল, অস্পষ্ট। কম্বলের উপর শুয়ে দেবীজী অদ্ভুতভাবে ছটপট করছিল। তার উর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন, সুডৌল স্তন দুটি উত্তুঙ্গ, পরণের কাপড় বিস্রস্ত। সে মাথা আর পা দুটিতে ভর করে থেকে থেকে ধনুকের মতো হয়ে উঠছে, হাতে বজ্রমুষ্টি, কুঞ্চিত ভ্রূ, মুখটা কঠিন, ঠোঁটের পাশ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে সে বিড় বিড় করে কি বলছে। সারা দেহে একটা অলৌকিক বিরূপতা।

দেবীজীর এই মূর্তি সোমদেব ধারণাও করতে পারে নি।

ক্যা হোগা বাবুজী? সভয়ে সঙ্গিনী বলল।

বৈদ বুলাইয়ে। ম্যায় তো ডাকদার নহি হুঁ। সোমদেব বলল।

লখিয়ার মা যা বলল তার সারাংশ এই যে, বৈদ্য ডাকা এখন সম্ভব নয়, দেবীজী ডাক্তার-বৈদ্য পছন্দ করে না। সুস্থ হয়ে জানতে পারলে ভীষণ রাগারাগি করবে। তাছাড়া এই রাত্রে বৈদ্য পাওয়া যাবে কোথায়? অনর্থক হৈ-হল্লা হবে, তাতে সুনামের হানি। বাবুজী এখন বলুন কি করা যায়।

সোমদেব অকুল চিন্তার পাথারে পড়ল। কি রোগ তা জানা নেই, কি চিকিৎসা তার হদিশ নেই। অগত্যা সে সাধারণ বুদ্ধি থেকে বলল, তুরন্ত ঠাণ্ডা পানি লাইয়ে, আউর এক পাংখা। সায়দ শিরমে খুন চড়া।

লখিয়াকি মা কলসীর জল গড়িয়ে দিল। ঝট করে ভোজন ঘর থেকে একটা হাতপাখা আনল। সোমদেব রোগিণীর মাথায় জলের ছিটে দিল। লখিয়াকি মা ঘন ঘন মাথায় বাতাস করতে লাগল। তবু রোগের উপশম হল না। রোগিণী বিড় বিড় করে বলে চলল, দু'একটা টুকরো কথা বোঝা গেল, উমাশংকর, হঠ্ যা, শয়তান, দূর হঠ্।

কথাগুলি লখিয়াকি মা-র কানে গেল। সে সভয়ে বলল, বাবুজী, উমাশংকরকে পিরেত নে হি কব্জা কিয়া! ক্যা হোগা বাবুজী!

আপ চুপ রহিয়ে, এই বলে দেবীজীর সিক্ত মস্তক সোমদেব নিজের কোলে তুলে নিল। অপরিসীম দরদে তার মন ভরে উঠল। কিসের এক অব্যক্ত যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করছে এই নারী, কি করে তার কষ্টের লাঘব হয়, এই চিন্তাই সোমদেবের মনে। সোমদেব সযত্নে দেবীজীর মাথা টিপে দিতে লাগল। একটু পরে দেখতে দেখতে দেবীজী শান্ত হল। তার দেহের বিকার বন্ধ হল, মুখে কোনও শব্দ নেই, যেন পরমতৃপ্তির সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এতক্ষণে লখিয়াকি মা-র সংবিৎ ফিরল। সে তাড়াতাড়ি দেবীজীর কাপড় টেনে তার নগ্ন বক্ষ চাপা দিয়ে দিল। রোগিণীর নিঃশ্বাসও সরল হয়ে এল। বক্ষের দ্রুত উত্থান-পতনও নেই। কিছুক্ষণ সোমদেব স্থির হয়ে রইল দেবীজীর মুখের দিকে চেয়ে। সোমদেবের কোলে দেবীজীর মাথা। মুখের কঠিন বিকৃতি দূর হয়েছিল, আবার কমনীয় শান্তি ফিরে এসেছিল। সোমদেব ভাবছিল, বাকি রাতটা, সে এই মাথা কোলে করেই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু সে প্রলোভন জয় করল। ধীরে ধীরে দেবীজীর মাথা বালিশে নামিয়ে দিয়ে সোমদেব উঠে পড়ল। সে লখিয়াকি মাকে বলল, দেবীজী আভি নিদ্ মে হ্যায়। আপ শিরপর ধীর সে পাংখা চালাইয়ে। সায়দ আভি সব্ ঠিক হো জায়েগা। অগর কুছ গড়বড় হো তো মুঝে এত্তেলা দিজিয়ে।

বাবুজী, আপ কি মেহেরবাণী, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লখিয়া কী মা বলল, হাম্ আপকে আভারী হ্যাঁয়।

সোমদেব নিজের শয়নকক্ষে ফিরে এল।

বাকি রাতটা সোমদেব ঘুমোতে পারল না. নানা চিন্তায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

লখিয়াকি মা যখন আর কোন খবর দিল না. তখন সোমদেব ধরেই নিল দেবীজী ভালোই আছে। সে অন্ধকার থাকতে উঠে পড়ল। সে লক্ষ্য করল, আজ আর দেবীজী প্রতিদিনের মতো প্রাতঃগঙ্গাস্নানে গেল না। নিশ্চয় সে এখনও ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু উমাশঙ্করের রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করতে হবে। সেটা জানতে পারলে হয়তো রোগিণীর মনের গোপন খবর পাওয়া যাবে। বেলা হলেই ডাক্তারের ব্যবস্থা করা চাই। তবে দেবীজী রাজী হবে না। সোমদেব নিজেই কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে আসবে।

সোমদেব দ্রুত শয্যাত্যাগ করল, প্রাতঃকৃত্য সেরে সে বেরিয়ে পড়ল কোন ডাক্তারের খোঁজে।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছাকাছি অনেক ডিসপেনসারী আছে. কিন্তু এত সকালে সবই বন্ধ। সন্ধান করে সোমদেব মানমন্দির ঘাটের কাছে ডাক্তার ভার্গবের পাত্তা পেল। ডাক্তার সকাল থেকেই রোগী নিয়ে পড়েছিল নিজের চেম্বারে। সোমদেবের পালা আসতেই ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি রোগ?

তাই তো জানতে এসেছি।

রোগী আপনি?

না, আমার এক আত্মীয়া?

রোগিণী কই?

ঘরে।

তবে আমার এখানে এসেছেন কেন? আমি এখন আপনার ঘরে যেতে পারব না, দেখছেন তো কত রোগী অপেক্ষা করছে।

আপনাকে এখনই যেতে বলছি না। আর বলব কি না তার ঠিক নেই।

তার মানে?

রোগিণী ভারী জেদী। ডাক্তার দেখাতে চান না।

তবে আমি আর কি করতে পারি?

চিকিৎসার উপায়।

রোগিণী না দেখে?

এ আপনাকে করতেই হবে।

অদ্ভুত আবদার। বলুন রোগের লক্ষণ।

সোমদেব রোগের লক্ষণ বর্ণনা করল। ডাক্তার একটু হাসল। তারপর আশ্বাস দিয়ে বলল, আপনারা বেশী ভয় পেয়েছেন। এতে ভয়ের কিছু নেই। স্ত্রীলোকের সাধারণ ব্যধি। হিস্টিরিয়া। হিস্টিরিক ফিটস্ দেখেন নি আগে?

না। এর চিকিৎসা কি?

রোগিণী বিবাহিতা, না অবিবাহিতা?

অবিবাহিতা।

তবে তাড়াতাড়ি রোগিণীর বিবাহ দিয়ে দিন। রোগ সারবে।

কিন্তু তিনি যে সন্ন্যাসিনী।

সন্ন্যাস তার কর্ম নয়। যৌন-অতৃপ্তি এই রোগের বিশেষ কারণ।

সোমদেব চিন্তিত হয়ে বলল, তবু কিছু ওষুধ—

এই নিন, ডাক্তার সবুজ কাচের ছোট শিশি তার হাতে দিয়ে বলল, স্মেলিং সলট্। এর পরে রোগ দেখা দিলে নাকের কাছে এটা ধরবেন।

সোমদেব ডাক্তারের ফি আর ওষুধের দাম দিয়ে মঠে ফিরে এল। দোতলায় উঠে দেখল দেবীজী আজ নিয়মমত তার দপ্তরে বসে নি। সোমদেবের পায়ের আওয়াজ পেতেই লখিয়াকি মা ত্রস্তপদে কাছে এল, তার গণ্ড লাল, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সোমদেব শঙ্কিত হয়ে বলল, ক্যা খবর? দেবীজী অচ্ছী হ্যায় না?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রমণী যা বলল তার মর্মার্থ এই যে, দেবীজী ভালই আছে। কিন্তু ভীষণ নারাজ হয়ে আছে। একটু বেলায় ঘুম ভাঙতেই লখিয়াকি মা-র কাছে সব জানতে পেরে দেবীজী ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠেছে। রাগের মাথায় সে লখিয়াকি মা-র গালে চটাস করে চড় কসিয়ে দিয়েছে, কেন সে দেবীজীর ঐ অবস্থায় বাবুজীকে ডেকে এনেছিল? দেবীজী বাবুজীর খোঁজ করেছে। ঘরে ফিরলেই যেন তাকে শয়নঘরে ডেকে আনা হয়।

সোমদেব লখিয়াকি মা-র সঙ্গে দেবীজীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। ঘর অন্ধকার। তবু অস্পষ্ট আলোয় দেবীজীকে শুয়ে থাকতে দেখা গেল।

সোমদেব ঘরে ঢুকতেই দেবীজী তড়াং করে উঠে বসল। তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, বাবুজী, কোন এক্তারে তুমি আমার বিনা অনুমতিতে আমার শোবার ঘরে ঢুকেছিলে?

অতর্কিত আক্রমণে বিব্রত হয়ে সোমদেব বলল, আমি তো নিজে থেকে আসি নি, লখিয়াকি মা ডেকে এনেছিল আমাকে।

মতলব ভাল না, তুমি ওকে ঘুষ দিয়ে হাত করেছিলে।

আপনি এসব কি বলছেন? আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

মিথ্যে কথা, আমার কিছু হয়নি। ও তোমাদের দুজনের চক্রান্ত। ওকে হাত করে তুমি আমার দেহটাকে উপভোগ করে গেছো। পুরুষের স্পর্শে আমার দেহ অশুচি হয়ে গেছে।

স্পর্শ আমি করেছিলুম, কিন্তু সে সেবার উদ্দেশ্যে। কোন বদ মতলব নিয়ে নয়। লখিয়াকি মা সাক্ষী।

আর সাক্ষী মানতে হবে না। আমি জানি পুরুষের পাশবিক কামনার কথা। যাও দূর হয়ে যাও, আমি আর তোমার মুখ দেখব না।

বেশ, আমি যাচ্ছি। তবে ডাক্তারবাবু এই ওষুধটা দিয়েছেন আপনার ব্যবহারের জন্যে।

সোমদেব স্মেলিং সল্টের শিশি দেবীজীর হাতে দিল। কিন্তু দেবীজী শিশিটাকে আছড়ে ভেঙে ফেলল, চাপা চিৎকারে বলল, কে তোমায় ডাক্তারের কাছে যেতে বলল? আমার কিছু হয় নি। ঐ ওষুধ দিয়ে আমায় অজ্ঞান করে ফেলে তুমি আমার ওপর অত্যাচার করবে। বুঝি না তোমার মতলব? যাও দূর হয়ে যাও এ বাড়ি থেকে।

সোমদেব নতমস্তকে বেরিয়ে এল। নিষ্কাম সেবার এই প্রতিদান! ক্ষোভে তার মন বিদ্রোহ করে উঠল, একবার ইচ্ছা হল কিছু কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে বিদায় নেয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল দেবীজী নিশ্চয় প্রকৃতিস্থ নেই। সে নীরবে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করল, দ্রুত নিজের জামাকাপড় বাক্সয় ভরতে লাগল। এখনই সে চলে যাবে, শুধু এ বাড়ি থেকে নয়, কাশী থেকে। খুব শিক্ষা হয়েছে তার। আর নয়। বাক্স গোছানো হয়ে গেলে, সোমদেব নিজের ছোট বেডিংটা খাটের তলা থেকে টেনে বের করতে গেল। হঠাৎ মৃদু পদধ্বনি শুনে সে ফিরে তাকাল। সে দেখল দেবীজীকে।

দেবীজী ঘরে ঢুকে দিল দরজা ভেজিয়ে। তার চোখ আরক্ত, গণ্ডে রোদনরেখা। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। সোমদেব উঠে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। কিছুক্ষণ ঘরে নিস্তব্ধ নীরবতা।

দেবীজীই মৃদুকণ্ঠে বলল, বাবুজী, আপনি সত্যি চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আমার ওপর রাগ করে?

হ্যাঁ। আপনিই তো চলে যেতে বললেন।

বললুম বলে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন?

আপনি বাড়ির মালিক, আপনার হুকুম শীরোধার্য।

না, আপনি আমার হুকুম মানবেন না। আমার কথা শুনবেন না। যাবেন না, যাবেন না। বলুন আপনি চলে যাবেন না?

সোমদেব কি জবাব দেবে ভাবতে লাগল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত দেবীজী বলল, বাবুজী আপনি যাবেন না, যাবেন না, আমায় ছেড়ে যাবেন না। আমার সব সময় মাথার ঠিক থাকে না। আমার কসুর হয়েছে। আমি মাপ চাইছি। আপনি যাবেন না। আমি বড় একা, বড় একা—কান্নায় তার কণ্ঠ ভেঙ্গে পড়ল।

যেমন হঠাৎ দেবীজী এসেছিল, তেমন হঠাৎ সে চলে গেল। সোমদেব বাক্স থেকে জামাকাপড় আবার বার করে রাখল।

দেবীজীর নিত্যকর্ম রুটিন মাফিক চলতে লাগল। সোমদেবের সঙ্গে তার ব্যবহার বেশ সহজ সরল হয়ে উঠল। সে এমন ভাব দেখাল যেন সেদিনের অপ্রীতিকর ঘটনা মাত্র ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন যা ভুলে যাওয়া গিয়েছে। সোমদেবও সেকথার উল্লেখ করত না। দেবীজী মাঝে মাঝে সোমদেবকে ডেকে পাঠিয়ে একাকী ভজন শুনত, কখনও বা গীতাঞ্জলি থেকে পড়ে শোনাতে বলত। কখনও দেবীজী সোমদেবের সামনেই আপন মনে সুরেলা কণ্ঠে সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করত। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সোমদেবের দেহ সংস্পর্শে আসত না, নিজের দূরত্ব বজায় রেখে চলত। এ ব্যবহার সোমদেব মন্দের ভাল হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিল। তবু এই বিচিত্ররূপিণী নারীর দর্শন পাওয়া যেত, সান্নিধ্য পাওয়া যেত, আর তার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনসুখ দিত।

এদিকে দেওয়ালী আগতপ্রায়। বারাণসীর দিকে দিকে তার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল। ক'দিন ধরেই দোকানে দোকানে বিদ্যুতের আলোকমালা দেওয়া হল। চিত্তরঞ্জন পার্কে সার্বজনীন কালীপূজার আয়োজন সম্পূর্ণপ্রায়। সোমদেব হরগৌরী সংঘে গানের আসর জমিয়ে তার সুনাম মজবুত করল। পূজাপ্যাণ্ডেলে তার গানের ব্যবস্থা পাকা হল। এমন কি কলকাতার সুগায়ক এই পরিচিতি নিয়ে পূজার নিমন্ত্রণ পত্রে কার্যসূচীর মধ্যে তার নাম ছাপা হল।

গলিতে গলিতে আতসবাজির দোকান বসে গেল। শিশুরা এরই মধ্যে পটকা ফাটাতে আর ফুলঝুরি জ্বালাতে শুরু করেছিল। জায়গায় জায়গায় লাউডস্পীকারের বিকট হিন্দী গান একটানা কর্ণপীড়া উৎপাদন করতে লাগল।

এদিকে কৌশিকী মন্দিরও সেজে উঠল। একপ্রস্থ চুনকাম করা হল তার দেওয়ালে দেওয়ালে। বিধবারা নতুন কাপড় পেল দেবীজীর হাত থেকে। লল্লন মিশির চৌকে বিশেষ ধরনের আতসবাজির ফরমাশ দিয়ে এল। তাদের আখড়ায় রাত্রে ফ্লাডলাইট জ্বেলে কুস্তির আসরের ব্যবস্থা হল। এক কথায় দেওয়ালীর উৎসবের আসন্নতায় সমস্ত বারাণসী উৎসুক, সঙ্গে সঙ্গে কৌশিকী মঠের বাসিন্দারাও।

দেওয়ালী। সকাল থেকেই কৌশিকী মন্দিরে নহবতের ব্যবস্থা হয়েছিল। সোমদেবের ঘুম ভাঙাল রামকেলি রাগিণী। দেবীজী কোন্ প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান সেরে

ফিরে এসেছিল। তার সুরেলা কণ্ঠে শ্যামাস্তোত্র অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সোমদেব আজ তাকে অবাক করে দেবে। সে গোধূলিয়ার এক বিখ্যাত কাপড়ের দোকান থেকে দামী সিল্কের রক্তাম্বর কিনে এনেছিল সবার অলক্ষ্যে, গোপনে। দেবীজীর স্তোত্র পাঠ শেষ হতে সোমদেব কাপড়ের বাক্সটা নিয়ে অন্দর মহলে গেল লখিয়াকি মাকে সঙ্গে করে। বিস্মিত দেবীজীর করকমলে ঐ সামান্য উপহার সমর্পণ করে সে নিজেকে ধন্য মনে করল। সে আরও অনুরোধ করল দেবীজী যেন এই পবিত্র দিনে ঐ রক্তবস্ত্র পরে তাকে কৃতার্থ করে।

দেবীজী সোমদেবকে প্রত্যাখ্যান করল না।

সন্ধ্যায় দীপমালায় সমস্ত বারাণসী দীপ্তিময়ী। মঠের বাসিন্দাদের সঙ্গে দেবীজীও দীপমালা সাজাতে ব্যস্ত। বহ্নিশিখার মত এই নারী যেন নিজের আগুনেই প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলছিল, মনে হল সোমদেবের। প্রদীপের আলোয় দেবীজীর মুখ রাঙা হয়ে আছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করছে। চোখ ফেরাতে পারছিল না সোমদেব। তার দিকে চোখ পড়তেই দেবীজীও মৃদু হাসছিল। দেবীজীর হুকুম সোমদেব যেন কালীপূজার প্যাণ্ডেলে গানের পর্ব তাড়াতাড়ি সেরে ফিরে আসে। সোমদেব ফিরলে তবেই আতসবাজি পোড়ানো হবে।

সোমদেব দেবীজীর অনুরোধ রাখল। চিত্তরঞ্জন পার্কে গানের আসরে সে প্রথম দিকেই গেয়ে নিল। সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছিল। তাদের মামুলী বক্তৃতার পর সোমদেব নেড়ুবাবুকে বলে নিজের গানগুলির ব্যবস্থা আগে করে নিল। এবারেও গান ভালোই হল। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা তার নাম টুকে নিল আলাপ করে। দু'চারজন সাহেব-মেমও দেবীদর্শনে বেরিয়েছিল। তারা কালীমূর্তি সমেত সোমদেবের ছবিও তুলে নিল। সে তাড়াতাড়ি গান সেরে মঠে ফিরে গেল।

লল্লন ততক্ষণে আতসবাজির আয়োজন করে ফেলেছিল। দুমদাম বোম্‌ই শুধু ফাটল না, তুবড়ি, ফুলঝুরি, রংমশাল, চরকি মাঝে মাঝে আলোকিত করল মন্দিরের উঠান। মঠের বাসিন্দারের মহাস্ফূর্তি। দেবীজীকে শিশুর মতো এতটা উচ্ছল হতে সোমদেব আগে কখনও দেখে নি। লল্লন এবার হাউই, তারাবাজি, ফানুস ছাড়বে। সবাই বেরিয়ে এল গঙ্গাতীরে লল্লনের আখড়ার চত্বরে। মেয়ে পুরুষ আলাদা দাঁড়াল আকাশে বাজি দেখতে। লল্লন সঙ্গীদের নিয়ে এক একটা বাজি ছাড়তেই অন্ধকার আকাশে রঙ্গীন আলোর ফুলঝুরি ঝরে পড়ল। বাজির পর্ব শেষ হতে লল্লনের কুস্তির খেলা। দেবীজীর সামনেই সেই প্রতিযোগিতা। পর পর অনেকগুলি জিতল, একটিতে হারল। দেবীজী স্বয়ং মঠের পক্ষ থেকে বিজেতাদের পুরস্কার দিল।

উৎসবের শেষে মঠে পংক্তিতে বসে প্রসাদ-ভোজন। দেবীজীও সবার মাঝে বসে

পড়ল মেয়েদের সারিতে। পুরুষদের সারিতে অল্প লোকই ছিল।

সমস্ত পর্ব সেরে সোমদেব যখন নিজের ঘরে ফিরে গেল শয়নের উদ্দেশ্যে, হঠাৎ দ্বারে এসে দাঁড়াল দেবীজী লঘু পদে।

কি, খুব ক্লান্ত হয়েছেন, বাবুজী?

হাঁ, তা হয়েছি বটে।

আমিও হয়েছি। সারাদিন পরিশ্রম গেছে।

শুয়ে বিশ্রাম করুন।

আজ আর এখন শুতে ইচ্ছা করছে না। উৎসবের নেশা লেগেছে। আজ আসুন আমরা সারারাত জাগি।

কোথায়?

কাউকে বলবেন না, আমি কাউকে না জানিয়ে নিজেই একটা বজরা ঠিক করেছি। আজ সারারাত ঐ বজরায় ঘুরব। ঘাটে ঘাটে আলোর মালা দেখব, আকাশে ফেটে পড়া তারাফুল দেখে তারিফ করব। যাবেন আমার সঙ্গে?

নিশ্চয়।

তবে ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়বেন। কাউকে জানাবেন না। মানমন্দির ঘাটে বজরা বাঁধা থাকবে। ওখানে ভিড় কম। মাঝির নাম লুরখুর। বজরা চিনে নিতে আপনার অসুবিধে হবে না। আমি স্নান সেরেই লুকিয়ে হাজির হবো।

রহস্যময়ীর এ আবার কি নতুন খেলা! ভাবল সোমদেব।

সকলের অজান্তে সোমদেব হাজির হল মানমন্দির ঘাটে। গলির মধ্যে কতকগুলি লোক দারুপানে মত্ত। ঘাটে কিছু গেরুয়াধারী গাঁজা টানছিল। লুরখুর মাঝির নাম বলতে বজরাটা খুঁজে পেতে দেরি হল না। দুটি কামরাওলা মাঝারি বজরা, সাদা-লাল-নীল রঙ করা, ছাদের উপরে গদি পাতা, কামরাগুলির মধ্যেও। বেশ পরিচ্ছন্ন বজরা। দেবীজী তখনও এসে পৌছয় নি। সোমদেব ঘাটে দাঁড়িয়ে নিজের অকল্পনীয় সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগল। শেষ অবধি দেবীজী আসবে তো, না আবার হঠাৎ মত বদলাবে? এই আশংকাও মনে উদয় হলো। এমন সময় সাদা ওড়না ঢাকা বুক অবধি ঘোমটা টানা একটি নারীমূর্তি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। সে-ই যে দেবীজী সোমদেব প্রথমটা চিনতেই পারে নি। মনে ভেবেছিল সে কোন এক দেহাতী রমণী। নারীমূর্তি তার ইতস্তত ভাব দেখে সোমদেবের দিকে ইঙ্গিত করতেই তখন তার বোধগম্য হল। দেবীজী সাবধানে বজরায় উঠে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে বসল। সোমদেব তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

বসুন বাবুজী।

সোমদেব তার দূরত্ব বজায় রেখে বসল।

বজরা ছেড়ে দিল। তিনজন মাঝি-মাল্লা বজরাটা বেয়ে নিয়ে গেল মাঝদরিয়ায়, যেখানে স্রোতের টান বেশি। বজরা উত্তরমুখে ভেসে চলল। দেবীজী তখনও ঘোমটা খোলে নি, এ এক নতুন রূপে দেখা গেল তাকে।

কিন্তু কেন এই লুকোচুরি?

বজরা কিছুদূর এগিয়ে গেলে ঘোমটা খুলল দেবীজী, বসল বেশ সহজভাবে, তারপর বলল, আজ আমাদের স্কুল-পালানো ছেলেমেয়েদের মতো লাগছে। দিনরাত দেবীজী বনে থাকতে অরুচি ধরে গেছে। আজ একটু পালিয়ে বেঁচেছি।

আপনার উপর অনেক দায়িত্ব সে তো আমি দেখেছি নিজের চোখে।

এ দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারলে আমি যেন বাঁচি। বাঃ দেখুন, দেখুন কি সুন্দর ঐ হাউইটা ফেটে পড়ল! চারিদিকে যেন তারাবৃষ্টি হচ্ছে।

দেবীজীর মুখের উপর নকল তারার আলো ঝলসে উঠে মিলিয়ে গেল।

দেবীজী অন্ধকার ঊর্ধ্বাকাশের দিকে চেয়ে বলল, আকাশজোড়া আসল তারাগুলি মনে হয় কত শান্তিতে আছে। কিন্তু বিজ্ঞানে পড়েছি দারুণ বেগে ওরা ছুটাছুটি করছে। কেন? কি তাদের লক্ষ্য, কি তাদের ভবিষ্যৎ? অনন্ত প্রশ্ন। কে জবাব দেবে?

গম্ভীর হল দেবীজী, হঠাৎ বলল, একটা প্রেমের গান শোনান।

সোমদেব বলল, গান থাক। আপনার কথা শুনি।

দেখুন তো কি অন্যায়, এবার ঘাটগুলি ভাল করে আলোয় আলোয় সাজায় নি। দেওয়ালীর দিনেও অনেক ঘাট অন্ধকার। দেবীজীর কণ্ঠে ক্ষোভ।

তারপর সে আবার বলল, ইস, এই উৎসবের দিনেও মণিকর্ণিকার শ্মশানে চুল্লি নেভে নি। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য পাশাপাশি আছে ঠিক আলো-ছায়ার মত। জানেন, আমার মাকে দাহ করা হয়েছিল ঐ মণিকর্ণিকায়, মাত্র কয়েক বছর আগে।

দেবীজীর স্বর গভীর হয়ে এল, সে বলল, বড় দুখিনী ছিল আমার মা। পিতাজী বাঈজী নিয়ে পড়ে থাকত, মদ খেত, মাকে মারধোর করত, ফাটকা খেলে দাদার ভাল ব্যাপার নষ্ট করে দিল। আপনাদের কলকাতায় আমাদের এক গদি ছিল তুলাপটিতে। কলকাতায় থাকতে আমি নারি শিক্ষাসদনে পড়েছি।

কাশীবাসী কবে থেকে হলেন?

পিতাজীর কারবারে লালবাতি জ্বলল। তবু তার স্বভাব পালটালো না। ধার করেও কসবি পুষতে লাগল। জেল ভি হল। মা ছিল এই মঠের সেবাইত. দাদার ট্রাস্ট অনুযায়ী। এই মঠ আমাদের বাঁচিয়ে দিল।

মায়ের মৃত্যুর পর আপনিই বুঝি সেবাইত?

ঠিক ধরেছেন। মায়ের ইচ্ছায় আমি সন্ন্যাস নিয়েছি। বিয়ের ওপর তার ঘৃণা ধরে গিয়েছিল। মরার সময় মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল আমি যেন বিয়ে-সাদি না করি। বাঃ বাঃ, আবার একটা হাউই ফেটে লকেট ভেসে আসছে! আঃ, আমিই কেবল বকে যাব? আজ আমি একটা প্রেমের গান শুনবই আপনার কণ্ঠে।

সোমদেব শুধু একখানা নয়, পর পর তিন চারখানা প্রেমের গান শোনাল। গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল দেবীজী। গান শেষ হতেও মৌন হয়ে রইল সে।

ততক্ষণে বেণীমাধবের ধ্বজা পেরিয়ে বজরাটা গায়ঘাটার দিকে এগিয়ে গেছে, ব্রিজটা কাছে এসে গেল। এইবার বোধ হয় বজরা ফেরাবার হুকুম দেবে দেবীজী। ব্রিজের তলা দিয়ে বজরা ভেসে চলল। আদি-কৈশোরের ঘাটও পেরিয়ে গেল। উৎসবমুখর দীপোদ্ভাসিত বারাণসী পিছনে পড়ে রইল।

সোমদেব বলল, রাত বাড়ছে, অনেক দূর এসেছি। এবার ফেরা যাক।

কেন, ভাল লাগছে না? আমার কিন্তু বেশ লাগছে। নেই শহরের কোলাহল, পটকার দুমদাম। শান্ত নদীতে অমাবস্যার অন্ধকারে ভেসে চলেছে বজরা। আঃ, কি শান্তি পাচ্ছি মনে।

আবার নিস্তব্ধ মৌনতা, শুধু বজরার গায় নদীর কলকলানি। হঠাৎ উঠে পড়ল দেবীজী। শীত করছে আমার, সে বলল, আমি কামরার মধ্যে যাচ্ছি।

বেশ তো, সোমদেব বলল, রাতও অনেক হল। ফিরতে সময় লাগবে। আপনি বরং নীচের কামরায় বিশ্রাম করুন। আমি ততক্ষণ মাঝিদের সঙ্গে গল্প করি।

কোন কথা না বলে দেবীজী নেমে গেল কামরার মধ্যে। বজরা একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে চড়ায় ঠেকল। না, মাঝিরাই তীরের কাছে এসে বজরার নোঙর ফেলল।

সোমদেব জিজ্ঞাসা করল, কি মাঝিভাই, এখানে বজরা বাঁধলে?

দেবীজী কা হুকুম। মাঝিরা বলল। তারপর সব ক'টি মাঝি নদীর জলে নেমে কাদা ভেঙে বজরা ছেড়ে তীরে উঠে গেল। এবার শঙ্কিত হল সোমদেব। শহর থেকে জায়গাটা বেশ দূরে। একেবারে ফাঁকা জায়গা, জনমানব নেই। উৎসবের দিনে চুরি ডাকাতি রাহাজানির অভাব হয় না। বজরার ছাদে নিরস্ত্র সোমদেব, ভিতরের কামরায় সুন্দরী যুবতী, হলেই বা সন্ন্যাসিনী। এই অবস্থায় কি মতলবে মাঝিরা বজরা ছেড়ে চলে যাচ্ছে? সে সভয়ে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করল, কেন তোমরা যাচ্ছ?

ঐ একই রহস্যজনক উত্তর, দেবীজী কা হুকুম।

ওদের কথায় বিশ্বাস করল না সোমদেব। সে দ্রুতপদে নীচের কামরায় নেমে এল। সেখানে অন্ধকার। আবার অস্পষ্ট আলোয় দেবীজীর ছায়া দেখা যাচ্ছিল। তার কাছে দাঁড়িয়ে সোমদেব ত্রস্তকণ্ঠে বলল, দেবীজী, আপনি মাঝিদের এই ফাঁকা জায়গায়

বক্তব্য বেঁধে চলে যেতে বলেছেন?

হ্যাঁ। ভয় করছে। করছে বই কি। দিনকাল ভাল নয়, চোর ডাকাতের ভয়, তাছাড়া আপনি আছেন এই বজরায়।

কাপড়ের মধ্য থেকে ফস্ করে একটা স্প্রিং দেওয়া ছুরি বার করল দেবীজী, বোতাম টিপতেই যার ফলা ঝিকঝিক করে উঠল অন্ধকারের মধ্যেও। বলল, আমার কাছে অস্ত্র আছে, আত্মরক্ষা করতে না পারি আত্মহত্যা করতে পারব নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্যে। বাইরে বেরোলে আমি সব সময় এই অস্ত্র সঙ্গে রাখি। ভয় নেই বাবুজী, আসুন, বসুন এই গদিতে।

সোমদেব বসল। ততক্ষণে মাঝিরা সব চলে গেছে। নগরপ্রান্তে জনহীন সেই নদীতীরে বজরায় আছে মাত্র দুটি প্রাণী। বাইরে নদীর কলতান, ঝিল্লি-ঝঙ্কার আর তারার আলোর দপ্‌দপানি।

ছুরিটা সোমদেবের হাতে তুলে দিয়ে দেবীজী বলল, এটা আপনিই রাখুন, মরদের হাতে হাতিয়ার থাকলে আউরৎ নির্ভয় হয়।

সোমদেব ছুরিটা বন্ধ করল, সেটাকে নিজের জামার পকেটে ফেলে রাখল।

বেশ কিছুক্ষণ মৌনতা। পরস্পর প্রত্যাশা করে আছে পরস্পরের পরবর্তী পদক্ষেপ।

দেবীজী এবার প্রথম কথা তুলল, আপনি আমায় পছন্দ করেন?

হ্যাঁ, খুব।

ঝুট্ বাত। যদি সত্যি পছন্দ করতেন, তবে কি আমায় জড়িয়ে ধরতেন না, চুমু খেতেন না, আদর করতেন না?

ভয় হয় পাছে বেচাল হলে আপনার সঙ্গ সাহচর্য হারাই।

ভয় কি? আজ আমিই আপনার ভালবাসার কাঙাল। বাবুজী, আমি বড় একা—একা।

না, না, তুমি একা নও। আমি সব সময় তোমার সঙ্গে থাকব। এই বলে সোমদেব কম্পিত বক্ষে এগিয়ে এসে প্রতীক্ষমানা প্রেমিকাকে সবল বাহু-বেষ্টনে আবদ্ধ করল, তার ওষ্ঠাধর চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে তুলল। তাদের রক্তে কামনার আগুন জ্বলল। তাদের দেহ-মন এক হয়ে গেল মিলনের প্রথম মুহূর্তে। সামাজিক বাঁধ ভেঙে অবরুদ্ধ কামনার বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদেরকে। এরপর তারা পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে রইল যেন অনন্তকাল ধরে। এ মিলনের যেন শেষ নেই।

বোধহয় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সোমদেব জেগে উঠল বজরার দোলানিতে। মাঝিরা কখন এসে নোঙর তুলে বজরা ছেড়েছে। উজান স্রোতে দাঁড় টেনে বজরা চালাতে হচ্ছিল। তাতেই সোমদেবের ঘুম ভাঙল। তখনও অন্ধকার। ভাগ্যে অন্ধকার

ছিল। নয়তো মাঝিবা ওদের দেখে ফেলত। সোমদেব নিজের পোশাক ঠিক করে নিল। তারপর দেবীজীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, উঠুন।

উঁ? ঘুমন্ত দেবীজীর উত্তর।

উঠুন, এবার ঘরে ফেরার পালা।

দেবীজী ধড়মড় করে উঠে পড়ল. নিজের বিস্রস্ত বেশবাস ঠিক করে নিয়ে সোমদেবের কণ্ঠ বেষ্টন করল নগ্ন বাহু দিয়ে। তার বুকের উপর মাথা রেখে বলল, এই আমার স্বর্গ, এই স্বর্গ থেকে আমি কিন্তু আর ফিরব না।

উজান স্রোতে নদীতীর দিয়ে বজরা যাচ্ছিল। নিকটে কোন বৃক্ষ থেকে একটা প্যাঁচা চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কিসের অজানা আশঙ্কায় সোমদেবের বুক কেঁপে উঠল। সে সবল বাহুবেষ্টনে প্রেমিকাকে নিষ্পেষিত করল।

বজরা শহরের ঘাটের দিকে এগিয়ে চলল। দীপাবলীর আলো ে কে থেকে বজরার মধ্যে এসে পড়তে লাগল, পড়ল দেবীজীর মুখে, আলোছায়ার খেলা দেখতে লাগল সোমদেব নির্নিমেষ নয়নে।

হঠাৎ দেবীজী নিজেকে মুক্ত করে নিল সোমদেবের বাহুবন্ধন থেকে, বলল, কোথায় গেল আমার অস্ত্র?

এই যে, সোমদেব ছুরিটা ফেরত দিল।

দেবীজী ফস্‌ করে ছুরির ফলা বার করল, নিজের বাহু অল্প চিরল. ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ল। বিস্মিত সোমদেব বাধা দেবার আগেই এই কাণ্ড।

বাবুজী, এই রক্ত আমার জীবনের সঙ্গে উৎসর্গ করছি তোমার কাছে। বলল উদ্‌ভ্রান্ত দেবীজী।

সোমদেব ছুরিটা কেড়ে নিয়ে নিজের হাত চিরল, দেবীজীর ক্ষতস্থানের উপর নিজের ক্ষতস্থান রেখে আবেগ-ভরা কণ্ঠে বলল, আমার রক্ত তোমার রক্তের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছি। এ মিলন অক্ষয় হোক।

কিন্তু সোমদেবের কানে যেন আবার পেচকের ডাক বেজে উঠল। আবার যেন তার বুক কেঁপে উঠল।

দ্বিতীয় পর্ব

সোমদেব বজরা থেকে নেমে একাই মঠে ফিরে এল। দেবীজী একটু আগেই ফিরে গিয়েছিল চাদর মুড়ি দিয়ে। সে চাইল না দুজনকে একই সঙ্গে ভোররাত্রে মঠে ফিরতে কেউ দেখে ফেলে। উল্লসিত চিত্তে সোমদেব মঠে ফিরে এল। মঠ অন্ধকার। ফটক খোলা ছিল। মন্দিরে টিমটিম করে আলো জ্বলছিল। লখিয়াকি মা দেবীজীকে নিয়ে প্রাতঃস্নান সারতে যায়। লল্লন ব্যায়াম করে।

নিজের অন্ধকার শোবার ঘরে সোমদেব প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন কর্কশ কঠিন হাতে মোচড় দিয়ে তার বাঁ হাতটা পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দিল। আগেই সেখানে ক্ষত ছিল। তার উপরে এই অতর্কিত আক্রমণ। সোমদেব যন্ত্রণার ধ্বনি তুলে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। একটা ভারী শরীর তার পিঠের উপর চেপে বসল। কার সাঁড়াশির মত আঙুল কণ্ঠনালিতে চাপ দিল। সোমদেবের দম বন্ধ হবার উপক্রম। সে সভয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করল, কে? কে? কিন্তু গলা দিয়ে চিঁ চিঁ করে আওয়াজ বের হল।

উত্তর হল গুরুগম্ভীর কণ্ঠে, তেরা যম। শালে বাঙ্গালিয়া, বল্ শালে কাঁহা থা তু?

ছোড়ো, আভি ছোড়ো।

চুপ রহ্ বেইমান, বেতমিজ।

না ছাড়লে বলব কি করে? সোমদেব যুক্তি দেখাল।

আক্রমণকারী আঙুল আলগা করে দিল, কিন্তু পিঠের উপর থেকে নামল না, কঠিন কণ্ঠে বলল, চিল্লাও তো দাঁত খট্টা কর দুঙ্গা। বল্ শালে।

সোমদেব সত্য কথাই বলল, দেবীজীর সঙ্গে আমি বজরায় বেড়াতে গেছলুম। কিন্তু কে তুমি যে কৈফিয়ত চাইছ?

ম্যাঁয় দেবীজী কা জিম্মেদার। লল্লন পহল্‌বান।

ও লল্লন, তুমি ভয় দেখাচ্ছ? জানো, আমার কিছু ক্ষতি হলে দেবীজী তোমায় দূর করে দেবে।

কথাটা গোঁয়ারগোবিন্দ লোকটার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হল, সে সোমদেবের পিঠের উপর থেকে উঠে পড়ল। তবু আস্ফালন করে বলল, ক্যা তু নেহি শুনা উমাশংকর কা ক্যা হুয়া থা? কি হয়েছিল উমাশংকরের?

ফাঁসি। মন্দিরের বড় ঘণ্টা থেকে ঝুলেছিল।

কিঁউ?

দেবীজীর সঙ্গে লট-ঘট হয়েছিল।

প্রাণে বাঁচতে চাস্ তো দূর হ এখনি।

কিন্তু আমি তো দেবীজীর সঙ্গে লট-ঘট করি নি, দেবীজী তো নিজেই আমায় ডেকে নিয়ে গেল।

ফির্ ফালতু বাত্! যা, আভি নিকাল যা। নেহি তো তুঝে ভি উমাশংকর বানা দুঙ্গা।

বেশ, যাচ্ছি, কিন্তু দেবীজীর কাছে বিদায় নিয়ে যাব।

কভি নহি।

সোমদেব নাছোড়বান্দা লোকটার পাল্লায় পড়ে মহাবিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সে বাক্স গোছানোর ভান করে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, দেবী-জী-ঈ!

ঝাঁপিয়ে পড়ল লল্লন তার উপর, বজ্রমুষ্ঠিতে তার মুখ চেপে ধরল, রুদ্ধ হল তার কণ্ঠস্বর।

কিন্তু সোমদেবের উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগল।

তার আর্তচিৎকার দেবীজীর কানে পৌঁছতেই সে ছুটে এল সোমদেবের কামরায়, হাতে টর্চ।

সোমদেব তখন লল্লনের সঙ্গে ঝটাপটি করছিল।

দেবীজী চকিতে ধমক দিয়ে বলল, লল্লন, ছোড় দে বাবুজীকো।

সঙ্গে সঙ্গে লল্লন হুকুম তামিল করল, দেবীজী বলল, কোন্ এক্তারে তুই বাবুজীর উপর হামলা করছিস?

ম্যাঁয় দেবীজীকা জিম্মেদার। বংগালিয়া শালেকো উমাশংকর বনা দুঙ্গা।

তবে আমিও একই ফাঁসে ঝুলে পড়ব। দেবীজী ভয় দেখাল, তারপর মোলায়েম কণ্ঠে বলল, লল্লন, তুই ভুল বুঝেছিস। বাবুজী উমাশংকর নয়, ও আমার ওপর কোন জোর-জবরদস্তি করে নি, যা উমাশংকর করতে গেছল। সে ফাঁসিতে ঝুলল, ঠিক হল। উচিত শাস্তি হল। কিন্তু বাবুজী আমায় একা পেয়েও আমার ওপর অত্যাচার করতে যায় নি। আমি বাবুজীকে সেধে নিয়ে গেছি। লল্লন, আমি ওকে প্যার করি। ও আমায় প্যার করে।

তব্ উস্ কো সাদি কর্ মুন্নি।

আমি সন্ন্যাসিনী, আমি কি করে সাদি করব? তাছাড়া তুই জানিস্ মাতাজীর মরণকালে আম্নি হলফ করেছিলুম, সাদি করব না।

তব্?

আরে বুদ্ধু, আমাদের আজ এক রকম সাদি হয়ে গেল, গঙ্গামাঈর কোলে। আজ নহবৎ বাজল, আতসবাজি ফাটল, রোশনী হল, ভোজন হল, আর আমার খুন ওর খুনের সঙ্গে এক হয়ে গেল। দ্যাখ্, দ্যাখ্ আমাদের হাত।

দেবীজী সোমদেবের ক্ষতস্থান দেখাল, নিজেরও। সে সোমদেবের দেহ ঘেঁষে

দাঁড়াল. লল্লন দাদা, তুই আমাদের আশীর্বাদ কর্। আমরা যেন সুখী হই।

লল্লন রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ভগবান তোদের সুখী করুন। প্রৌঢ় পহলবান্ অশ্রু গোপন করার জন্যে সেখান থেকে দ্রুতপদে পালিয়ে গেল।

এরপর কিছুদিন সুখেই কাটল প্রেমিক-প্রেমিকার। অদ্ভুত তাদের লৌকিক সম্পর্ক। দেবীজী দিনে যোগিনী, রাতে মোহিনী। সারাদিন পূর্বের মত তার কঠোর ব্রহ্মচারিণী ব্রত, সেই প্রাতঃস্নান, পূজাপাঠ, মঠ-চালনা, গ্রন্থপাঠ, ধর্মালোচনা। কিন্তু রাত্রিতে নবীন প্রেমাস্পদের সঙ্গে তার অবাধ সুরতোৎসব। দুজনেরই অতৃপ্ত বাসনা সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দুই কুল ভাসিয়ে নিয়ে গেল উত্তাল তরঙ্গে। মিলন গভীরতর মিলনের কামনার জন্ম দিল।

ওদের এই নতুন সম্পর্ক গোপন রইল না। লোক-পরম্পরায় রটে গেল পরিচিত মহলে। বিপদ এল দু'দিক থেকে।

সোমদেবের মা চিঠি লিখল, কল্যাণীয় বাবা সোমদেব, মহাদেও পাণ্ডাজীর চিঠিতে কি সব খবর পাচ্ছি? আমার ছেলে হয়ে তুই কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়বি? আর অধিক কি লিখব। তুই পত্রপাঠ ঘরে ফিরে আয়। আশীর্বাদিকা মা।

সোমদেব জবাব দিল, শ্রীচরণেষু মাগো, তোমার ছেলে কোন কেলেঙ্কারী করে নি। ভালোবাসা কেলেঙ্কারী নয়। পাণ্ডার কুৎসায় কান দিও না। তোমার ছেলে একদিন তোমার চরণে দাসী এনে হাজির করবে।

সোমদেব পত্র আর উত্তর দুটিই দেবীজীকে পড়ে শোনাল।

এরপর বন্ধু সুধীরের পত্র, ভাই সোমদেব, সব খবর পেয়েছি কাশী-ফেরত বন্ধুদের মারফৎ। কি বাবা, ইতর লোকেরা মিষ্টিমুখে ফাঁকি পড়বে? দেবীজী, থুড়ি বৌদির হাতের তৈরী পকৌড়ি আর দহিবড়া খেতে যাব। কিন্তু এদিকে দুঃসংবাদ। তোর অফিস আর ছুটি মঞ্জুর করবে না। শেষে শখ করে পাকা চাকুরি খোয়াবি? ইত্যাদি।

এ চিঠিও সোমদেব দেবীজীকে দেখাল।

কি করবে সোম?

চাকুরিতে ইস্তফা দেব।

আমার জন্যে?

না, আমার জন্যে। বরং দুজনের জন্যে। কিন্তু রোজগার তো আমায় করতে হবে।

মঠের ম্যানেজার হও। শিউসুরৎ সিং চলে যাবার পর পোস্ট খালি আছে।

শেষে তোমার সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক হবে?

তা কেন. মঠের ম্যানেজার কাজ করবে. টাকা পাবে। আমি কাজ করি. দলিল বলে টাকা পাই. এক নয়া পয়সা বেশী বা কম নিই না।

না, আমি মাইনে নিতে পারব না। মঠের ম্যানেজারী করতে পারি, তাতে তোমার কষ্টের লাঘব হবে।

তবে তোমার চলবে কি করে?

চাকরি ছাড়লে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্রাচুয়িটির কিছু টাকাপয়সা পাব। তা দিয়ে কাশীতে দোকান দেব।

সোমদেব নিজের কথা মত চাকুরিতে ইস্তফা দিল। তার পাওনাগণ্ডা আদায় করতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে মঠের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করল, বিনা বেতনে, অনারারি।

সোমদেবের আকস্মিক পদপ্রাপ্তি মঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের চক্ষুশূল হল। বিশেষত মঠবাসীদের মধ্যে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল।

খবরটা পৌঁছে দিল লখিয়াকি মা। দেবীজীর প্রকাশ্য স্বেচ্ছাচাব দেখে নাকি মঠবাসিনী বিধবামহলে দারুণ বিক্ষোভ। এ নিয়ে উলটা সিধা বহু কথা উঠেছে। দু'চারজন বিধবাকে বুঝি তাদের অভিভাবকেরা সরিয়ে নিয়ে গেছে।

মঠের বাঁধা উকিলবাবু উদয়নারায়ণও দুঃসংবাদ আনল। বারাণসী বারে সে শুনেছে মহাদেও পাণ্ডা নতুন করে চক্রান্ত করছে মঠকে বেহাত করে নেবার জন্যে। তার বক্তব্য, কৌশিকী মঠ-মন্দির পাবলিক ট্রাস্ট। সেখানে ম্যানেজার নিখোঁজ, তহবিলে গড়বড়, সেবাইত সন্ন্যাসিনী হয়েও প্রকাশ্যে এক বাঙ্গালীবাবুর সঙ্গে সহবাস করছে, এমন অবস্থায় মামলা করে মঠমন্দির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করানোর অধিকার কাশীর হিন্দু পাবলিকের আছে। কমপক্ষে দুজন হিন্দু এডভোকেট জেনারেলের কাছে অনুমতি নিয়ে মামলা দায়ের করতে পারে হিসাব-নিকাশের জন্যে, সেবাইত বা ট্রাস্টিকে হঠানোর জন্যে।

এ্যাডভোকেট জেনারেলের অনুমতি যাতে না মেলে সেজন্য তদ্বির করতে দেবীজী উকিলবাবুকে অনুরোধ জানাল। আর বিধবাদের অনুচ্চ প্রতিবাদের মোকাবিলা সে নিজেই করতে মনস্থ করল।

একদিন সে দ্বিপ্রহরে মঠবাসীদের সভা ডাকল। সে সভার শিরোভাগে বসল, সোমদেবকে তার পাশে বসাল। বিধবারা উন্মুখ হয়ে রইল দেবীজীর ভাষণ শুনতে। দেবীজী হিন্দিতে যা বলে গেল সংক্ষেপে তার মর্ম এই—

আমি জানি বাবুজীকে নিয়ে আপনাদের মধ্যে প্রতিবাদ উঠেছে। কিন্তু আপনারা ভুল বুঝেছেন। দেখুন এই বাবুজীকে, এঁকে দেখলে কি খারাপ লোক মনে হয়?

নেহি নেহি জী।

এঁর ভজন আপনারা শুনেছেন, আরও শুনবেন। এঁর ভজন শুনে কি মনে হয় এঁর মনে ভক্তির অভাব আছে ?

নেহি নেহি জী।

এখানে আপনারা অনেক বহিন্ আছেন। এই বাবুজী কি কোনদিন আপনাদের দিকে অসভ্যের মত তাকিয়েছে, কারুর সঙ্গে বেচাল করেছে, কারুর ইজ্জত হানি করেছে?

নেহি নেহি জী।

তবে এখন প্রশ্ন উঠছে আমি কেন এঁর সঙ্গে আছি?

হাঁ জী, হাঁ জী।

কেন উমাশংকর ফাঁসিতে লটকাল, আর বাবুজী কেন আমার সঙ্গে ঘর করছে?

হাঁ জী, হাঁ জী।

এ সচ্ বাত, আমি উমাশংকরকে নেক্‌নজরে দেখতুম। কিন্তু তার মনে পাপ ছিল, লালচ ছিল। সে ছিল পূজারী, কিন্তু আউরৎদের দিকে তার নজর। সে আমার দিকেও নজর দিল। সে আমাকে খুব প্যার্ করত। কিন্তু তার ধৈরয্ ছিল না। সে অসংযমী ছিল। এক রাতে দারু পিয়ে আমার উপর হামলা করে, জবরদস্তি করে আমাকে নিতে চায়, আমি চিৎকার করে উঠি। কে কে আমার সেই চিৎকার শুনেছিল?

ম্যঁয়েনে শুনা। ম্যঁয়নে শুনা। ম্যঁয়নে ভী শুনা।

লল্লন পহলবান্ আমার চিৎকার শুনে ছুটে এসে আমায় উদ্ধার করে। মঠের বাসিন্দারা জেগে ওঠে, মহল্লায় সোরগোল হয়। লল্লন সবার সামনে তাকে পয়জার মারতে মারতে মঠ থেকে নিকাল দেয়। কারা কারা সে সব ন্যক্কারজনক ঘটনা দেখেছ?

ম্যঁয় নে দেখা, ম্যঁয় নে দেখা, ম্যঁয়নে ভী দেখা।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে উমাশংকর মন্দিরের ঐ ঘণ্টা থেকে ঝুলে মরে। কে দেখেছ তার শব?

ম্যঁয় নে দেখা, ম্যঁয় নে দেখা, ম্যঁয়নে ভী দেখা।

পুলিস আসে। হাকিম ভী বসে। সাবুদ হয়। কে কে সাবুদ দিয়েছিল?

ম্যঁয়, ম্যঁয়, ম্যঁয়, ম্যঁয় ভী।

তোমরা কেউ মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিলে?

জী নেহী, জী নেহী, জী নেহী।

আর বাবুজী কী আমার উপর জবরদস্তি করেছে?

নেহি, নেহি, নেহি, নেহি।

আমি ওকে দিনের পর দিন পরীক্ষা করেছি। ওকে একা ডেকে ভজন শুনেছি, ওর শোবার ঘরে দোতলায় আমার ঘরের কাছে রেখেছি, একটা দিনের জন্যে কি ওর বেচাল দেখেছি—?

—না। লখিয়াকি মা সাক্ষী হবে, সে ওকে এক রাতে ডেকে নিয়ে গেল আমার শোবার ঘরে। আমার হঠাৎ তবিয়ৎ খারাপ। শুনেছি আমার বুকের কাপড় সরে গেছে।

তবু ও শুধু আমার সেবা করে চলে এসেছে। আমি মিথ্যে সন্দেহে ওকে তাড়িয়ে দিতে গেছি. ও মুখ বুজে চলে গেছে, আমিই ওকে সেধে ফিরিয়ে এনেছি। আমি যদি ওকে এখন প্যার করি. বল তোমরা, আমি কি অন্যায় করছি?

জী নেহি, জী নেহি. বিলকুল নেহি।

উমাশংকর আর সোমদেব কি একধরনের লোক?

নেহি, নেহি, নেহি।

এখন প্রশ্ন সন্ন্যাসিনী হয়ে আমি কেন মরদের সঙ্গে আছি? (সকলে নিরুত্তর) সাধনমার্গের রকমফের আছে। তন্ত্রে বলে পুরুষ আর প্রকৃতি। দুইয়ের মিলনে সৃষ্টি। আমরা প্রতিটি নরনারী তাদেরই অংশ। মরদ পুরুষ আর আউরৎ প্রকৃতি। কোন কোন তন্ত্রশাস্ত্রে বলে দুয়োর মিলনে মন শান্ত হয়. পরমাত্মার সঙ্গে সাযুজ্য হয়। আমাদেব ধর্মে নানা সাধনার কথা বলে। কেউ বলে ব্রহ্মচর্য শ্রেয়ঃ, কেউ বলে পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনে মুক্তি। বিশ্বনাথজীব শক্তি অন্নপূর্ণা, তবু তিনি যোগীরাজ। আমি এতকাল ব্রহ্মচারিণী ছিলুম, কিন্তু এখন আমি পুরুষ সংসর্গ করছি। এ তো আমার সাধনারই অঙ্গ। বলুন, আমি অন্যায় করেছি?

(শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে মৃদু গুঞ্জন।)

আপনাদের সকলেরই একদিন সাদি হয়েছিল। আপনারা আপনাদেব মরদকে প্যার করতেন্?

জী হাঁ, জী হাঁ।

মরদকে কাছে পেতে চাইতেন? তার কাছে থাকতে চাইতেন?

জী হাঁ, জী হাঁ।

আমিও বাবুজীকে প্যার করি, বাবুজীও আমাকে প্যার করে, আমবা কি দুজনে দুজনের কাছে থাকতে পারব না?

হাঁ জী, আলবৎ হাঁ।

একজন অল্পবয়সী বিধবা মিন মিন করে বলল, লেকিন আমাদের সাদি হয়েছিল, আপনারা কি সাদি করেছেন?

একটু দ্বিধা এল দেবীজীর জবাবে, ক্ষণিক পরে সে পাল্টা প্রশ্ন করল, সাদির আগে কি আপনি সন্ন্যাসিনী ছিলেন?

জী নেহি।

আমি কিন্তু সন্ন্যাসিনী। আমাকে কি সন্ন্যাস ব্রত ত্যাগ করতে বলেন?

নেহি জী, নেহি।

তবে সাধারণ নারীর বিয়ে-সাদির যা নিয়ম. সন্ন্যাসিনীর মিলনবেলায় সে নিয়ম

ঘটে না।

আবার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে গুঞ্জন। অনেকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল ফিস্‌ফিস্ করে। শেষে এক বৃদ্ধ বিধবা সকলের মত জানাল, —ওরা সবাই অনুমোদন করছে দেবীজীর নতুন সাধনাকে। ওরা আশা করে দেবীজী আর বাবুজী সিদ্ধি লাভ করুক তাদের সাধনায়।

একজন বালবিধবা বলল, লেকিন্ আমরা মিঠাই খাব।

সহি বাৎ। দেবীজী বলল, লখিয়াকি মা, আজ রাতে এদের সকলের দাবত রইল, আমরা দুজন ওদের সকলকে ভোজন করাব, যেমন বিয়ে-সাদিতে ভোজন হয়। আভি ইন্তেজাম কর্।

অনাথা বিধবাদের যদিও বা বাক্‌বিভূতিতে বোঝানো যায়, এডভোকেট জেনারেলকে বোঝানো অত সহজ হল না। বাবু উদয়নারায়ণ উকীলের তদ্বির বিফল হল। মহদেও পাণ্ডা আর একটি মামলা জুড়ে দিল কৌশিকী ট্রাস্টের পরিচালনার ব্যাপারে, ট্রাস্টি পদ থেকে দেবীজীকে হঠানোর ব্যাপারে। এই মামলায় তদ্বির তদারকের জন্যে সোমদেবের উপর ভার পড়ল। আদালতের পিওন মঠে এসে সমন জারি করে গেল আর্জির নকল সমেত। জবাবে দেবীজী অন্য অনেক কথার মধ্যে বলল, সোমদেবের সঙ্গে তার সাদি হয়েছে গান্ধর্ব মতে, এতে কোন ভ্রষ্টাচার নেই। পুরুষ সংসর্গ তার সাধনার অঙ্গ। মামলার তারিখ পড়ল বেশ কিছুদিন বাদে। বাদীরা রিসিভারের দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু ভাগ্য ভাল দরখাস্ত নামঞ্জুর হল।

সোমদেবের সঙ্গে দেবীজীর সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে পড়ায়, দেবীজী এ ব্যাপারে আর কোন গোপনতা করত না। এরপর শুধু রাত্রে তাদের মিলন হ'ত না, অনেক সময় তারা দ্বিপ্রহরেও একত্র শয়ন করত। চারিদিক থেকে যত বাধা আসতে লাগল, দেবীজী ততই নিবিড় করে আঁকড়ে ধরতে থাকল সোমদেবকে।

প্রথম প্রথম এ নিরবচ্ছিন্ন মিলন খুব ভাল লাগত সোমদেবের, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রেমের আতিশয্যে সে হাঁপিয়ে উঠল। তার বন্ধুবান্ধব বলতে কেউ রইল না। নিজ বাসভূমির সঙ্গে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। এমন কি সোমদেবের নামে কোন চিঠিপত্র এলে সেটা আগেই হাতে পড়ত দেবীজীর, আর দেবীজী তা বিনা অনুমতিতে খুলে পড়ত। অবশ্য সোমদেব মোটেই আপত্তি করত না বরং ভাবত এটা নিবিড় প্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু ক্রমশ স্বাভাবিক ভাবে উভয়ের মধ্যে ছোট-বড় মতবিরোধ দেখা দিতে লাগল। সেটা সব সময়ে আলোচনা দ্বারা নিষ্পত্তি হ'ত না। কলহ মিটে গেলেও বিরোধের একটা ক্ষীণ রেশ থেকে যেত। যেমন একদিন সোমদেব চৌক থেকে একটা সুন্দর

হালফ্যাশানের রঙীন শাড়ি কিনে আনল দেবীজী পরবে বলে। কিন্তু এবার সরাসরি প্রেমিকা প্রত্যাখ্যান করল। সে বলল, আমি কি বেশ্যা যে, ঐ রংচংয়ে শাড়ি পরে তোমার কাছে আসব?

এলেই বা। এ শাড়ি পরলে তোমায় কত মানাবে!

সোম, এ শাড়ি না পরলে আমায় মানাবে না? তোমার চোখে এর মধ্যে এতই একঘেয়ে হয়ে গেছি আমি?

সোমদেব চক্ষু দিয়ে সেই প্রশ্নের নীরব জবাব দিল, কিন্তু প্রত্যাখ্যান-জাত অতৃপ্তি তার মনে জমা রইল।

সোমদেব বলল, চল উর্মি, আমরা সিনেমায় যাই। তোমাকে না বলে আমি দুটো টিকিট কেটে এনেছি।

দেবীজী জবাবে বলল, কেন সোম, কায়া দিয়ে তোমার মন ভরছে না, ছায়ার পিছনে দৌড়বে?

তার মানে?

মানে অতি সহজ। আমাকে তো দিনরাত কাছে পাচ্ছ। তবু ঐ পর্দার নায়িকাদের ছবি দেখে তৃপ্তি পেতে চাও? আমি ঐ-সব নায়কদের দু'চোখে দেখতে পারি না। আমার কাছে তুমিই সর্বস্ব।

এ যুক্তির কি উত্তর দেবে সোমদেব? সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মতো তারা নয় যে, তাদের মতো সিনেমা দেখে মনের ফাঁক ভরাবে। দেবীজী অসাধারণ নারী। কিন্তু তবু টিকিট দুটো নষ্ট হতে সোমদেবের মনে খচ-খচ করতে লাগল।

একবার সোমদেব বলল, অনেকদিন বাড়ি যাইনি, কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ঘুরে আসি।

কথাটা কানে যেতেই দেবীজী কেঁদে-কেটে এক কাণ্ড বাধাল। সোমদেব বিব্রত হয়ে বলল, দেশে যাব, বাপ-মা ভাইবোনদের দেখে আসব, তাতে তোমার আপত্তি কেন?

না, সোম, না। তুমি একবার দেশে গেলে ওরা তোমাকে আর আসতে দেবে না।

আমি কি ছেলেমানুষ যে আমায় আটকে রাখবে?

আমি তোমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারব না।

তবে তুমিও চল।

কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে? তাঁরা আমাকে গ্রহণ করবেন?

যদি না করেন তো আমি তোমায় নিয়ে চলে আসব।

তা পারবে না সোম, তুমি আমায় ত্যাগ করবে।

কি বলছ ঊর্মি, ঊর্মিলা?

ঠিক বলছি, আমার মন বলছে। তুমি কিছুতেই আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

অগত্যা দেশে যাবার সংকল্প ছাড়ল সোমদেব, কিন্তু মনে একটা অসন্তোষ রয়ে গেল।

আজকাল আব গানের আসরে সোমদেবের ডাক আসে না। একদিন পাণ্ডে হাবেলীতে নেড়ুবাবুর সঙ্গে দেখা হতে সোমদেব সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, কই নেড়ুবাবু, আপনাদের ফাংশানে আর আমাকে ডাকেন না তো? সেদিন আপনাদের হরিসভার আসর বসল। ভেবেছিলুম আপনারা আমায় গাইতে ডাকবেন।

নেড়ুবাবু আমতা আমতা করে বলল, সোমদেববাবু, আমি তো আপনাকে ডাকতে চাই, কিন্তু আপনার নাম শুনলেই প্রবল বাধা আসে।

কেন?

কেন আপনি বুঝতে পারছেন না? কাশীর বাঙালীরা ছি ছি করছে। আপনি প্রকাশ্যে একটা মেকি সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সহবাস করছেন। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও হচ্ছে। সেদিন হরগৌরী সংঘের আশুবাবু তো বললেন, লম্পট সোমদেবের জন্যে আমরা কাশীতে মুখ দেখাতে পারছি না।

আমার অপরাধ কি মশায়? আমি ভালোবেসে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘর করছি, এই?

হ্যাঁ, ভাল না বেসে যদি আপনি লুকিয়ে বেশ্যালয়ে যেতেন, তাতে কারুর আপত্তি হ'ত না। কিন্তু বাবুদের যেমন রক্ষিতা থাকে, আশুবাবু বললেন, আপনি নাকি ঐ খারাপ মেয়েছেলের রক্ষিত। এ মশাই আমার কথা নয়, আমি শুধু রিপোর্টার।

আপাদমস্তক জ্বলে উঠল সোমদেবের। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, সমাজে কে কত সাচ্চা লোক তা তো জানা আছে। ঠিক আছে, আপনারা আমাকে না চান, আমিও আপনাদের চাই না।

আহা, আমার ওপর রাগ করেন কেন? আমি কি আপনার নিন্দে করেছি? এই কাশীতে কত না খেল আমিও দেখেছি। ভদ্রতার মুখোশ পরে কত লোক পাপ করে যাচ্ছে। আপনার তবু সততা আছে, আপনি মুখোশ ঝেড়ে ফেলেছেন। যা করছেন বুক ফুলিয়ে করছেন। আপনার বলিহারি সাহস, মশাই। দেখবেন শেষরক্ষা হলে হয়।

এই ধরনের কথোপকথন নিশ্চয় সোমদেবের ভাল লাগবার কথা নয়। আর তা লাগলও না। সে তেতে-জ্বলে সরাসরি দেবীজীর কাছে গিয়ে সব কথা জানাল। জানিয়ে খানিকটা হালকা হল। সে দেবীজীকে বলল আর পারা যায় না ঊর্মি। এস আমরা রেজিস্ট্রি বিয়ে করি। তুমিও সাবালিকা, আমিও সাবালক, তাহলে আমাদের আপত্তি কি?

তোমার না থাকতে পারে সোম, আমার আছে।

কেন? তুমি কি আমায় ভালবাস না, তুমি কি আমাদের মিলনের ওপর সমাজের সীলমোহর লাগাতে চাও না?

না, চাই না। আমি তো মনে করি আমাদের বিবাহ হয়ে গেছে. ঐ যে হলফ করে আদালতে দুবারে লিখেছি গান্ধর্ব বিবাহ।

সে বিয়ে যদি আদালত না মানে? সমাজ তো মানছেই না।

তাতে কি এসে যায় আমাদের? তুমি আমাকে চাও না সমাজকে চাও?

দুটিকেই চাই।

সামাজিক বিধান মেনে শাস্ত্রমতে আমার মা পিতাজীকে সাদি করেছিল, কিন্তু সমাজ কি সত্যি মাকে স্বামীসঙ্গ দিতে পেরেছিল? পেরেছিল প্রেম দিতে। একটু দরদ, একটু ভালবাসা. নিদেন একটু মিষ্টি ব্যবহার? পারে নি তো! তাই তার মৃত্যুশয্যায় আমি তার গা ছুঁয়ে হলফ করেছি আমি তোমাদের ঐ সামাজিক সাদি করব না। মরণপথযাত্রিনী আমার মাকে দেওয়া আমার কথার খেলাপ করিও না সোম।

দেবীজীর সঙ্গে কথায় পেরে ওঠে না সোমদেব, কিন্তু এ ব্যাপারেও মনে একটা বিক্ষোভ জমে থাকে। সত্যি যদি এতই ভালবাসা সোমদেবের প্রতি. তবে সোমদেবের ইচ্ছাপূরণের কোনও প্রয়োজন মনে করে না কেন দেবীজী? হঠাৎ যেন সোমদেবের বিদ্রোহ করার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আবার মিলন মুহূর্তে তার সব বিক্ষোভ সাময়িকভাবে মিলিয়ে যায়।

সোমদেবের বন্ধু বলতে এখন লল্লন পহলবান্ আর তার সাগরিদরা। লল্লনের আখড়ায় এসে সোমদেব যেন স্বস্তি পায়। সেদিনের দুর্ব্যবহারের পর দেবীজীর মনোভাবের দরুণ লল্লনও তার মত পালটেছিল। সে আবার সোমদেবের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল। লল্লন একদিন বলল, বাবুজী আপনি দুবলা হয়ে যাচ্ছেন কেন?

সোমদেব বলল. কই. আমি তো বুঝতে পারি না।

আসুন, আমার আখড়ায় জোর বাড়ান. ডন-বৈঠক, পাঁয়তারা, কুস্তি করুন, ক'মাসে আমি আপনাকে শক্ত করে দেব।

সোমদেব বলল ও আমার পোষায় না, বরং তোমাদের খেলা দেখতে আমার ভাল লাগে।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে আখড়ায় আটকে থাকে না. বারাণসীর গলিতে গলিতে ঘোরে. বিচিত্র নরনারীর যাতায়াত দেখে, ঘাটে ঘাটে সময় কাটায়. আপন মনে গান করে. নিজেকে মনে করে নিতান্ত নিঃসঙ্গ. সঙ্গীহীন। অবশ্য ঘরে ফিরলেই সঙ্গিনী মজুদ আছে। কিন্তু কি

জানি এতে তার মন ভরে না।

নানা আজগুবি চিন্তা তার মাথায় খেলে বেড়াতে থাকে। সে দার্শনিক হবে নাকি? চেৎ সিং ঘাট ছাড়িয়ে ওয়াটার ওয়ার্কসের কাছে গঙ্গায় বোধহয় শুশুকরা ডুব মারে। জলের উপর হুশ করে উঠেই তারা ডুবে যায়। সে নিজেকে শুশুকের সঙ্গে তুলনা করে। সে ওদের মত একবার উঠেই কি ডুবে যাচ্ছে? আবার ওঠবার চেষ্টা করছে। আবার ডুবছে।

গঙ্গায় একটা শবদেহ ভেসে যাচ্ছিল একদিন। তার উপর বসে একটা কাক গলিত খাদ্য সংগ্রহ করছিল। সোমদেবের মনে হল, সে যেন ঐ ফোলা পচা মৃতদেহ, দেবীজী ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। কি উদ্ভট চিন্তা। হঠাৎ একটা গানের কলি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, মা আমায় ঘুরাবি কত?

সে একদিন লল্লনের কুস্তির আখড়ায় ভর্তি হয়ে গেল। শরীর ঘামিয়ে, মাটি মেখে, ভাঙের শরবৎ খেয়ে বেশ সময় কাটল কিছুদিন। একদিন মদের দোকানে ঢুকে একপাত্র মদও নিয়েছিল, কিন্তু প্রথমেই বিস্বাদ লাগায় সে আর ওমুখো হয় নি।

গোধূলিয়ায় হঠাৎ বড়দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সোমদেবের। অনেকদিন বাদে সে নিজের দাদাকে দেখে ভারী খুশি হল। বড়দা বলল, মা এসেছে, ধর্মশালায় উঠেছি। কেন, মা-র পোস্টকার্ড পাস নি?

কই না তো।

আজকাল পোস্ট অফিসের যা হাল হয়েছে! বড়দা বলল।

চল যাই, কতদিন মা-র সঙ্গে দেখা হয় নি। সোমদেব বলল।

ওরা ধর্মশালায় এল। সোমদেব মাকে জড়িয়ে ধরল। মা বলল, তুই ঘরে ফিরলি না, সে জন্যে তোর দাদাকে নিয়ে আমি ছুটে এলুম তোকে ফেরাতে। বিশ্বনাথ দর্শন হবে, পুণ্যি হবে, হারানো ছেলেকে ঘরে ফিরে পাব।

কি যে বল মা? সোমদেব বলল, তোমার ছেলে জ্বলজ্যান্ত রয়েছে, সময় হলেই ঘরে ফিরবে। আর তুমি ঐ সব কথা বলছ?

মহাদেও পাণ্ডাকে খবর দিয়েছি, সে এখনই আসবে।

আবার তাকে কেন?

বা-রে সে-ই তো আমাদের সব খবরাখবর রাখে।

তোমরা ক'দিন থাকবে?

বিশ্বনাথ যদ্দিন রাখেন, যদ্দিনে না তোর সুমতি হয়। মা বলল, আমার সঙ্গে মন্দিরে চল।

তোমরা যাও মা, আমার এখনও স্নান-টান সারা হয় নি। আমি সব সেরে এসে

তোমার সঙ্গে দেখা করব।

সোমদেব যতটা আনন্দের সঙ্গে দেবীজীকে মায়ের আগমনের সংবাদ দিল, দেবীজী ততটা নিস্পৃহভাবে সেটা গ্রহণ করল। সোমদেব মনে মনে আহত হল। সে বলল, আমার মা এসেছে, এ জন্যে তুমি খুশি হও নি?

তিনি কি আমার জন্যে খুশি হয়েছেন? ছোট্ট প্রতিপ্রশ্ন।

এ আবার কি কথা? আমি মাকে লিখেছিলাম, তোমার দাসী এনে দেব। চল তোমাকে নিয়ে যাই মার কাছে। সোমদেব সাগ্রহে প্রস্তাব করল।

তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও। আমার যাবার ইচ্ছে নেই। অনাগ্রহের সঙ্গে দেবীজী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

অগত্যা সোমদেব একাই ফিরে গেল ধর্মশালায়।

ততক্ষণে মা ফিরে এসেছে। বড়দা মহদেও পাণ্ডার সঙ্গে কোথায় বেরিয়েছিল। সোমদেবকে একা পেয়ে মা বলল, হ্যাঁরে, পাণ্ডাজী বলছিল তুই নাকি গান্ধর্ব বিয়ে করেছিস? সে আবার কি? অগ্নিসাক্ষী করে কন্যাদান, পাণিগ্রহণ, প্রজাপতয়ে নমঃ, স্ত্রী-আচার, এ সবই তো আমরা জানি। নিদেন রেজিস্ট্রি বিয়ে কিন্তু গান্ধর্ব বিয়ে কি ব্যাপার?

কেন? মহাভারত পুরাণে পড় নি, কত বড় বড় লোক গান্ধর্ব বিয়ে করত।

ওসব তো সেকেলে কথা। বোষ্টমদের মতো এ কি কণ্ঠি-বদল?

না মা, রক্তের সঙ্গে রক্ত মিলিয়ে এই বিয়ে।

সে কি অলুক্ষুণে কথা? বাপের জন্মে এমন বিয়ে শুনি নি। তা তাকে দেখতে কেমন?

চল না দেখবে। কৌশিকী মন্দিরে গেলে দেখতে পাবে।

যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তোর বাবা জানতে পারলে আমাকেও ত্যাগ করবেন। হ্যাঁরে সমী, আর কত দুঃখ দিবি বাবা? চল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল।

সে হয় মা, যদি তোমরা আমার বউকেও ঘরে তুলতে রাজী হও।

আমি কি আর অরাজী? তোর বাবা বলে—না বাবা, ওসব কথায় কান দিস না। মা চুপ করে।

কি বলে মা? সোমদেবের প্রশ্ন।

বলে আমাদের সমী নেই। কিন্তু আমি বলি সে আছে। আমি তাকে ফিরিয়ে আনব। অনেক বড় মুখ করে বলেছি, আমার মান রাখিস বাবা।

কিন্তু মা, বাবা যদি তোমায় বিয়ের পর ত্যাগ করত, তোমার মনে কেমন লাগত?

ওসব অলুক্ষুণে কথা বলিস নি বাবা।

আমিও তো ওকে ত্যাগ করতে পারব না মা।

শেষ পর্যন্ত সোমদেব মা-দাদাকে ফিরিয়ে দিল। এর ফলে দেবীজীকে সে আরও যেন নিকটে পেল, কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা বিশেষ ফাঁক রয়ে গেল। এই নিয়ে সে প্রায়ই আপনমনে চিন্তা করতে লাগল।

একটি ব্যাপার সোমদেবের মনের মোড় ঘুরিয়ে দিল, দেবীজীরও।

একদিন নেড়ুবাবু সোমদেবকে দেখে বলল, মশায়, একটা উপকার করতে পারেন?

সোমদেব খুশি হল এই প্রশ্নে। যাই হোক একজন ভদ্রলোকও তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। সে বলল, সাধ্য হলে নিশ্চয় করব।

আপনার হাতের মধ্যেই আছে সমাধান। আপনি তো কৌশিকী বিধবাশ্রমের ম্যানেজার?

হ্যাঁ, সাময়িক দায়িত্ব। ওটা আমার পেশা নয়।

তা হোক। একটি বাঙালী বালবিধবার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন না ওখানে।

সে কি এদেশী মেয়েদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারবে?

হ্যাঁ, মেয়েটি হিন্দী বলতে পারে। স্বামী ছিল ট্যাক্সি-ড্রাইভার, মারা গেছে মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে। তিন কুলে কেউ নেই। ভাসুর আলটিমেটাম্ দিয়েছে নিজের ব্যবস্থা করে নিতে। একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয় পেলে মেয়েটা বেঁচে যায়।

কি নাম মেয়েটির?

শর্বাণী।

বয়স কত?

কুড়ি-একুশ হবে।

স্বভাব কেমন?

ভাল, খুব ভাল।

বেশ আপনি নিয়ে আসবেন, আমি ভর্তি করে নেব।

তবে কাল সকালে যাব, কি বলেন?

বেশ তাই আসুন।

কিন্তু এই কথা দেওয়াই তার কাল হল। শর্বাণীকে সে আশ্রমে ভর্তি করতে পারল না। কারণ দেবীজী রাজী হল না।

হল কি, পরদিন ভোর না হতেই লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করতে করতে নেড়ুবাবু হাজির হল কৌশিকীজীর মন্দিরে। সঙ্গে সেই মেয়েটি। সোমদেব যাকে দেখল সে বিষাদের প্রতিমূর্তি, সদ্যবিধবা, আত্মীয়-পরিত্যক্তা। শ্যামলা রঙ, ছিপছিপে, মোটেই সুন্দর নয়, শুধু যৌবনের আলগা চটক তার অঙ্গে। হাতে ছোট্ট রংচটা টিনের বাক্স, পরনে একটি কালাপাড় ধুতি, হাত খালি। এক ঝলক সোমদেব তার চেহারায় চোখ বুলিয়ে নিল।

নেড়ুবাবু বলল, এই শর্বাণী, খুব ভাল মেয়ে মশায়। সংসারের যাবতীয় কাজ করত, বাসন মাজা থেকে রান্না পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ স্বামী মারা যেতে আত্মীয়েরা বিরূপ হল। বড় জা অত্যাচার শুরু করল। ভাসুর অগত্যা বলল পথ দেখ। আর বলবেন না, আমাদের সমাজে কি মানুষ আছে যে, এই সব অনাথাদের দেখবে? সব গান বাজনা, থিয়েটার, ফাংশন, ফূর্তি নিয়ে পড়ে আছে। মানুষ মরুক হেলায়, তবু এক পয়সা ভিক্ষে ছুঁড়ে দেবে না। আমার বাড়িতে ওকে রাখতে পারতুম, কিন্তু মা রাজী হল না। তাই আপনার সাহায্য নিয়ে যদি বিধবাশ্রমে ভর্তি করাতে পারি।

সোমদেব বলল, অত কথার দরকার কি? দেখছি কি করা যায়—

শর্বাণী হঠাৎ সোমদেবের পায়ে পড়ল, দাদা, আপনি আমায় বাঁচান, আমার কেউ নেই দাদা।

হঠাৎ সোমদেব মনে করল, দেবীজী বলছিল আমিও একা, প্রাচুর্যের মধ্যেও একা। আর এই মেয়েটি নিঃস্বতার মধ্যে একা। সোমদেব নিজেও মাঝে মাঝে মনে করে, সে-ও একা। মানুষ ভিড়ের মধ্যে থেকেও কেন মনে করে সে একা?

সোমদেব বলল, ওঠ, ওঠ, শর্বাণী। তুমি চিন্তা কোর না একটা ব্যবস্থা হবেই।

শর্বাণী উঠে চোখ মুছল।

সোমদেব লখিয়াকি মাকে ডাকল। দেবীজী একটু আগেই প্রাতঃস্নান সেরে ফিরে এসেছিল, এখন সে পূজা-পাঠে নিমগ্ন। তাই লখিয়াকি মা-র অবসর। ডাকতেই সে হাজির হল। সোমদেব বলল, লখিয়াকি মা, এই শর্বাণী। বিধবা। এ আমাদের আশ্রমে থাকবে। দেখ কোন ঘর খালি আছে কি না।

লখিয়াকি মা একটু ইতস্তত করল। বাবুজী, দেবীজী কি অনুমতি দিয়েছেন?

এতে আবার অনুমতির কি আছে? আমি বলছি।

আচ্ছা, অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি।

সোমদেব মনে মনে ভাবল, সত্যি কিছু ভুল হয়েছে। শর্বাণীর ব্যাপারে দেবীজীকে জানানো তার উচিত ছিল। সে ব্যাপারটায় মোটে গুরুত্ব দেয় নি। ভাবল এতে দেবীজী আপত্তি করবে কেন? কত বিধবা তো আসে যায়। রয়েছে এত বিধবা, তার উপরে একটি পেট। কি এসে যাবে তাতে?

শর্বাণী, কে আছে তোমার বাপের বাড়ি?

নেড়ুবাবু বলল, কেউ নেই মশায়। পূর্ববাংলার রিফিউজী ওরা। ঘুরতে ঘুরতে কাশী এসে পড়ে, এখানে ওকে ফেলে রেখে বাপ চলে যায়। বিশ্বনাথের গলিতে বসে কাঁদছিল, বিপিন ওকে দেখে ঘরে আনে, রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে। মেয়েটার বরাতে সুখ সইল না। স্বামীটাও পট করে মরে গেল।

তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছ?

দেশে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছিলুম।

কি কাজ জানো?

কি আবার? নেড়ুবাবু বলল, সংসারের কাজ করতে পারবে।

না, আমি ভাবছি ও তো আর দাসীবৃত্তি করে কাটাবে না সারাজীবন।

লেখাপড়া আমার হবে না দাদা। শর্বাণী বলল, আমার নার্সিং পড়ার ইচ্ছে।

এর মধ্যে লখিয়াকি মা ফিরে এল। সে বলল, দেবীজীর পূজা শেষ হয়েছে। উনি আপনাকে এত্তেলা দিয়েছেন।

সোমদেব ঘরে পা দিতেই দেবীজী ফেটে পড়ল। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, তুমি কোন সাহসে একটা মেয়েকে এই আশ্রমে তুলেছ?

এতে সাহসের প্রশ্ন কি?

তর্ক কোর না। এ মঠের আমি সেবাইত, ট্রাস্টি, হুকুম দেবার মালিকান। আমার হুকুম ছাড়া কোন লোকেব স্থান এ মকানে হবে না।

আপাদমস্তক জ্বলে উঠল সোমদেবের। সে বলল, তুমি মালিকান। কিন্তু আমি ম্যানেজার। আমি কথা দিয়েছি। ওকে এখানে থাকতে দাও।

না, ঝাঁঝালো গলায় দেবীজী বলল, তুমি চোখের সামনে রণ্ডী পুষবে আর আমি তা বরদাস্ত করব?

ছি, ছি, এসব কি নোংরা কথা বলছ? সোমদেব বাধা দিল। একটি নিঃসম্বল দুঃখী মেয়ে, যার স্বামী মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছে, তিনকুলে যার কেউ নেই—

ঐ রকম আউরৎ নিয়ে ফূর্তি মজাক ওড়ানো নিখরচায় হয়। আর তর্ক তুলো না। ও রণ্ডী এখানে থাকবে না, থাকবে না।

আমি কথা দিয়েছি, ওকে আশ্রয় দেবই। সোমদেবের পুরুষত্ব জেগে উঠল, সে বলল, তোমার আশ্রমে আশ্রয় না দাও, আমি ঘর ভাড়া করে ওকে রাখব, ওকে খেতে পরতে দেব, ওকে নার্সিং পড়াব—

তুমি রক্ষিতা রাখবে?

বেশ করব। নিজের রোজগারের পয়সায় করব, তাতে কার কি? আমি কারুর তোয়াক্কা রাখি না।

সোমদেব রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে হনহন করে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। নেড়ুবাবুর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, মশায়, এখানে এখন জায়গা নেই। এই টাকা রাখুন, একটা ঘর ভাড়া করে দিন, সেখানে শর্বাণী থাকবে। আর ওর খাই-খরচার জন্যে আমি মাসে মাসে টাকা দেব। ওকে আপনি নার্সিং শেখার ব্যবস্থা করে দিন। যা খরচা লাগে

তাও আমি দেব।

সকালের ঘটনা সোমদেব আর দেবীজীর মধ্যে অভিমানের প্রাচীর সৃষ্টি করল। ওদের এই প্রথম কঠিন কলহ। দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। দেখা হলে দুজনে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সোমদেব নিজের ঘরেই থাকে, কিন্তু দেবীজী তার পুরাতন কম্বলের শয্যায় ফিরে যায়। বেশ কিছুদিন ধরে দুজনের মধ্যে কোন দৈহিক মিলন হয় না। কাছে থেকে তারা দূর রচনা করে।

অসহ্য লাগে এ পরিবেশ। ঝোঁকের মাথায় কিছু না বলে কয়ে লুকিয়ে নিজের জামাকাপড় বাক্সয় পুরে সোমদেব হাওড়ার টিকিট কেটে কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে পড়ল। নিচের ক্লাসের কামরার ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে সোমদেব অনেকটা হালকা বোধ করল। ট্রেনটা মন্থর. প্রায় সব স্টেশনে থামতে থামতে যায়। অনেক অবসর, চিন্তার সময়। যতই ট্রেন বারাণসী থেকে দূরে যেতে লাগল, সোমদেবের মনে চিন্তার জট পাকাতে থাকল। সে ভাবতে লাগল, এ কি করতে চলেছে সে। তুচ্ছ একটা কলহের জন্যে সে প্রেমাস্পদাকে ত্যাগ করছে? নিজের মাকে পর্যন্ত সে জোর গলায় ফিরিয়ে দিয়েছিল এই বলে যে, আমিও তো ওকে ত্যাগ করতে পারব না। আর কিনা একটি অচেনা অজানা নারীর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে সে প্রেমিকাকে না বলে কয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এত তেজ কিসের উর্মিলার? সে কি সোমদেবকে ধর্তব্যের মধ্যে মনে করে? কিসের এত দাপট? না, কিছুতেই ফিরবে না সোমদেব ঐ অহঙ্কারী নারীর কাছে।

ট্রেনটা গঙ্গার ব্রীজের উপর উঠল। অন্ধকার রাত্রে একদিকে দেখা যাচ্ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাশী। ঘাটে ঘাটে আলো জ্বলছিল মিটমিট করে। ঐ তো দশাশ্বমেধের জোর নিয়ন আলো, লাল মন্দিরের চূড়াটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার আগে মানমন্দির ঘাট, ত্রিপুর ভৈরবী ঘাট, মীরঘাট। কৌশিকীজীর মন্দির দেখা যায় না। কিন্তু ওখানেই আছে তার পরিত্যক্তা দয়িতা। অপরিসীম একটা করুণা সোমদেবের চক্ষু আদ্র করে তুলল।

ট্রেনের অন্যদিকে গাঢ় অন্ধকার গঙ্গাতীর। দেওয়ালীর রাত্রে ঐ অন্ধকার নদীতীরে সোমদেব বজরার মধ্যে প্রথম পেল তার প্রেমাস্পদাকে। প্রথম মিলনের সেই অচিন্ত্যনীয় অনুভূতি সোমদেব জীবনে ভুলবে না। আজও সে ভুলতে পারে নি। সে রাতের সমস্ত ঘটনা ছবির মত তার মনের পটে ফুটে উঠতে লাগল।

ট্রেনটা মোগলসরাই স্টেশনে এসে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ থামবে। সে স্যুটকেশটা সহযাত্রীর জিম্মায় রেখে নেমে পড়ল পায়চারী করতে। সে একটু নিরিবিলি চিন্তা করতে চায়। এ ভিড় তার পছন্দ হচ্ছে না। সে এগিয়ে গেল স্টেশনের শেষ প্রান্তে। আকাশ-ভরা তারা, স্টেশনের আলো-আঁধারি, এঞ্জিনের সোঁ সোঁ আওয়াজ, শান্টিংয়ের খটাং খটাং। সোমদেবের মনেও এলোপাথাড়ি চিন্তা, কি করছে উর্মিলা? সোমদেবকে দেখতে না

পেলে কি করবে? তখনও কি মুখভার করে থাকবে? চোখের সামনে ফুটে উঠছে ঊর্মিলার বড় বড় চোখ, তার নিবিড় গভীর দৃষ্টি, নিটোল দুটি কোমল-কঠিন স্তন, পাগল করা স্পর্শ। এসব ফেলে সোমদেব কি করে রাগের মাথায় পালিয়ে যাবে? এ কি করছে সে? এ কি করতে চলেছে? সে ঊর্মিলাকে ত্যাগ করছে? জন্মের মত? না, সে ফিরে যাবে, ঊর্মিলার কাছে ফিরে যাবে। রক্তের সঙ্গে রক্তের মিলনে গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে। কেমন করে সোমদেব তাকে ত্যাগ করবে? ঊর্মিলাকে ত্যাগ করতে পারবে না, ঊর্মি, ঊর্মিলা, ঊর্মিমালা—

সোমদেব প্রায় ছুটতে আরম্ভ করল। ট্রেনটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। থাক দাঁড়িয়ে, থাক পড়ে স্যুটকেশ। সোমদেব ঊর্মিলার কাছে ফিরে যাবে, একটা অদৃশ্য চুম্বক যেন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঊর্মিলার দিকে, অন্ধকারের মধ্যে সে যেন ঊর্মিলার ডাগর চোখের চাহনি দেখতে পাচ্ছে, নিবিড় দৃষ্টি অন্তর্ভেদ করছে। কোমল-কঠিন স্তন কামনা জাগাচ্ছে, স্পর্শ, আলিঙ্গনের আকাঙ্খা পাগল করে তুলছে।

সোমদেব স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়ল, ট্রেনটাও চলে গেল তার পরিত্যক্ত স্যুটকেশ নিয়ে। টাকাকড়ি সঙ্গেই ছিল। সে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি করে মোগলসরাই থেকে বারাণসী এল। তখন বেশ রাত হয়েছে। একটা সাইকেল-রিকশায় চেপে সে মঠে এসে পৌঁছল গলির মধ্যে কিছুটা ছুটে দৌড় লাগিয়ে।

তবু ভাল, তার অনুপস্থিতি তখনও কেউ লক্ষ্য করে নি। সে সরাসরি ঊর্মিলার নিরাভরণ কক্ষে প্রবেশ করল। ঊর্মিলা একা শুয়ে, সেই নীল আলোটা জ্বলছে। সে দেখতে পেল ভূমি-শায়িতা প্রেয়সীকে, কঠিন কম্বলের উপর নিটোল আলুলায়িত দেহ, বুকের কাপড়টা সরে গেছে তার। সোমদেব কোন শব্দ না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই প্রিয় দেহসৌষ্ঠবের ওপর, চুম্বনে, আলিঙ্গনে, আদরে ভরিয়ে তুলল তাকে, সুচকিতা প্রেমাস্পদা প্রিয়তমকে চিনতে পেরে আর অভিমানবশে ফিরিয়ে দিল না, ভালবাসার প্রতিদান দিল।

ওদের পুনর্মিলন কিন্তু পূর্বের সম্পর্ক ফিরিয়ে দিতে পারল না। দেবীজী যেন সোমদেবকে বেশি বেশি চোখে রাখল, যেন বেশি করে খবরদারি করতে লাগল। সোমদেবও তার ক্রিয়াকলাপ মনোভাব প্রেমিকার কাছ থেকে গোপন করতে শুরু করল।

সোমদেব ঊর্মিলার প্রতি উদগ্র ভালবাসা সত্ত্বেও শর্বাণীকে ত্যাগ করল না। কোন মন্দ মতলব ছিল না তার মনের উপর তলায়। খানিকটা করুণা, অনুকম্পা, সহানুভূতি মানব-প্রীতি ঐ নিরাশ্রয় যুবতী নারীর প্রতি। নেড়ুবাবু সোমদেবের কথামত শর্বাণীর জন্যে একটা ছোট ঘর ভাড়া করে দিয়েছিল। নার্সিং শেখার ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। শর্বাণী একটি চেঞ্জার পরিবারে রান্নার কাজ পেয়েছিল। একটা পেট চালানোর পক্ষে আয়টা যথেষ্ট, তবে সাময়িক।

সুসংবাদ এই যে সোমদেবও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদির কয়েক হাজার টাকা হাতে পেল। সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে অল্পদিনের জন্যে ফিক্সড্ ডিপোজিট করল। কিছু টাকা কারেন্ট একাউন্টে রাখল। স্যুটকেশটা ট্রেনে বেপাত্তা হয়েছিল। সে নিজের জন্যে কিছু জামাকাপড় কিনল, ঊর্মিলার জন্যে একটা আংটি আর শর্বাণীর জন্যে সাদামাটা শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি। টাকাগুলি হাতে থাকায় সোমদেব নিজের উপর খানিকটা বিশ্বাস ফিরে পেল। তবে কলসীর জল গড়াতে গড়াতে শেষ হয়ে যাবে। কোনও একটা কারবারে লাগাতে হবে টাকাটা। ভেবে-চিন্তে সে স্থির করল আপাতত একটা ইলেকট্রিকের দোকান দেবে। মূলধন খানিকটা আছেই, ব্যাংক থেকে কিছু ধার নেবে। খানকতক পাখা আর আলো কিনে কাজ শুরু করবে। পাখাগুলো ভাড়া দিয়ে আয় হবে। একটা অ্যাসিস্টেণ্ট রাখলে চলবে। কিছুটা খবরদারী শর্বাণীও করতে পারে।

সোমদেব শর্বাণীকে পেয়ে মনে খানিকটা স্বস্তি পেল। যখনই তার মন খারাপ হয়ে যেত সোমদেব শর্বাণীর ঘরে ছুটে আসত। শর্বাণী রান্নার কাজ সেরে ফিরে এলে বসে বসে দু'দণ্ড গল্প করত। শর্বাণীও তার দাদাকে ভক্তি করত। দাদাই তার পরম ভরসা। শর্বাণী তার বাপের বাড়ির দুঃখের কাহিনী শোনাত, স্বামী-সুখ, কিন্তু শ্বশুরকূলে অশান্তির কথা বলত, বৌদি অর্থাৎ দেবীজীর সঙ্গে দেখা করতে চাইত, গল্প করতে চাইত। সে জানতই না তাকে কেন্দ্র করে দাদা-বৌদির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছিল। শর্বাণী যেখানে রান্নার কাজ করে সেখানকার লোকদের স্বভাব-চরিত্রের কথা খুব রসিয়ে রসিয়ে গল্প করত। সোমদেবের মন ভরে উঠত শর্বাণীর সঙ্গে গল্প করতে করতে।

কিন্তু দেবীজীর সঙ্গে সোমদেবের সম্পর্ক মূলত দেহের, কামনার। দুজনের পৃথক ব্যক্তিত্বের সংঘাত লেগেই থাকত, কিন্তু দুজনে দুজনাকে ছেড়ে থাকতেও পারত না। অভিমান করে পরস্পর দূরে সরে গেলেও আবার কাছাকাছি না এলে দুজনেই হাঁপিয়ে উঠত। দেবীজী আজকাল সোমদেবকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল। সে কথা-প্রসঙ্গে সোমদেবকে নগ্নভাবে জেরা করত তার গতিবিধি সম্পর্কে। সোমদেবের মনে হল ঊর্মিলা তাকে নজরবন্দী করে রাখতে চায়, বোধহয় পিছনে লোকও লাগিয়েছিল সোমদেবের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে। অবশ্য এটা সন্দেহ। সোমদেব এটার কোন প্রমাণ পায় নি।

নিজের মায়ের উপর সোমদেবের অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে। হতে পারে সোমদেব অবাধ্য সন্তান। হতে পারে মায়ের কথা-অনুসারে সে ঘরে ফিরল না। তাই বলে মা পর্যন্ত সন্তানের সঙ্গে সব সম্পর্কচ্ছেদ করে দেবে? মা ফিরে গিয়ে অবধি একটিও চিঠি দেয় নি। সোমদেব পর পর দুটি পোস্টকার্ড লিখে কুশল জানতে চেয়েছিল। কিন্তু মা তার উত্তর পর্যন্ত দিল না। কলকাতার বন্ধুদের কাছ থেকেও সে কোন পত্র পায়

না। বারাণসীতে তার পরিচিতেরাও তাকে বর্জন করে চলে। একমাত্র প্রায়-অন্ধ নেড়ুবাবু সোমদেবের দোষ দেখতে পায় না। শর্বাণীর ঘরে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে সোমদেবের দেখা হয়, গল্প হয়। নেড়ুবাবু সোমদেবের প্রস্তাবিত ইলেকট্রিকের দোকানের জন্যে একটা ঘরের সন্ধানে ছিল, আশ্বাস দিল যে সন্ধান পেলেই খবর দেবে। এ-দিকে সোমদেবও ব্যাংকে লোনের দরখাস্ত করে দিল।

সোমদেবের সঙ্গীতচর্চায় মন্দা পড়ল। দেবীজী এক নতুন উপসর্গ জোটাল। আজকাল ঊর্মিলার পূজাপাঠ খুব বেড়ে গিয়েছিল। তার উপরে সে মন্দিরে মন্দিরে ঘোরা শুরু করল। যদি সে একলা ঘুরত তবে সোমদেবের আপত্তি করার কিছু থাকত না, কিন্তু ঊর্মিলা জেদ ধরল সোমদেবও সঙ্গে যাবে। আজ বিশ্বনাথ, কাল সংকটমোচন, পরশু কেদার, পরদিন দুর্গাবাড়ি। বার বার তিথি দেখে ঊর্মিলা সোমদেবকে টেনে নিয়ে চলল মন্দিরে মন্দিরে। ঊর্মিলার কল্যানে নয়, সোমদেবের ধারণায় উৎপাতে। বারাণসীর এত মন্দির সে জীবনে কখনও দেখেনি। এমন এক মন্দির অভিযানে মহাদেও পাণ্ডার সঙ্গে যুগলের দেখা হল। ঊর্মিলা মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দাঁড়াতে বাধ্য হল, কারণ মহাদেও ততক্ষণে সোমদেবের সঙ্গে কি জরুরী কথা শুরু করে দিয়েছিল।

মহাদেও বিদ্রূপ করে বলল, পুণ্য করতে যাচ্ছ সোমদেববাবু? যাও, যাও। অনেক পাপ তো জমিয়েছ পুণ্য করে কাটান দাও।

সোমদেব বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার অযাচিত উপদেশের কোনও দরকার নেই। মামলা লড়ছ, লড়, গায়ে পড়ে উপদেশ দিতে আসছ কেন?

ব্যোম্‌শংকর, মহাদেও ব্যঙ্গ করল, তোমায় উপদেশ দেব সোমদেববাবু? তুমি খলিফা ছেলে। উঃ একেই বলে কলকাত্তাই মাল। ব্যোম্ কালী কলকাত্তাওয়ালী, তার আশ্রয় থেকে আসছ। আমরা হলুম বিশ্বনাথজীর চেলা। তোমার সঙ্গে কখনো পারি? শিবের বুকে পা-টি দিয়ে জিভটি কেটেছ, কালী মা রণে মেতেছ, ঐ যে তোমরা ছড়া বল।

ওসব বাজে কথা রাখ, যত্ত সব ফালতু বাত।

তুমিও বাহাদুর কা খেল দেখাচ্ছ কালীর কৃপায়। ক'দিন এসে কাশীতে দু-দুটো সংসার পেতে বসেছ।

তার মানে?

মানে তোমাকে বোঝাতে হবে? আমি বরং দেবীজীকে বোঝাই। শুনিয়ে দেবীজী, আপনি ফালতু মামলা লড়ছেন · যাকে নিয়ে মামলা লড়ছেন সেই সোমদেববাবু আর একটা সংসার পেতে বসেছে সেই শর্বাণীকে নিয়ে যে রণ্ডীকে আপনি মঠে ঢুকতে দেননি। রামপুরায় ৮০৩ নম্বর বাড়িতে পত্তা নিন।

বেশ উচ্চৈঃস্বরে আধা-সত্য আধা-মিথ্যে খবরটা শুনিয়ে দিল মহাদেও। মনে হল তার কুশ্রী ভঙ্গি দেবীজীর মুখে চাবুক মারল। তার মুখে এক ঝলক রক্ত খেলে গেল। দেবীজী যেন সাময়িকভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তারপর কোন দিকে দৃকপাত না করে হনহন করে মন্দিরের উল্টোদিকে দৌড় লাগাল সোমদেবকে একা ফেলে।

সোমদেব হঠাৎ মহাদেওর মুখে একটি প্রকাণ্ড ঘুষি লাগাল, রক্ত ঝরতে লাগল। মহাদেও উঠে লোকজন ডাকার আগেই সোমদেব সেখান থেকে সরে পড়ল।

আশ্চর্য, উর্মিলা পরে শর্বাণীর ব্যাপার নিয়ে কোনও কৈফিয়ৎ চাইল না সোমদেবের কাছে, কান্নাকাটি করল না, ঝগড়াঝাঁটি করল না। শুধু সে নতুন উদ্যমে প্রেমিকের সঙ্গে মদনরঙ্গে মেতে উঠল। উর্মিলার কামক্রীড়ার আতিশয্যে সোমদেব যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার পাশে শুয়ে শুয়ে সোমদেব মাঝে মাঝে অজগরের স্বপ্ন দেখত, অজগর তাকে নিষ্পেষণে চুরমার করে দেবে, অজগরের মুখটা যেন উর্মিলার মুখ। কখনও স্বপ্ন দেখত সোম শুশুক হয়ে গেছে, উর্মিলার প্রেমসলিলে হাবুডুবু খাচ্ছে। কখনও বা বিশ্রী শবদেহটা তার মনশ্চক্ষে ভেসে যেত, যার গলিত পচা মাংসটা একটা কাক ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। কাকটা আর কেউ না, উর্মিলা—দেবীজী। দূর ছাই! মানুষ কখনও শুশুক হয়? মেয়েমানুষ কখনও অজগর বা কাক হয়? ও সব আরব্যোপন্যাসেই পড়া যায়। স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন কেটে গেলে সে তার প্রেয়সীকে পাশে পায়, যার গভীর আলিঙ্গনে আর প্রেমসমরে সোমদেব বিপর্যস্ত হয়ে পরম দেহসুখ লাভ করে। চৌখাম্বার গ্রন্থালয় থেকে কত রকমারি সংস্কৃত গ্রন্থ আনিয়েছিল উর্মিলা, পঞ্চসায়ক, রতিরহস্য, অনঙ্গরঙ্গ, সুপরিচিত বাৎস্যায়নের কামসূত্র। অনুবাদ নয়, খাস দেবভাষায়, দেবীজী যা পড়ে পড়ে তর্জমা করে দিত হিন্দীতে, বাংলাতে, ইংরেজীতে সোমদেবের কানে কানে। প্রেম-দ্বন্দ্বে কত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কোথায় লাগে বিদেশী যৌনগ্রন্থ, সস্তা সেক্সের কিতাব। উর্মিলার লাইব্রেরী ভরে উঠল খাজুরাহো-কোণারক-ভুবনেশ্বরের দামী দামী মিথুন চিত্রাবলীতে। কিন্তু এতেও বুঝি সোমদেবের পরিতৃপ্তি নেই। ঐ যে স্কুলে কোন সংস্কৃত পাঠমালায় সোমদেব পড়েছিল, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" কাম কখনই কামের উপভোগে শান্ত হয় না। "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।" ঘি ঢাললে আগুন যেমন বেড়ে যায়—ইত্যাদি। কিন্তু উপস্থিত সুখ সোমদেব ত্যাগ করবে না।

সোমদেবের ধারণা হল উর্মিলা আজকাল তুকতাকও আরম্ভ করেছে। অবশ্য প্রশ্ন করলে উর্মিলা অস্বীকার করে। বলে শক্তিবৃদ্ধির জন্যে সে কবিরাজী দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করে শুধু। শরবৎ খেতে বেশ উত্তেজক। একদিন বোধহয় একগ্লাস চায়ের মধ্যে সোমদেব কিসের একটা শিকড় পেয়েছিল। আর একদিন চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখে কপালের এক পাশের চুল যেন ছোট, মনে হয় ঘুমন্ত অবস্থায় কে ছেঁটে ফেলেছে। সে জিজ্ঞাসা করলে

ঊর্মিলা সরাসরি অস্বীকার করে।

সোমদেবের মাথা-ধরা যেন বেড়ে চলেছিল। প্রায় সে মাথার যন্ত্রণার অভিযোগ করত। যখন-তখন সে আপন মনে বিড় বিড় করত। জেগে থাকলেও সে যেন স্বপ্ন দেখত ঐ অজগরের, শুশুক আর শবদেহের। মাথার যন্ত্রণা যখন বেশি হ'ত, সোমদেব ছুটে যেত শর্বাণীর ঘরে। সে শর্বাণীর কোলে মাথা রেখে দিয়ে শুতো। শর্বাণী মাথা টিপে দিলে ভারী আরাম লাগত তার। এক একদিন সে ঐ ভাবে ঘুমিয়ে পড়ত। শর্বাণী কত সময় চুপ করে বসে থাকত, পাছে সোমদেবের ঘুম ভেঙে যায়। রাত্রি গভীর হবার আগে সে সোমদেবের ঘুম ভাঙিয়ে দিত। সোমদেব ফিরে যেত ঊর্মিলার কাছে। ততক্ষণে সোমদেব চাঙ্গা হয়ে উঠত। অনেক রাত্রি অবধি সে আদর করত ঊর্মিলাকে। শর্বাণীর কথা তখন সোমদেবের মনেও পড়ত না। দিন দিন যেন শুকিয়ে যেতে লাগল সোমদেব। ঊর্মিলা অনেক ওষুধ, টনিক, প্রাস খাওয়াল। কিছুতেই কিছু হল না। লণ্ডনের ডনবৈঠকের দাওয়াই বিফল হল। সোমদেব বারাণসীর গলিতে গলিতে, ঘাটে ঘাটে একা একা ঘুরে বেড়াত। না ঊর্মিলা, না শর্বাণী, কারুর কথা সে শুনত না।

সে কিছুদিন সন্দেহ বাতিকে ভুগল। তাব ধারণা হল কে যেন তাকে বিষ খাওয়াচ্ছে। ওষুধ, পথ্য, শরবৎ, প্রাস সে সব ছেড়ে দিল। এমন কি ঊর্মিলার হাতে পর্যন্ত সে খেতে চাইত না। ঊর্মিলা নিজে খেয়ে সেই গ্রাস সোমদেবের মুখে তুলে দিলে তবে সে খেত। একমাত্র শর্বাণীব হাতের বাংলা রান্না সে খেত নির্ভয়ে, তৃপ্তি করে।

এর মধ্যে দুঃসংবাদ দিল বাবু উদয়নারায়ণ উকিল। মামলায় দেবীজীর হার হল। নিম্ন আদালত গান্ধর্ব বিবাহের বৈধতা অস্বীকার করল, ঘোষণা করল ঊর্মিলাদেবী স্রফ ওরফে দেবীজী নৈতিক অনাচারের জন্য দায়ী, মঠ, মন্দির ও বিধবাশ্রমের ট্রাস্টি হবার অনুপযুক্ত, অতএব শ্রীকৌশিকী মঠ মন্দির ও আশ্রমের পাবলিকট্রাস্টের ট্রাস্টি পদ থেকে ঐ রমণী অপসারিত হল, সে স্থলে সরকারী ট্রাস্টি সাময়িকভাবে নিযুক্ত হল। অবশ্য আদালত ট্রাস্টের তহবিল তছরূপ বা বে-বন্দোবস্তের অভিযোগ থেকে প্রতিবাদিনীকে মুক্তি দিল। এক কথায় মহাদেও পাণ্ডার আংশিক জয় হল। যদিও ট্রাস্ট সম্পত্তি সে হাত করতে পারল না, তা দেবীজীর বেহাত হয়ে গেল।

বাবু উদয়নারায়ণ উকিল জানালেন এর মোদ্দা কথা দেবীজীকে মঠ ছাড়তে হবে। দেবীজী নিরাশ্রয়। ভাঙল না দেবীজী, আরও বড় উকিল দিয়ে সে আপীল করল উচ্চতর আদালতে, যার হুকুমে নিম্ন আদালতের রায় স্থগিত রইল। অর্থাৎ মাথার উপর মামলার খাঁড়া ঝুলে রইল। যে কোন সময়ে দেবীজীকে পথে বসতে হবে।

কিন্তু একটি ব্যক্তিগত ঘটনায় ভেঙে পড়ল সোমদেবের মন, চুরমার হল মানসিক ভারসাম্য। তার মূলেও ঐ মহাদেও পাণ্ডা। অবশ্য এতে তাকে দোষ দিতে পারল না,

সোমদেব। একদিন বিশ্বনাথের মুখে তার সঙ্গে সোমদেবের দেখা হল। সকাল থেকে গলিতে গলিতে ঘাটে ঘাটে একা একা ঘুরে তেতে-পুড়ে ছিল সোমদেবের শ্রান্ত দেহ-মন। মহাদেও তাকে দেখে বলল, এ কি সোমদেববাবু, আপনি জুতো পরে ঘুরছেন? আপনার অশৌচ।

তার মানে?

আপনার মা ক'দিন আগে মারা গেছেন।

আমার মা মারা গেছে ?

কেন, তার পান নি? আপনার দাদা আমায় পোস্টকার্ড লিখে খবর জানিয়েছেন। তারের জবাব না পেয়ে, আপনি না যাওয়ায় আমাকে লিখেছেন আপনাকে খবর দিতে।

আমার মা মারা গেছে? অথচ আমি তার পাই নি? যাই খোঁজ করি।

সোমদেব প্রায় ছুটতে ছুটতে মঠে হাজির হল। সাধারণত পিয়ন লল্লনের হাতে চিঠিপত্র দিয়ে যায়। সোমদেব সরাসরি লল্লনকে জিজ্ঞাসা করল তারের কথা।

হাঁ, তার তো এসেছিল! হামি নিয়েছিল।

কি হল সেই তার?

আপ ঘর ছিল না। হামি দেবীজীকে দিয়েছিল।

ছুটে গেল সোমদেব ঊর্মিলার ঘরে। সে তখন ধর্মগ্রন্থ পড়ছিল।

কি ব্যাপার সোম, তুমি এত ব্যস্ত হয়ে কেন?

কোথায় আমার তার? কেন দাও নি আমার তার?

তার?

আকাশ থেকে পড়লে যে? আমার মা মারা গেল, সে তার তুমি চেপে গেলে?

মা কারুর চিরকাল থাকে না। আমার মা-ও মারা গেছেন।

ঊর্মিলা, তুমি মানুষ না রাক্ষসী। তোমার মনে দয়া মায়া মমতা বলে কিছু নেই? আমার মা মারা গেল, সে খবর এল তারে, তুমি সে তার দিলে না, খবর পর্যন্ত চেপে গেলে? কোথায় সে তার?

ঐ টিনের বাক্সটায় আছে। শুধু তার নয়, তোমার মা-র লেখা অনেকগুলো চিঠি। অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে বলল ঊর্মিলা।

মা-র লেখা চিঠি? কই? কোথায়?

সোমদেব ছুটে এসে ঘরের কোণে রাখা ছোট টিনের বাক্স হাতড়ে বার করল সেই তার আর একতাড়া চিঠি যা দিনের'পর দিন সোমদেবের মা লিখেছিল তাকে, অথচ ঊর্মিলা একটাও সোমদেবের হাতে পৌঁছে দেয় নি। চিঠি পড়বার সময় হল না সোমদেবের, শুধু তার পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল, মা-মাগো—ওমা—মাগো। ছোট্ট শিশুর মতো সে

চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

ঊর্মিলা উঠে এসে সোমদেবের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বলল, আমি এসব তোমায় দিই নি। দিলে তুমি আমায় ছেড়ে যেতে।

সান্ত্বনা-সলিলের বদলে যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল সোমদেবের মনে। সে উঠে দাঁড়াল, চিৎকার করে বলল, হারামজাদি, রাক্ষুসি, তুই আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেড়ে নিলি, শেষে আমার মাকে পর্যন্ত খেলি?

সোমদেব আচম্বিতে ধাঁই ধাঁই করে ঊর্মিলাকে লাথি মারতে লাগল। ঊর্মিলা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ডুকরে কেঁদে উঠল। লখিয়াকি মা ছুটে এল, কিন্তু তার সাধ্য কি ক্ষিপ্ত বলিষ্ঠ যুবককে সে সামলায়। তার চিৎকারে লল্লন ও আরও অনেকে ছুটে এল। লল্লন সবল হস্তে রোরুদ্যমানা ঊর্মিলাকে সোমদেবের আক্রমণ থেকে মুক্ত করল। সোমদেব হাতের কাছে যা কিছু জিনিস পেল, ভেঙে তচনচ করল। তাকে সামলানো দায়। ভাঙতে ভাঙতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল, মা—মাগো, ওমা, মাগো বলতে বলতে। খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে সে চলে গেল মণিকর্ণিকার শ্মশান-ঘাটে, মুঠো মুঠো ছাই তুলে নিয়ে সে গায়ে মাথায় মাখতে লাগল, আর টেনে টেনে নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চিৎকার করতে লাগল ঃ ওমা—মাগো, মা—মাগো।

বারাণসীর ঘাটে ঘাটে গলিতে গলিতে উন্মত্ত সোমদেবকে অনেকেই দেখল। সে খালি পায়ে খালি গায়ে ছেঁড়া কাপড় পরে মুক্ত আকাশের নিচে অশৌচ পালন করতে লাগল, থেকে থেকে চিৎকার করে, ওমা, মাগো, মা—মাগো—

তৃতীয় পর্ব

দেবীজী যে ভুল করেছিল, সে তার প্রায়শ্চিত্ত শুরু করল। লল্লন আর তার দলবল পাগল সোমদেবকে ধরে আনল। তারা তাকে মঠে রাখল না, আখড়ার একটি ঘর খালি করে সেখানে আটক করে রাখল যাতে সে পথে পথে ঘুরতে না পারে। তারা সোমদেবকে নিয়মিত পাহারা দিতে লাগল। ডাক্তার এসে কড়া ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। দেবীজী এরপর সোমদেবের চিকিৎসার পুরো ব্যবস্থা করল। কৃতকর্মের অনুশোচনায় দেবীজী সোমদেবের মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করাল এবং বিধিমতে সে সব অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হল, কেবল উন্মত্ত সোমদেব কিছুই জানতে পারল না।

সোমদেব দেবীজীকে দেখলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকত, বিড়বিড় করে কি সব বকত, কিন্তু যেন তাকে চিনতেই পারত না। দেবীজী রামপুরা থেকে শর্বাণীকে আনিয়ে নিল, মঠে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিল একটা ভাল ঘরে, ইচ্ছা, যদি শর্বাণীর

সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হল। সোমদেব শর্বাণীকেও অস্বীকার করল। সোমদেবের ঐ মত্ত অবস্থা শর্বানী সহ্য করতে পারল না, কান্নাকাটি করে অচিরে নিজের রামপুরার বাসায় ফিরে এল।

অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে দেবীজী সোমদেবের পিতার নিকট সবিস্তার পত্র দিল। জেদী পিতা অবাধ্য পুত্রকে ক্ষমা করে কাশী এলেন, পুত্রকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু পিতাকে লক্ষ্য করে সোমদেবের পাগলামি যেন বেড়ে গেল। তখন দুই ডাক্তার দিয়ে পৃথকভাবে পরীক্ষা করানো হল সোমদেবকে এবং তারা রায় দিল সে উন্মাদ। সোমদেবের পিতার অনুমতি নিয়ে বাবু উদয়নারায়ণ উকিল দেবীজীর অর্থব্যয়ে আদালতে দরখাস্ত করে সোমদেবকে উন্মাদের চিকিৎসালয়ে ভর্তির হুকুম আনিয়ে দিল। দুর্গাকুণ্ডের পথে পাগলের হাসপাতালে সোমদেবকে ভর্তি করা হল, এবং তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় দেবীজী নিজের সঞ্চিত স্ত্রীধন থেকে নির্বাহ করতে লাগল। সোমদেবের চিকিৎসার কোন ত্রুটি হল না। এ সব ব্যবস্থার কথা উপলব্ধির মত মনের অবস্থা সোমদেবের ছিল না। মাঝে মাঝে শর্বাণী তার সঙ্গে দেখা করতে যেত কিন্তু মনোকষ্টে ফিরে আসত। ডাক্তাররা দেবীজীকে কিছুতেই সোমদেবের সঙ্গে দেখা করতে দিত না, কেন না কেস হিস্ট্রি পড়ে আর রোগীর লুসিড্ ইনটারভালে কথাবার্তা শুনে তাদের মনে হল সোমদেবের ধারণা সে দেবীজীর জন্যেই পাগল হয়েছে। দেবীজী ইচ্ছা করে তাকে পাগল করেছে। ঐ সময় সোমদেব মাঝে মাঝে দেবীজীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করত।

এই দুর্দিনের মধ্যে আরও একটি দুঃসংবাদ পাওয়া গেল, উচ্চতর আদালত দেবীজীর আপীল নামঞ্জুর করেছে। অর্থাৎ গান্ধর্ব বিবাহ বৈধ বলে সাব্যস্ত হল না। তার ফলশ্রুতি এই যে এতকাল মঠে স্বামী-স্ত্রী রূপে সোমদেব আর দেবীজীর বসবাস দুর্নীতিমূলক, অতএব দেবীজীকে কৌশিকী ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও সেবাইত পদ থেকে অপসারিত করা হল। সরকারী ট্রাস্টি আপাতত মঠের পরিচালনার ভার গ্রহণ করল, আদালত পরে উপযুক্ত ট্রাস্টি নিযুক্ত করবে। কিন্তু মহাদেও পাণ্ডা স্বয়ং ট্রাস্টি বা পরিচালক নিযুক্ত হতে পারল না।

দেবীজী একদিন যে কমলীকে ছাড়তে চাচ্ছিল, ঘটনাচক্রে সে কমলি তাকে ছাড়ল। দেবীজী আর দেবীজী রইল না। হল ঊর্মিলা। অর্থের অনটনে সুপ্রিম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করার প্রশ্নই ওঠে না। দেবীজী একদিন মঠ-বাসিনীদের অশ্রুসিক্ত করে হাসিমুখে মঠ ত্যাগ করে চলে গেল নিজের সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে। নিজের যা অবশিষ্ট সঞ্চিত অর্থ ছিল তাতে একার উদর সংস্থান শক্ত নয়, কিন্তু তার দুশ্চিন্তা হল সোমদেবের চিকিৎসার ব্যয় সংকুলানের জন্যে। সোমদেবের কিছু টাকা ব্যাংকে ছিল। ঊর্মিলা সোমদেবের চেক বই ও অন্যান্য কাগজপত্র নিজের সঙ্গে রাখল।

উকিল উদয়নারায়ণ বলল, আদালতে দরখাস্ত করে ঐ টাকা সোমদেবের চিকিৎসায় ব্যয় করা যায়, কিন্তু ঊর্মিলা রাজী হল না। সে নিজের ব্যক্তিগত খরচার জন্যে সামান্যই ব্যয় করত। কাউকে না জানিয়ে অসিঘাটের উপর সে নামমাত্র ভাড়ায় একটি ঘর ভাড়া করল। কোনও দাসদাসী রইল না। সে নিজে গঙ্গা থেকে বালতি করে জল তুলত, কাপড় কাচত, ঘর ধুতো, বাজার করত, রন্ধন করত। ঊর্মিলার প্রকৃত সন্ন্যাসব্রত শুরু হল। কোন দেবতার সাধনায় নয়, প্রেমিকের রোগমুক্তির কামনায়।

শধু লল্লন তাকে ভুলল না। ঊর্মিলার দুর্দিনে সে তার দেখভাল করতে লাগল।

তারপর বেশ কয়েকমাস কেটে গেল। হাসপাতাল থেকে খবর এল সোমদেব সুস্থ হয়ে উঠছে। ঊর্মিলা এবার ডাক্তারদের অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেল কিন্তু সোমদেব দেখা করল না। আরও কিছুদিন পরে সোমদেব হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে।

যেদিন ছাড়া পেল, লল্লন পহলবানকে সঙ্গে নিয়ে ঊর্মিলা সোমদেবকে আনতে গেল। কিন্তু সোমদেব দেবীজীর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করল। শর্বাণীও হাসপাতালে গেল। সোমদেব তার কুশল জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তার সঙ্গেও ফিরল না। সোমদেব একটা সাইকেল-রিকশার উপর তার সামান্য মালপত্র চাপিয়ে দশাশ্বমেধে একটা হোটেলে একাই আশ্রয় নিল। হোটেলের কর্মচারীদের হুকুম দিল যেন কেউ তার সঙ্গে দেখা না করে।

কিন্তু সোমদেবের মাথায় কেবলই এই চিন্তা ঘুরতে লাগল, সে পাগল হয়েছিল দেবীজীর জন্যে, সে দেবীজীর ব্যবহার একের পর এক পর্যলোচনা করে গেল, তার ভালর দিকে চোখ পড়ল না, শুধু মন্দের দিকটাই প্রকট হয়ে উঠল।

ঘুরে-ফিরে আবার সেই অজগরের চিন্তা তার মাথা গরম করে দিতে লাগল। সে বার বার মনে করতে লাগল অজগর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পিষে চুরমার করে দিতে চায়। সোমদেব অনেক ভেবে-চিন্তে ঊর্মিলার সংস্রব এড়িয়ে গেল। যাকে সে এত ভালবাসত, তাকে সে তত ঘৃণা করতে শুরু করল। তার প্রতি সোমদেবের ক্রোধ জমে উঠল। তপ্ত মস্তিষ্কে সে নিজ জীবনের বিফলতার জন্যে ঊর্মিলাকে দায়ী করল। মাঝে মাঝে ভাবল এই অপকর্মের জন্যে সে ঊর্মিলাকে উচিৎ শিক্ষা দেবে। কিন্তু কি করে?

সারারাত সোমদেব ঘুমোতে পারল না, হোটেলের ঘরে ছটফট করতে লাগল। এখন আর ঊর্মিলার কাছে যাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। বরং তার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, এই জন্য সে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

শর্বাণীর জন্যেও তার বিশেষ কোন দরদ দেখা দিল না। চলতি পথে সাময়িক পরিচয়, তাকে ভুলে যেতে কতক্ষণ লাগে। ভোরের দিকে সোমদেবের তন্দ্রা এল। যখন

ঘুম ভাঙল, সে দেখল সামনে ঊর্মিলা বসে। এই সকালে ঊর্মিলার মুখ দেখে সে বিরক্ত হল। আজকের দিনটা তার খারাপ যাবে, সে ভাবল। কিন্তু এতটা খারাপ যাবে, এ তার স্বপ্নের অগোচরে ছিল।

ঊর্মিলা একটা বাক্স খুলে বলল, সোম, তোমার জন্যে আমি বিশ্বনাথের প্রসাদ এনেছি।

কেন এনেছ? সোমদেব বিরক্ত হয়ে বলল। তুমি অমৃত আনলেও তা বিষ হয়ে যাবে।

আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি সোম, ঊর্মিলা মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি আমায় ভুল বুঝো না সোম, আমি যা করেছি, তোমায় ভালবেসেছি বলে করেছি।

তোমার ঐ বিকট ভালবাসা থেকে আমি মুক্তি চাচ্ছি।

ভালবাসা থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায় সোম? আমি যদি তোমায় ভালবাসি, তুমি মুক্তি পাবে কি করে?

(সোমদেব নিরুত্তর। তার মনে হল আবার অজগরটা মাথা তুলেছে. ঊর্মিলা বাপে তাকে জড়িয়ে ধরতে আসছে।)

তুমি কি জানো সোম, কাশীতে বিধিমতে আমি তোমার মা-র শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেছি। ঊর্মিলা বলল।

ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের দরকার কি? এ আমার কর্তব্য। তোমার বাবা এসেছিলেন আমার চিঠি পেয়ে, মনে হয় তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন।

তিনি করতে পারেন কিন্তু আমি করি নি।

কেন কর নি সোম, আমি কি এমন অপরাধ করেছি? আমি কি তোমায় ভালবাসি নি, তুমিও কি আমায় ভালবাস নি?

(এই রে, সোমদেব ভাবল, আবার অজগর ফোঁস ফোঁস করছে। কাকটা তার গলিত মাংস ঠুকরে ঠুকরে খাবার চেষ্টা করছে।)

সোম, আমি সন্ন্যাসিনীর লাল শাড়ি ছেড়ে ফেলেছি। তুমি যে রঙীন শাড়ি উপহার দিয়েছিলে, আজ আমি সেটা পরে এসেছি। দেখ সোম, দেখ।

(সর্বনাশ, অজগরের চামড়াটা চিকচিক করছে, ভারী সুন্দর চামড়া। অজগরের চামড়ায় জুতো তৈরী হয় না, যেমন গোসাপের চামড়ায় হয়?)

সোম, তুমি চুপ করে আছ কেন? কেন তুমি আমার দিকে দেখছ না? একবার দেখ, একবার আদর করে ডাক. ঊর্মি, ঊর্মিলা, ঊর্মিমালা।

(ইস্ ভারী ফোঁস ফোঁস করছে তো অজগরটা!)

সোম, আমার সোম, আমার প্রিয়তম সোম, আমি তোমার সেই ঊর্মি।

কি বললে? সোমদেব প্রশ্ন করল।

ঊর্মিলা এবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, বিশ্বাস কর সোম, আমি তোমার সেই ঊর্মি, তুমি পায়ে স্থান দাও।

ঊর্মিলা সোমদেবের পা জড়িয়ে ধরল। সোমদেব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জন করে উঠল, তুই অজগর, তুই নাগিনী, তুই কালসাপ, তোকে আমি খুন করব।

সোমদেব ঝাঁপিয়ে পড়ল ঊর্মিলার উপর, দুই সবল হস্তে ঊর্মিলার গলা টিপে ধরল। কিন্তু তার আর্তস্বরে হঠাৎ আবির্ভাব হল লল্লনের। সে দরজার পাশেই অপেক্ষা করছিল। সে ঊর্মিলার জিম্মেদার, সে কিছুতেই ঊর্মিলাকে সোমদেবের সঙ্গে একা দেখা করতে দিতে রাজী হয় নি। সে ঊর্মিলার সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু তার একান্ত অনুরোধে বাইরে দরজার পাশেই অপেক্ষা করছিল। লল্লন উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোমদেবের উপর, একটি কুস্তির প্যাঁচে ঊর্মিলাকে মুক্ত করে সোমদেবকে ধরাশায়ী করল। তারপর রোরুদ্যমানা ঊর্মিলাকে নিয়ে লল্লন দ্রুত বেরিয়ে গেল।

উত্তেজনায়, আঘাতে অবসন্ন হয়ে সোমদেব ঘরের মেঝেয় ঘুমিয়ে পড়ল।

সে স্বপ্ন দেখল একটা অতিকায় অজগর তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তার চাপে হাড়-পাঁজরা যেন চুরমার হয়ে যাবে। সোমদেব প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে। তার ঘুম ভেঙে গেল, সে সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখল সে কঠিন মেঝেয় শুয়ে আছে, তার পাশ শূন্য, এখন তার পাশে নেই সেই সুডৌল নগ্ন বাহু, নেই তুঙ্গ স্তনের চাপ, নেই কোমল অঙ্গের স্পর্শ, নেই রঙীন অধরের চুম্বন, শূন্য, শূন্য, শূন্য, বিরাট শূন্যতা সোমদেবের জীবনে।

সোমদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেই শ্বাস যেন প্রতিধ্বনি তুলল, ঊর্মি, ঊর্মি, ঊর্মিলা, ঊর্মিমালা—

একটু সুস্থ বোধ করে সোমদেব উঠে পড়ল। হোটেলে প্রাতঃকৃত্য সেরে কিছু খাওয়া দাওয়া করে সে বেরিয়ে পড়ল পথে। রূঢ় বাস্তবচিন্তা এখন তার সামনে। পকেটে পয়সা নেই, ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত, কোথায় যায়, কি করে? তার মনে পড়ল, চেক-বই আর অন্যান্য কাগজপত্র ঊর্মিলার কাছে মঠে রয়েছে। সে মঠে গেল না, আর দেবীজীর খপ্পরে সে পড়বে না। সে মুক্ত, স্বাধীন, স্বেচ্ছাধীন।

সে সোজা ব্যাঙ্কে গেল। সেখান থেকে নতুন চেক-বই নিয়ে কিছু টাকা তুলল। ধীরে-সুস্থে ভবিষ্যতের কথা তাকে চিন্তা করতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে বার হতেই মহাদেও পাণ্ডার সঙ্গে তার দেখা হল।

মহাদেও সোমদেবকে সুস্থ দেখে খুশির ভান করল, তারপর বলল, কাল ছাড়া পেয়েছ ভাইটি, সে খবর পেয়েছি।

হুঁ।

আরও শুনেছি হোটেলে ঐ মাগি দেখা করতে গিয়েছিল, তুমি তাকে খেদিয়ে দিয়েছ।

হুঁ।

আমিও তাকে মঠ থেকে খেদিয়ে দিয়েছি। ব্যোম্ শঙ্কর!

তার মানে?

বড় আদালতও রায় দিয়েছে তোমাদের ঐ গান্ধর্ব বিবাহ ঝুট্। ঐ মাগি দুশ্চরিত্রা, মঠ আর বিধবাশ্রম চালানোর যোগ্য নয়। আদালত তাকে হঠিয়ে দিয়েছে ট্রাস্টি থেকে। সরকারী ট্রাস্টি চালাচ্ছে এ সংস্থা। আমার এই আফসোস যে আমি ট্রাস্ট হতে পারলুম না ভাইটি।

চমকে উঠল সোমদেব। ঊর্মিলা আর মঠের ট্রাস্ট নয়? তবে? এসব কথা তাকে মোটেই বলে নি যখন কাল আর আজ সকালে তাদের দেখা হল, ঊর্মিলা ঘুণাক্ষরেও জানাল না সে প্রেমের জন্যে গদিচ্যুত।

দেবীজী কোথায়?

সে খতম হয়ে গেছে আদালতের রায়ে। সে এখন শুধু ঊর্মিলা শ্রীবাস্তব। ব্যোম্ শঙ্কর! বাবা বিশ্বনাথ তার উচিত শিক্ষা দিয়েছে।

কিন্তু কোথায় সে থাকে?

কেউ জানে না। শিউসুরত যেমন গুম খেয়ে গেল, ঐ মাগিও তাই। খোঁজ করে দেখ, হয়তো বেশ্যা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

ঘুষি মেরে মহাদেওর মুখ বন্ধ করে দেবার মত মানসিক শক্তি সোমদেবের নেই। সে নীরবে সেখান থেকে সরে যেতে গেল।

মহাদেও বলল, এ কি ভাইটি চললে কোথায়?

দেবীজীর খোঁজে।

ব্যোম্ শঙ্কর, যে মাগি তোমাকে পাগল করে দিল, তার জন্যে তুমি দেখছি এখন পাগলা হয়ে উঠলে। তোমার এত করেও শিক্ষা হল না ভাইটি? হায় শঙ্কর! মহাদেও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সেটা আন্তরিক কিনা সেটা বোঝার মত মনের অবস্থা সোমদেবের ছিল না।

সোমদেব উৎকণ্ঠার সঙ্গে কৌশিকী মঠে হাজির হল। মঠের হালচাল সব বদলে গেছে। সরকারী ট্রাস্টি মঠ চালনার ভার নেওয়ার পর একজন বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারী সেখানে দপ্তর খুলে বসেছিল। দপ্তরটি এখন আর দোতলায় নয়। একতলায় যে ঘরটিতে সোমদেবরা প্রথমে উঠেছিল। দ্বারী হিসাবে লল্লনের দেখা মিলল না। সেখানে অপরিচিত লোক। ভালই হল, নতুন লোকেরা সোমদেবকে চিনতে পারল না। সোমদেব নিজের পরিচয় দিল না। কিন্তু অনুসন্ধানে তার বিশেষ লাভ হল না। সরকারী কর্মচারীরাও ঊর্মিলা

শ্রীবাস্তবের কোন পাত্তা দিতে পারল না। লল্লন মিশিরও কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তারও কোনও হদিশ ওদের জানা ছিল না। এই জনবহুল বারাণসীতে সোমদেব কোথায় ওদের খোঁজ করবে? সে যখন হতাশ মনে গলিতে বেরিয়ে পড়ল, কে এক রমণী তাকে ডাকল, বাবুজী।

সোমদেব ফিরে দেখে লখিয়াকি মা।

সোমদেবকে দেখে রমণী ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল। সে সোমদেবকে নিয়ে এল মিরঘাটের সিঁড়ির উপর যেখানে সোমদেব প্রথম দেখেছিল দেবীজীকে।

তার মনে পড়ল এক সদ্যোস্নাতা যুবতীকে, পরনে যার রক্তাম্বর, সারা দেহে উথলে ওঠা যৌবন, স্নিগ্ধ রঙ, আলুলায়িত কুন্তল, আয়ত দুই চোখে গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। শূন্য, শূন্য, সবই শূন্য সোমদেবের চোখে।

লখিয়াকি মা সোমদেবকে দেখে সুখী এবং দুঃখী। সুখী এই কারণে যে সোমদেব সুস্থ হয়ে উঠেছে, আর দুঃখী এই জন্যে যে তারই জন্যে দেবীজী আজ নেই।

লখিয়াকি মা যতদূর সম্ভব আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানাল। কি করে দেবীজী সোমদেবের চিকিৎসার ব্যবস্থা করল, মায়ের শ্রাদ্ধ করল, আদালতের পরাজয় মেনে হাসিমুখে মঠবাসিনীদের কাছে বিদায় নিল, এমন কি লখিয়া কী মাকে পর্যন্ত সঙ্গে নিল না, প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করার জন্যে অজ্ঞাতবাসে চলে গেল, এই সমস্ত খবর লখিয়াকি মা জানাল।

কিন্তু কোথায় থাকে দেবীজী?

নহি জানতি হুঁ বাবুজী।

সে আমার কাছে এসেছিল কাল, আমি তাকে এড়িয়ে গেলুম, সে এসেছিল আজ, আমি তাকে খুন করতে গেলুম।

সোমদেবের চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু লল্লন বাঁচিয়ে দিল, সোমদেব বলল। লল্লন নিশ্চয় জানে দেবীজী কোথায় থাকে। কোথায় লল্লন?

ক্যা জানে বাবুজী? লখিয়াকিমা বলল, দেবীজী চলে যাবার পর লল্লনও গায়েব হয়ে গেল।

তবে লল্লনকে খুঁজে বার করি।

লখিয়াকিমা-র কাছে বিদায় নিয়ে সোমদেব সামনে লল্লনের আখড়ায় গেল। যে দু'চারজন সহযোগী ছিল তারা সোমদেবকে সুস্থ দেখে সুখী হল, কিন্তু তারা কেউ লল্লনের পাত্তা দিতে পারল না।

সোমদেব একবার ভাবল কোতোয়ালীতে গিয়ে পুলিস মারফৎ খোঁজ নেয়। কিন্তু

ঐ সব ঝামেলায় সে অভ্যস্ত নয়। মনে পড়ল নেড়ুবাবুর কথা।

সোমদেব নেড়ুবাবুর কাছে উপস্থিত হল। ভদ্রলোক মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কারণ গতকাল ছাড়া পাবার পর সোমদেব তাকে আর শর্বাণীকে বিশেষ আমল দেয় নি।

কিন্তু তাকে তুষ্ট করতে সোমদেবের বিশেষ সময় লাগল না। দেবীজীর কথা উঠতে নেড়ুবাবু জানাল আদালতের রায়ের ব্যাপার তার অবিদিত নয়। কিন্তু সে মহিলা কোথায় থাকে সে খবর নেড়ুবাবুর জানা নেই।

কিন্তু লল্লন কোথা বলতে পারেন?

কি করে জানব? কোতোয়ালীতে খোঁজ নেবেন? পুলিসের কর্তাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে।

শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই করতে হবে।

বেশ, এখন একটু বিশ্রাম করুন, নেড়ুবাবু বলল, শর্বাণী আপনার পথ চেয়ে আছে। কাল আপনি ভালো করে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন না। সে তো কেঁদে কেটে একসা।

তার সঙ্গে পরে দেখা করব। চলুন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালীতে যাই।

দুজনে কোতোয়ালীতে যাবার জন্যে একটা সাইকেল-রিকশায় উঠল। গোধুলিয়ায় ভিড় ঠেলে এগোন কষ্টকর। মাঝে মাঝে রিকশা থেমে যাচ্ছিল। অধীর হয়ে উঠছিল সোমদেব। হঠাৎ তার মাথায় এক ঝলক মতলব এল। সে বলল, দেখুন নেড়ুবাবু লল্লন পহলবান। আমি তাকে জানি ডনবৈঠক কুস্তির মহড়া না করে সে থাকতে পারে না। যদি সে বেনারসে থাকে, তবে নিশ্চয় সে কোনও আখড়ায় যাবে ব্যায়ামের জন্যে। বেনারসের কুস্তির আখড়ার সব ঠিকানা জানা আছে আপনার?

হুঁ, তা আর জানা নেই? আমি কি আজকের লোক মশায়? এতদিন জনসেবা করছি আর আখড়ার খবর রাখব না? চলুন, আগে সে সব জায়গায় লল্লন পহলবানের খোঁজ নিই।

খোঁজ নিতে নিতে বেলা বাড়ল। কয়েকটি আখড়ায় ঘুরে লল্লনের সন্ধান পাওয়া গেল না। ওরা উভয়েই ক্ষুধার্ত। সোমদেব চৌকের কাছে একটি ভোজনালয়ে উভয়ের ভোজনের ব্যবস্থা করল। উদর শান্ত হতে নেড়ুবাবু স্বস্তি বোধ করল। সে বলল, আরে মশায়, আমার বাড়ির কাছে একটি আছে, সেটারই খোঁজ নেওয়া হয় নি। নেড়ুবাবু চৌষট্টিঘাটের কাছে একটি আখড়ায় সোমদেবকে নিয়ে এল। তখন ব্যায়াম-চর্চার সময় নয়। কিন্তু পরিচালককে খুঁজে বার করল নেড়ুবাবু। লোকটি জিজ্ঞাসা মাত্রই বলল, আলবাৎ, লল্লন পহলবান্‌কো পহচানতা হুঁ।

সে আরও জানাল, লল্লন কিছুদিন যাবৎ ঐ আখড়ায় পাঁয়তারা কসে। কিন্তু তার পাত্তা জানা নেই। সে গঙ্গামণ্ডল ঘাটের কাছে কোথাও থাকে। সে মানমন্দির ঘাটে লুরখুর মাঝির সঙ্গে কয়েকটা নাও আর বজরার বন্দোবস্ত করেছে, সেগুলি খাটিয়ে কিছু

রোজগার করে। তবে বাবুজীরা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয়তো লল্লনের দেখা মিলতে পারে, কেন না রোজ সকালেই সে ঐ আখড়ায় ব্যায়াম করে।

কিন্তু অপেক্ষা করার সময় নেই। নেড়ুবাবুকে ছেড়ে দিয়ে সোমদেব একাই মানমন্দির ঘাটে এল। লুরখুর মাঝিকে খুঁজে পেতে দেরি হল না। মাঝি বলল, হ্যাঁ লল্লম পহলবান কা পতা ম্যায় জানতা হুঁ।

কোথায়? কোথায় সে থাকে?

গঙ্গামণ্ডল ঘাটমে। অস্‌সীকে নজদিক্।

আভি চলো উঁহা।

একটা ছোট নৌকা নিয়ে লুরখুর সোমদেবকে গঙ্গামণ্ডল ঘাটের দিকে নিয়ে চলল। স্রোতের বিপরীতে নৌকা যেন চলে না। ঘাটগুলি আর সরতে চায় না। উদ্‌গ্রীব সোমদেবকে শান্ত করে লুরখুর গঙ্গামণ্ডল ঘাটে নৌকা ভিড়াল। দুজনে একটা ছোট একতলা বাড়িতে গেল। লল্লন সেখানেই ছিল।

লল্লন ওদের দেখে অবাক হল। তারপর সকালের ঘটনা মনে পড়ায় সে কিছুটা ব্যস্ত হল।

সোমদেব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে লল্লনকে জড়িয়ে ধরে বলল, লল্লন ভাই, সকালে যা ঘটেছে তা ভুলে যাও। কোথায় দেবীজী আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।

লল্লন দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলল, নেহি বাবুজী।

কিঁউ?

উত্তর দিতে সংকোচ করল লল্লন। কিন্তু সোমদেবের আতিশয্যে সে যা বলল তার সারমর্ম এই—

অভিশপ্ত প্রেম দেবীজীর। সন্ন্যাসিনী সে। কিন্তু সন্ন্যাসকে মেনে নিতে পারেনি। সে উমাশঙ্করকে প্যার করত। কিন্তু উমাশঙ্কর জবরদস্তি করে তার দেহকে পেতে চাইল। লল্লন বাধা দিল। অপমান করল তাকে। উমাশঙ্কর ক্ষোভে আত্মহত্যা করল। অহল্যার মত পাথর হয়ে গিয়েছিল দেবীজী। কিন্তু সোমদেবকে দেখা মাত্র সে মানবী হল। মেতে উঠল সে বাবুজীর প্রেমে। কিন্তু এই অভিশপ্ত প্রেমে তার ইজ্জত গেল, দৌলত গেল, এমন কি জান পর্যন্ত যেতে বসেছিল। এমনকি বাবুজীও দেওয়ানা হয়ে গেল! সবই নসীব, সবই বাবা বিশ্বনাথজীর হাত। কিন্তু বরাতক্রমে লল্লন শেষ অবধি দেবীজীকে বাঁচাতে পেরেছিল। আজ সকালেই আর্তনাদ শুনে ঘরে না ঢুকলে দেবীজী খতম হয়ে যেত। বাবুজী যেন আর দেবীজীর চিন্তা না করে। নিঃস্ব, রিক্ত, ভিখারিণী দেবীজী, কিন্তু এখন সে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে। বাবুজী যেন তার নয়ী সাধনায় বিঘ্ন না ঘটায়। বাবুজী মুলুক ফিরে যাক। সেখানে আবার কাজকর্ম শুরু করুক, বিয়ে-সাদি করুক।

সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক, বারাণসীর দুঃস্বপ্ন যেন কেটে যায়। রাম রাম বাবুজী, ব্যস্ কিজিয়ে।

কিন্তু সোমদেব কিছুতেই লল্লনকে রাজী করতে পারছে না।

লল্লন বলল, আপ ঘর ওয়াপ্‌স্ যাইয়ে বাবুজী, ইয়ে আরজ্ আপ্‌সে।

না, আমি যাব না, সোমদেব বলল, আমি তোমার ঘরে না খেয়ে-দেয়ে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব, শুকিয়ে মরব, যতক্ষণ না তুমি দেবীজীর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও।

লল্লন নেপথ্যে লুরখুরের সঙ্গে কি পরামর্শ করল। তারপর দুজনে মিলে ফিরে এল। লল্লন বলল, বেশ, এত তকলিফের কারণ নেই। বাবুজী এখন হোটেলে ফিরে যান। দেবীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর ইচ্ছা লুরখুর মারফৎ আজ রাত্রে সোমদেবকে জানানো হবে।

লুরখুর মাঝি নৌকা করে সোমদেবকে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছে দিল।

হোটেলে ফিরে সোমদেব দেখল শর্বাণী তার জন্যে একাকী অপেক্ষা করছিল। নেড়ুবাবুর কাছে সোমদেবের বাসস্থানের খবর পেয়েই শর্বাণী ছুটে এসেছিল। সোমদেব লক্ষ্য করল, শর্বাণীর শ্রী ফিরে এসেছে, নতুন এক দীপ্তিতে তার সারা দেহ দেদীপ্যমান।

শর্বাণী দেবীজীর সংবাদ জানতে চাইল। সোমদেব সকালের সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কথা বাদ দিয়ে যতটা পারে শর্বাণীর কৌতূহল চরিতার্থ করল।

শর্বাণীই জানাল দেবীজীই তাকে মঠে নিয়ে গিয়েছিল সোমদেবের শুশ্রূষার জন্যে। কিন্তু সোমদেব তখন তাকে চিনতে পারে নি। সোমদেব দুঃখ প্রকাশ করল। শর্বাণীর নিজের খবর জানতে চাইলে সে বলল, নার্সিং শিখছি, তাছাড়া এক ধনী বিধবার রান্নার কাজে বহাল হয়েছি। পেট চলে যাচ্ছে।

কিন্তু ওদের কথাবার্তা বেশীদূর এগুল না। সোমদেবের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে শর্বাণী প্রণাম করে বলল, আসি দাদা বুঝতে পারছি তুমি দেবীজীর জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছ।

শর্বাণী চলে গেল। সোমদেবের সময় আর কাটে না। রাত্রি হতে না হতে সোমদেব মানমন্দির ঘাটে লুরখুরের খোঁজ করল। কিন্তু সে তখন সেখানে ছিল না।

সোমদেব বার বার ভাবতে লাগল শেষ পর্যন্ত তাকে এড়াবার জন্যে লল্লনও গা-ঢাকা দেবে না তো? এবার লোকটি স্বেচ্ছায় লুকিয়ে থাকলে তাকে খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সোমদেব নিরুপায় হয়ে ঘাটে পায়চারি করতে লাগল।

দীর্ঘ সময় বাদে গঙ্গামণ্ডল ঘাটের দিক থেকে লুরখুরের নৌকা এল। অধীর আগ্রহে সোমদেব তাকে পাকড়াল। দেবীজী কোথায়?

লুরখুর বলল, তা জানি না, লল্লন কোনও পাত্তা দিল না।

তবে?

আমাকে বলেছে আপনাকে বজরায় তুলে আদি-কেশব ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে!

সেখানে কি দেবীজীর দেখা পাব?

জানি না।

ব্যাপারখানা কি? সোমদেব লল্লনের রহস্য বুঝতে পারল না। হঠাৎ উমাশংকরের কথা মনে পড়ল। লোকটা নাকি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল, না, লল্লনই তাকে সরিয়ে দিয়েছিল ইহলোক থেকে। কে জানে? লল্লন কি সোমদেবকেও ইহলোক থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত করছে? কি করা যায়?

সে কি নির্ভয়ে লুরখুরের সঙ্গে বজরা চড়ে একা যাবে? শবরের বাইরে অন্ধকার নদীতীরে লল্লন আর মাঝি-মাল্লারা যদি তাকে মেরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়, তবে কেউ জানতে পারবে না তার মৃত্যুর কথা। সোমদেব পালিয়ে যাবে। কিছুতেই এই ফাঁদে পা দেবে না।

লুরখুর বলল, বাবুজী, বজরা তৈয়ার হ্যায়। আপ উঠিয়ে।

কিন্তু সোমদেব পালাতে পারল না, মন্ত্রচালিতের মত বজরায় উঠল। ঘড়িটা দেখার মত মনের অবস্থাও তখন তার নয়।

স্রোতের মুখে বজরা দ্রুত ভেসে চলল। অন্ধকার রাত। ঘাটে ঘাটে দু'চারটি আলো মিটমিট করছিল। সমস্তটাই যেন রহস্যমণ্ডিত।

সোমদেব যতই লুরখুরের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করল, ততই সে এড়িয়ে গেল সোমদেবকে। দেবীজীর কথা জিজ্ঞাসা করতে মাঝির একটাই উত্তর, নেহি জানতা হুঁ।

তবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?

যেখানে হুকুম আছে।

কার হুকুম?

লল্লনের।

এবার সন্ত্রস্ত হল সোমদেব। সে বিরক্ত হয়ে বলল, এ সব রহস্যের মানে কি?

নেহি জানতা হুঁ, লুরখুরের উত্তর।

ফেরাও বজরা, সোমদেব দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আমি লল্লনের ফাঁদে পা দেব না, ফেরাও বজরা।

হুকুম নেহি।

আমি হুকুম দিচ্ছি।

মাঝিরা নির্বিকার, নিরুত্তর। বজরা তীর থেকে মাঝদরিয়ায় ভেসে চলল।

সোমদেব বলল, আমি চিৎকার করব। পুলিশ ডাকব।

মাঝিরা সে ভয়েও কম্পিত নয়। বজরা চলতে লাগল। সোমদেব জানে, এই অন্ধকারে চিৎকার করা বৃথা। সে এক-বার ভাবল গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, বহুকালের অনভ্যাস. সাঁতারে দম থাকবে না, এই অন্ধকারে মাঝ নদীতে ডুবে মরবে। বাধ্য হয়ে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের রহস্যের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে বসে রইল।

একটা ট্রেন চলে গেল ব্রীজের উপর দিয়ে, নিস্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে। দু'চারটে মোটরের হেডলাইট ছুটে চলেছে ব্রীজের উপর তলায়।

বজরা ব্রীজের নিচ দিয়ে চলে গেল। এখানেও চিৎকার করলে ব্রিজের উপর থেকে কেউ শুনতে পাবে না।

আদিকেশবের আলোও দূরে ঝাপসা হয়ে গেল। ব্রীজটার আকারও কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। ফাঁকা জায়গায় কুয়াশা যেন ঘনীভূত হয়ে উঠল। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ নৈশব্দ্য ভাঙছিল।

সোমদেব পাথরের মূর্তির মত ছাদের উপর বসে রইল।

এবার লুরখুর বলল, জাড়া পড়েছে, আপনি কামরার মধ্যে বসুন।

না, বেশ আছি এখানে।

নহি, আপনি কামরার মধ্যে থাকুন। হুকুম আছে।

কার হুকুম?

লছমনের।

যদি না যাই?

তবে জোর করব।

বেশ, আমি কামরায় যাচ্ছি।

পালাবার চেষ্টা করবেন না। চেষ্টা করলেও অচেনা জায়গায় পালাতে পারবেন না।

না, দৃঢ়কণ্ঠে সোমদেব বলল, ভয়ে পালাব না, মরদের মত এই খেলার শেষ পর্যন্ত দেখব।

শাবাশ, লুরখুর তারিফ করল।

বজরা কুয়াশার মধ্যে একটা অচেনা জায়গায় বাঁধা হল। কামরার জানলা দিয়ে সোমদেব দেখার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। মাঝিরা বজরা ছেড়ে নেমে গেল। এই সুযোগে সোমদেব পালাবার মতলব করছিল, এমন সময় একটি ছায়ামূর্তি দ্রুতপদে তীর থেকে নেমে এসে বজরার কামরায় প্রবেশ করল। ঘাতক নাকি! এই অন্ধকারে তাকে হত্যা করলেও কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু ছায়ামূর্তি তো লছমনের মত বলিষ্ঠ দীর্ঘ নয়?

কে? কি চাও? ত্রস্তকণ্ঠে সোমদেব প্রশ্ন করল।

ছায়ামূর্তি নিরুত্তর. সে কাছে আসতে সোমদেব দেখল তার আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। ছায়ামূর্তি ধীরে চাদর খুলে ফেলল। সে আর কেউ নয়. দেবীজী। তখন আর সে লাল শাড়ি পরেনি. অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল. সোমদেবের দেওয়া শাড়িখানি তার পরনে।

বিস্মিত পুলকিত সোমদেব অস্ফুট কণ্ঠে বলল, দেবীজী!

ঊর্মিলা বলল, দেবীজী মরে গেছে। তার দেহটা এখনও টিকে আছে। তুমি ঠিকই করছিলে বাবুজী, আজ সকালে তার দেহটাকেও খতম করে দিচ্ছিলে। দেবীজীর এই ছিল উপযুক্ত পরিণতি, তার দম্ভ, তার অহঙ্কার, তার লোভ, তার লালসার যথার্থ শাস্তি। আদালত তার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। তুমি তাকে ত্যাগ করেছ, এমন কি খতম করতে চেয়েছ, সেই তার প্রকৃত দণ্ড।

গঙ্গার স্রোতের মত অবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলল দেবীজীর কথার ধারা। সোমদেব কোন জবাব দেবারই সুযোগ পাচ্ছিল না।

দেবীজী বলল, এই দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব। লল্লন আমাকে বাঁচিয়েছে। সে আমার জিম্মেদার। সে আমাকে নিজের মুন্নির মত ভালবাসে। সে ঠিকই বলেছিল, আমার প্রেম অভিশপ্ত! আমি সেই প্রেমে আর কাউকে জড়াতে চাই না। বাঁধতে চাই না। তুমি আজ মুক্ত, স্বাধীন।

কিন্তু—সোমদেব কি বলতে গেল।

দেবীজী বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু আমিই তোমায় এখানে এনেছি। আমার হুকুমে লল্লন লুরখুর মাঝিকে দিয়ে আনিয়েছে। আমি শহরের ভিতর দিয়ে এসে আগেই তোমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলুম। লল্লন কাছেই আছে। আমার আওয়াজ পাবে না। সে জানে না কেন এখানে এসেছি।

আমায় কিছু বলতে চাও? সোমদেব বলল।

আমার কথা এখনও শেষ হয় নি, আর কথা বলবার সময় পাব না। এইখানে এই বজরার কামরায় তোমায় প্রথম পেয়েছিলুম। এইখানেই হবে তোমার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ।

সে কি! এ কখনো হতে পারে না। সোমদেব বলল কাতর কণ্ঠে।

এই হবে সার্থক পরিণতি, দেবীজী বলল। সে হঠাৎ বস্ত্রের মধ্য থেকে স্প্রিং দেওয়া ছোরাটা বার করল, বোতাম টিপতেই ঈষৎ আওয়াজ দিয়ে ফলাটা খুলে গেল। আধ-অন্ধকারে দেবীজীর হাতে শানিত ফলা ঝিকঝিক করতে লাগল। সে দৃঢ়মুষ্ঠিতে সেই ছোরা ধরে রইল। কি মতলব তার? সে কি ঐ ছোরা শেষে সোমদেবের বুকে বসিয়ে দেবে?

ভাবল সোমদেব।

দেবীজী উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে লাগল, আজ আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। যে দেহকে তুমি নিজের হাতে খতম করতে গিয়েছিলে, কিন্তু পারনি, আজ আমি তা আমার প্রেমের দেবতার সামনে বলিদান দেব নিজের হাতে।

দেবীজী নিমেষের মধ্যে উদ্যত শানিত ফলা নিজের বুকের উপর বসিয়ে দিল, চকিতের মধ্যে সোমদেব তার হাত ধরে ফেলল, কিন্তু ছোরার আঘাতে দেবীজীর বুক থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। সে টলে পড়ল।

সোমদেব তাকে তুলে ধরে উদ্‌ভ্রান্তের মত আর্ত চিৎকার করল, ঊর্মি, ঊর্মি, ঊর্মিলা, ঊর্মিমালা।

তার আর্ত চিৎকারে ছুটে এল লল্লন, লুরখুর ও অন্যান্য মাঝিরা। তাদের পায়ের চাপে বজরা দুলতে লাগল। একজন লণ্ঠন জ্বালাল। সেই আলোয় সোমদেব দেখল, মূর্ছিতা দেবীজী, নিঃসাড়, নিস্পন্দ, শুধু দ্রুত শ্বাস পড়ছিল আর বক্ষের বস্ত্র ভেদ করে রক্ত পড়ছিল। কঠিন কণ্ঠে লল্লন কৈফিয়ত চাইল। দু'চার কথায় সোমদেব সমস্ত ব্যাপার বলতে লল্লন নরম হল। চিন্তান্বিত কণ্ঠে মাঝিদের হুকুম দিল তুরন্ত বজরা ফেরাতে।

বজরা ফিরল।

লল্লন ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি হবে বাবুজী? আমার মুন্নি বাঁচবে তো?

সোমদেব বলল, তোমার মুন্নি, আমার ঊর্মি বাঁচবে, তাকে বাঁচতেই হবে।

সে পতিত ছোরাটার দিকে চেয়ে বলল, দেখ লল্লন, ছোরাটায় রক্তের দাগ সামান্যই লেগে আছে। তার মানে এর ক্ষত গভীর নয়। শুধু উত্তেজনায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছে ও।

সোমদেব রক্ত বন্ধ করার জন্যে নিজের কাপড়ের কোঁচা দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরল।

লল্লন দেবীজীর মাথায় শীতল জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

কিছু পরে ঊর্মিলার জ্ঞান এল। লণ্ঠনের আলোয় সে দেখল সোমদেবকে, দেখল লল্লনকে।

লল্লন আনন্দে ডাকল, মুন্নি, আমার মুন্নি।

স্মিত হাসি ফুটে উঠল ঊর্মিলার অধরে।

সোমদেব আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, ঊর্মি, ঊর্মিলা, আমার ঊর্মিলা।

কোন জবাব দিল না ঊর্মিলা, শুধু তার বেপথু বাহু দুটি তুলে সোমদেবের কণ্ঠ বেষ্টন করল

সহসা সোমদেবের মনে হল এ অজগরের কঠিন নির্মম দম বন্ধ করা পাশ নয়, এ যেন ফুলডোরের মৃদু, কোমল, সুবাসিত প্রাণ-জুড়ানো স্পর্শ।

প্রলয়ংকরী

নরেশকুমার স্বাবলম্বী যুবক। গ্রাম থেকে শহরে এসে চাকুরির ধান্দায় বহু জায়গায় ধর্ণা দিয়ে সে হতাশ হল, কিন্তু দমে গেল না। ধার দেনা করে সে একটা ছোটখাটো কারবার ফেঁদে বসল। অর্ডার সাপ্লাই। নিজের পরিশ্রমে তার কারবার ফেঁপে উঠল। সে একটা মাঝারি গোছের মনিহারি দোকান বসাল। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে পত্র মারফৎ যোগাযোগ করে সে বিয়ে করল। তার স্ত্রী নমিতা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী নারী। সুদূর পল্লীগ্রামে বৃহৎ পরিবারে সে মানুষ হয়েছিল। বিয়ের পর সে স্বামীর সঙ্গে শহরেই বসবাস শুরু করল। তার লেখাপড়া বেশীদূর নয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের অশিক্ষিত-পটুত্ব তাকে হার মানতে দিল না। সে পতিগৃহে একাই রাণীর মতো রইল।

পতিগৃহ বলতে একটি ফ্ল্যাট, দোতলায় বড়সড় একখানি মাত্র ঘর। পার্টিশান করলে অনায়াসে তাকে দুটি ঘর করা যায়. কিন্তু নরেশ-দম্পতি তা করল না। ঘরের পাশে একটি বারান্দা। ঘরের সংলগ্ন রান্নাঘর আর স্নানের ঘর। এই ফ্ল্যাটটিকেই নমিতা ছিমছাম সাজিয়ে করে রেখেছে। ঘরটি ডবল বেড খাট, ড্রেসিংটেবল, আলনা, আলমারি, সোফা-সেটিতে ঠাসা, কিন্তু সে সবই রুচিসঙ্গতভাবে সাজানো। বারান্দায় ফুলের টব।

শহরের জনারণ্যে নমিতা নিজেকে একা মনে করে। বৃহৎ পরিবারে অনেকের মধ্যে সে বড় হয়েছে। কিন্তু পতিগৃহে শুধু দুজন, স্বামী আর স্ত্রী। তাও স্বামী অধিকাংশ সময় কারবার নিয়ে ব্যস্ত। প্রতিবেশীরাও ঠিক আলাপ করতে উৎসুক নয়। যে যার নিজেরটি নিয়েই মত্ত। স্ত্রীর চিত্তবিনোদনের জন্যে নরেশ মাঝে মাঝে তাকে সিনেমায় নিয়ে যায়, একেবারে হোটেলে নৈশভোজ সেরে ফেরে। একদিন অপরাহ্ণে কর্মচারীদের উপর দোকানের ভার দিয়ে নরেশ ঘরে ফিরল। উদ্দেশ্য, স্ত্রীকে নিয়ে 'মুনশাইনে' সিনেমা দেখতে যাওয়া।

তখন সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা বাজে। নমিতা ঘরোয়া শাড়ী পরে ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধনে রত। তার ব্যস্ততার লক্ষণ নেই। নরেশ কিন্তু ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল আর ছটফট করছিল। সে নিজে পোশাক বদলে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত। নরেশ ব্যস্ত হয়ে স্ত্রীকে তাড়া দিল, নাও, নাও, শীগগির নাও। 'মুন্‌শাইন্‌' সিনেমা এখান থেকে খানিক দূর। যেতেও কিছু সময় লাগবে।

প্রসাধন-রতা নমিতা ঝংকার দিয়ে উঠল, হয়েছে, একটু চুপ করে বোস। সাজ-গোজের সময় বিরক্ত করা আমার ভারী খারাপ লাগে।

নরেশ হতাশ হয়ে বলল—বেশ, না হয় বসছি। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড বসে ঘন ঘন

ঘড়ি দেখে সে বলে উঠল, ইস্, ছ'টা বাজতে বিশ মিনিট। যেতে যেতে শো আরম্ভ হয়ে যাবে।

—বাজুক ছ'টা। তাই বলে আমি ভূত সেজে সিনেমায় যেতে পারব না।

—উঃ! কতক্ষণ লাগে সাজগোজ করতে? আধঘণ্টা কেটে গেল, তবু তোমার মেক্-আপ্ সারা হল না? এখনও শাড়ী বদলানো বাকী!

—সাজগোজের তোমরা কি বুঝবে? এতই যদি তাড়া, যাও না কেন একা সিনেমায়।

—বাপ রে! তাহলে তো গৃহযুদ্ধ বেধে উঠবে। ক'দিন ঘরে তিষ্ঠতে পারব না।

—যাক, আর কথা নয়। আর একটুর মধ্যেই আমি ড্রেস করে নিচ্ছি।

নমিতা প্রসাধন সেরে উঠে পড়ল, আলমারি থেকে দু-তিন খানা রঙীন শাড়ী বের করে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল—কোন্ শাড়ীটা পরি বল তো?

—ঐ নীলটা। নীলশাড়ীতে তোমায় মানায় ভাল।

—হুঁঃ, তোমার যেমন টেস্ট! সন্ধ্যেবেলায় ঐ রঙ আবার মানায় নাকি? তার চেয়ে এই রঙটা ভাল।

—যেটা হোক একটা পরে নাও। এদিকে ছ'টা বাজতে দশ মিনিট। শো শুরু হয়ে যাবে।

—বাবা-বাবা! কেবল তাড়া!

নমিতা একটি শাড়ী নিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলো। নরেশ বিরক্ত হয়ে বলল—কি হল?

—নাঃ, এই রঙটা ভাল লাগছে না, ঐটাই পরি।

আর একটি শাড়ী নিয়ে এগিয়ে গিয়ে নমিতা আবার ফিরল।

নরেশ প্রশ্ন করল—ইস্, আবার কি হল?

—আঃ, সবেতে তাড়া। দেখছ, ব্লাউজটা ম্যাচ্ করছে না।

নমিতা আলমারি হাতড়ে ব্লাউজ খুঁজতে লাগল। নরেশ রাগতস্বরে বলল—থাক বাবা, আর সিনেমায় গিয়ে কাজ নেই।

—হুঁঃ! টিকিট দুটো নষ্ট হবে? তোমার যেমন কথা! আমি এখনই তৈরী হয়ে নিচ্ছি। নমিতা বাথরুমে ঢুকল।

দেখতে দেখতে ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল। নরেশ ইতস্তত করে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল—কি গো, হল?

দরজার ওপাশ থেকে নমিতা ঝংকার দিয়ে উঠল—হল, হল? আর হল হল করো না বলছি। একটু সবুর কর।

নরেশ হতাশ হয়ে সোফায় বসে পড়ল। কিন্তু সে তখন জানতো না মূর্তিমতী আপদের মতো এক প্রলয়ংকরী রমণীর আবির্ভাব হবে, যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার উপক্রম করবে, নরেশের ক্ষুদ্র শান্তির সংসারে অশান্তি ডেকে আনবে।

সেই রমণী তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিতা, প্রৌঢ়া, শুচিবায়ুগ্রস্তা, মুখরা, ধড়িবাজ শ্রীমতী ক্ষান্তমণি দেবী, যার আকস্মিক আবির্ভাব হল নরেশের ফ্ল্যাটে। সঙ্গে বুদ্ধি মতী সুন্দরী, তন্বী, তরুণী কন্যা সুরমা।

ক্ষান্তমণির স্বামী হারাণচন্দ্র একটি বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত, সাদাসিধে লোক, স্ত্রীর দাপটের কাছে বিনম্র। দুর্দিনের বাজারে দীর্ঘকাল ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালা হারাণকে সপরিবারে উচ্ছেদ করে দিয়েছিল আইন-আদালত করে, পুলিশের সাহায্য নিয়ে। সামান্য বাক্স পেঁটরা সঙ্গে করে হারাণ সপরিবারে এই ফ্ল্যাট-বাড়িতে ঘরের সন্ধানে এসেছিল। কিন্তু সে নিরাশ হল। একটা সাময়িক আস্তানা জোটাবার মতো সামর্থ্যও নেই তার। ক্ষান্তমণি ভরসা দিয়ে বলল—কুছ পরোয়া নেই। তোমার পণ্ডিতির মুরোদ তো জানা আছে, এবার মুখ্যু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি দেখ। যেমনটি বলব, ঠিক তেমনটি করবে।

হারাণ বলল, তথাস্তু। কিন্তু শেষে একটা বিপদ বাধিও না।

ক্ষান্ত ঝঙ্কার দিয়ে বলল—ফুটপাতে বাস করার চেয়ে আর বিপদ কি হতে পারে? একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যদি ক'দিন কোঠাবাড়িতে বাস করা যায় মন্দ কি?

কন্যা সুরমা সায় দিয়ে বলল—মা ঠিক বলেছে। তুমি থাম বাবা, আমরা যাহোক একটা আস্তানা যোগাড় করে নেব। সেটা অন্তত ফুটপাতের চেয়ে ভাল হবে।

একটু অনুসন্ধান করে তারা এই ভাড়াটে বাড়িটার সন্ধান পেল। কিন্তু ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একটা চাকরের মতো ছোকরা তাদের বিমুখ করল। সে জানাল, ঐ বাড়িটায় তিল ধারণের স্থান নেই। তবু ওরা তাকে জেরা করতে লাগল।

এদিকে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। কোথায় যাওয়া যায়? মা আর মেয়ে পরামর্শ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পড়ল। মেয়ে চাকরটিকে বলল—দোতলার সামনের ফ্ল্যাটে মালপত্তর বয়ে নিয়ে আসতে। হারাণ মালের খবরদারি করতে লাগল। মা আর মেয়ে হালকা মাল নিয়ে সরাসরি দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে এলো, সেটি ভাগ্যচক্রে নরেশেরই ফ্ল্যাট। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই চিরপরিচিতার মতো ক্ষান্তমণি নরেশকে সম্বোধন করল—এই যে আমাদের জামাইবাবাজী!

সুরমা মিষ্টি করে সায় দিল—ওমা! জামাইবাবুই তো!

নরেশ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আপনারা?

ক্ষান্ত বলল, তা বাছা, আমাদের চিনবে কি করে বল? বিয়ের পর তো আর দেখনি। আমি তোমার বউয়ের ক্ষান্তমাসী। এই আমার মেয়ে টেঁপি—

মেয়ে তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিল, মিস্ সুরমা দেবী।

ক্ষান্ত বলল, ঐ হল গিয়ে। আমাদের বোঁচা কই?

নরেশ প্রশ্ন করল—বোঁচা আবার কে?

—ঐ যে গো, তোমার পরিবার।

—কে? নমিতা?

—তোমাদের এসব ঢংয়ের নাম জানি নে, বাছা। যাকে তোমরা নমিতা বল, তাকে আমরা বোঁচা বলেই ডাকি।

সুরমা বলল—তুমি থাম, মা। ওসব খারাপ নাম কি জামাইবাবুর কাছে বলে? দিদি শুনলে লজ্জা পাবে।

—তুই থাম টেঁপি, আমার ওপর আর মাস্টেরি করিস নি। তা, হ্যাঁ গা বাছা, বাড়িতে কুটুম এল একটু বসতে বললে না? এ কেমন ব্যাভার?

—তুমি যেন কি, মা। জামাইবাবু কি আমাদের পর, যে খাতির-যত্ন করবে? তুমি বসো না ঐ খাটে।

—না, মা। কি সব নোংরা বিছানা! শুদ্দু না করে কি ওসব ছুঁতে আছে? আমি এই কাঠের চেয়ারটায় বসি।

সে জাঁকিয়ে বসল, কিন্তু নরেশ তাদের ভাগাবার উদ্দেশ্যে বলল—আমরা কিন্তু এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি সিনেমায়।

—কি বই জামাইবাবু? সুরমা আবদার করে বলল—বা রে বা, শুধু দিদিকেই সিনেমায় নিয়ে যাওয়া হবে, আর আমি বুঝি বাদ পড়ে যাব?

—আরে, আমাদের জামাই কি অমন ছেলে? দু'দিন সবুর কর, তোকেও ঠিক নিয়ে যাবে।

নরেশ বলল—কিন্তু মাপ করবেন, আমি আপনাদের পরিচয়ই—

—জানবে কি করে? পরের ছেলে। কথায় বলে, জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা। বোঁচাকে ডাক, সে এখনি তার ক্ষান্ত মাসীকে চিনে ফেলবে। বঁচু, ও মা বঁচু—

—দিদি—ও দিদি—

নরেশ বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে বলল—ওগো শুনছ?

ওধার থেকে নমিতা বলল—হয়ে গেছে, আর দু'মিনিট।

নরেশ হতাশ হয়ে বলল—হয়ে গেছে! একেবারে হয়ে গেছে! তুমি একবার বেরিয়ে এসো।

নাউ রেডি বলে নমিতা বেরিয়ে এলো, আগন্তুকদের দেখে সে বিস্মিত হল।

ক্ষান্ত গদগদ হয়ে বলল—এই যে মা, বঁচু—

নমিতা প্রশ্ন করল—আপনারা কাকে চাচ্ছেন?

—ওমা কি ঘেন্নার কথা! আকাশ থেকে পড়লি যে! তোর ক্ষান্তমাসীকে চিনতেই পারলি না? আজকালকার মেয়েগুলো হল কি? ওরে ও টেঁপি, কোনদিন শুনব তুইও তোর মাকে চিনতে পারছিস না।

—তুমি চুপ কর মা। দেখছ না দিদি কতদিন বাদে দেখছে।

—তা বটে। আমি বাছা, তোর ক্ষান্তমাসী, মা-'র মেজখুড়োর মামাশ্বশুরের নাতনী। একই গাঁয়ে ছেলেবেলায় একসঙ্গে কত খেলেছি। তোর মা হ'ত বৌ, আর আমি বর!

—আঃ মা, তুমি যে মহাভারত শুরু করলে? দেখছ দিদি বেরোবার জন্যে ব্যস্ত।

নরেশ ঘড়ি দেখে বলল—ছ'টা বেজে বারো—

নমিতা ইতস্তত করে চুপি চুপি স্বামীকে বলল—তুমি বরং একাই সিনেমায় যাও। কে আবার মাসী এলো? আমি বাড়িতেই থাকি—নইলে কি মনে করবে?

নরেশ ফিসফিস করে বলল—চিনতে পাচ্ছ? কোথাকার কে?

—কি জানি? চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! শেষে কি বোকা বনে যাব? সত্যি যদি কোন মাসিমা হন তবে মা শুনে ভীষণ রাগ করবে আমরা যদি আদর-আপ্যায়ন না করি। আমি বরং ভাল করে এঁদের পরিচয়টা জানি।

—ভদ্রমহিলারা কি মিছে কথা বলবেন? হতেও পারে কোন দূর-সম্পর্কের মাসী। তোমার বাপের বাড়ির তো রাবণের গুষ্টি!

—তুমি থাম। আমার বাপের বাড়ির খোঁটা দিতে পারলে তো ছাড় না। তুমি বরং একাই সিনেমায় যাও, আমি এঁদের সামলাই।

ক্ষান্ত নরেশ-দম্পতির গোপন আলাপ অপছন্দ করল, ঠেস দিয়ে বলল—কি যে সব একেলে ঢং। মা'র তুল্যি মাসি! তার সামনে দাঁড়িয়ে কর্তা-গিন্নীতে গুজ-গুজ ফুস-ফুস হচ্ছে, ছিঃ!

মেয়ে সামলে বলল—তুমি চুপ কর মা। ও দিদি, জামাইবাবুর সঙ্গে কি প্রেমালাপ হচ্ছে? আড়ি পেতে শুনব নাকি?

নমিতা হেসে বলল—সেটা খুব মিষ্টি লাগবে না। তাছাড়া তোমার জামাইবাবু এখনই বেরিয়ে যাচ্ছেন।

—সে কি কথা? উনি একাই যাবেন? তুমি সঙ্গে যাবে না?

—নাঃ, তোমরা এলে—। নমিতা ক্ষান্তকে নমস্কার করে বলল—মাসিমা, নমস্কার।

—বেঁচে থাক্, মা। জন্ম-এয়োস্ত্রী হ। যা মা, যা। জামাইয়ের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখে আয়। আমাদের জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা ততক্ষণ চান-টান সেরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।

নরেশ ফেটে পড়ে বলল—এখানে স্নান সারবেন? বলি ব্যাপারখানা কি?

—সহজ ব্যাপার। আমরা এখেনে দিন কতক থাকব।

—সে কি! জানা নেই, শোনা নেই, থাকব বললেই হল?

—অত কৈফিয়ত দিতে পারি না। ঘরটি বেশ ভাল। তবে বড্ড বাজে জিনিসে ঠাসা। এখানে জায়গা না হয় পাশের ঘরেই থাকা যাবে। কি বলিস, টেঁপি?

সুরমা বলল, পাশের ঘর? সে দরজা খুলে দেখে বলল, ওমা—এ যে রান্নাঘর। আর ওটা নিশ্চয় কলঘর। দিদি, তোদের বুঝি একটি মোটে ঘর?

নমিতা ইতস্তত করে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু—

ক্ষান্ত আশ্বাস দিল, তাতে কিন্তু হবার কি আছে? এই ঘরটা বেশ বড়। এখানেই গুছিয়ে নেওয়া যাবে।

বাথরুমের দরজা খুলে সুরমা বলল, কলঘরটা বেশ। তোমার নাইবার খুব সুবিধে হবে মা।

নমিতা বিব্রত হয়ে বলল—তোমরা কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্ষান্ত শান্ত কণ্ঠে বলল, এখনই বুঝবি মা। কত্তা আসুক। হ্যাঁরে টেঁপি, কত্তা এখনও আসে না কেন? ওর যদি কোন আক্কেল থাকে?

—গাড়ি থেকে মালপত্তর নামিয়ে ওপরে উঠবে তো। এখনই এসে পড়বে। ঐ বলতে বলতেই বাপি এসে পড়েছে।

বাক্স-পেঁটরা নিয়ে হারাণ প্রবেশ করল। তার পিছনে মাল ঘাড়ে নিয়ে ঢুকল ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবান যুবা। তাকে দেখেই নরেশ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করল—আরে সুজিত, তুই এসব মালপত্তর নিয়ে কোথা থেকে?

—বড়রাস্তা থেকে। বাড়ির সামনে ফুটপাথে হাওয়া খাচ্ছি। দেখি এঁরা ছ্যাকরা গাড়ি থেকে নামলেন। বলা নেই কওয়া নেই, মাইরি বলছি, ইনি হাত দিয়ে সুরমাকে দেখিয়ে দিল, না আমার ঘাড়ে মাল চাপিয়ে হুকুম করলেন, এই বেয়ারা মাল নিয়ে চল্।

—আর তুই না বলতে পারলি না?

—কি করব, মহিলা যে? আমার খেলোয়াড়ী শরীর, মাল বইতে গিয়ে বসে পড়ব না, নিশ্চয়। তাছাড়া মহিলার জিনিসপত্তর!

হারাণ জিভ কেটে বলল, এই মরেছে! তবে ও বেয়ারা নয়? ভদ্দরলোক!

ক্ষান্ত দরদী গলায় বলল, বালাই ষাট! বাছাকে আমার কত কষ্ট পেতে হল। টেঁপি, তুই যত নষ্টের গোড়া।

—কি করে জানব মা, ভদ্দরলোক এমন চাকর সেজে থাকবেন? (সুজিতকে) আপনারই তো দোষ। সন্ধ্যের মুখে অমন ছেঁড়া গেঞ্জি পরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন কেন?

তাতেই তো আমার ভুল হল।

সুজিত গদগদ হয়ে বলল, এমনই ভুল আরও হলে রোজ রোজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

ক্ষান্ত আদর করে বলল, বাছা, আমার লক্ষ্মী ছেলে। নে—ও টেঁপি, মাল নামা। বাছা আমার মালের চাপে হাঁপিয়ে উঠেছে।

সুরমা সুজিতের ঘাড় থেকে মাল নামাতে হাত বাড়াল, সে ইচ্ছে করে সুজিতের অঙ্গ স্পর্শ করল। সুন্দরী তরুণীর ছোঁয়া লেগে সুজিত পুলকিত হয়ে উঠল, বোকার মত হাসতে লাগল।

সুরমা ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, সত্যি, আপনার ভারী অন্যায়। বলতে হয় তো, আপনি বেয়ারা নন। আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

সুজিত বলল, বেয়ারা নই বললে তো আপনার এই লজ্জাটুকু দেখতে পেতুম না।

ক্ষান্ত তাড়া দিল, নে, নে, গল্প করিস নি। মালপত্তর সব গুণে নে? দেখ আবার কিছু সরে টরে গেল কিনা। (হারাণকে) হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হারাণ আর সুরমা এক দুই তিন চার করে মাল গুণতে লাগল। হঠাৎ ক্ষান্ত চেঁচিয়ে উঠল, আমার বোতল, আমার বোতল—

—এই যে, মা। সুরমা একটি ময়লা জল-ভরা বোতল মার হাতে তুলে দিল।

—দে, দে, আমার গোবরজলের বোতলটা দে। সব অনাছিষ্টি. সব অশুচি। গোবরজলের ছিটে দিয়ে সব শুদ্দু করে নি। এই বলে ক্ষান্ত বোতল থেকে গোবর জল বার করে ছেটাতে লাগল ঘর, বিছানা. সোফা-সেটির উপর।

নরেশ রেগে গিয়ে চীৎকার করল, করছেন কি? নোংরা জল ছিটিয়ে আমার ফার্নিচার নষ্ট করছেন?

—নোংরা জল। বল কি বাছা? এ গোবরজল—পবিত্তির! এই নিয়েই তো বেঁচে আছি। নোংরা, চারিদিক নোংরা! গোবরজলে সব শুদ্দু হোক।

সে দ্বিগুণ উৎসাহে গোবরজল ছিটাতে লাগল। নরেশ চিৎকার করল, নমিতা, তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ কি? তোমার কোথাকার কোন মাসী উড়ে এসে জুড়ে বসল, নোংরা জল দিয়ে ফার্নিচার সব ন্যাষ্টি করছে, আর তুমি বারণ করতে পারছ না?

হারাণ একটু ভয় পেয়ে বলল, এই মরেছে! বাবাজী আবার রাগ গোঁসা করছে! ও গিন্নী, আমি তখনই বললুম কুটুমবাড়িতে উঠে কাজ নেই।

—থাম তুমি। বেশি ফড় ফড় কর না। ও রাগই করুক আর গোঁসাই করুক, ঘরদোর শুদ্দু না করে, আমি এক মুহূর্ত এখানে তিষ্ঠুতে পারব না।

নরেশ গর্জন করল, কে আপনাকে তিষ্ঠতে বলেছে? এই সুজিত, কোত্থেকে তুই

এই আপদ জুটিয়ে আনলি?

সুজিত এতক্ষণ সুরমার রূপসুধা পান করছিল, সুরমাও তার দিকে সলজ্জ কটাক্ষ হানছিল। হঠাৎ নিজের নাম কানে যেতে সুজিত চমকে উঠে বলল—আমায় দোষ দিও না, নরেশদা। ভদ্রমহিলা শুধোলেন, এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়?

ক্ষান্ত বাধা দিয়ে বলল, মিথ্যে কথা। আমি বললুম, কোথায় থাকে আমার বঁচু, একলা ঘরের ঘরণী।

—মাইরী বলছি নরেশদা, ঐ কথা শুনেই সাঁৎ করে আমার বউদির কথা মনে পড়ল। তোমাদের পরিচয় দিতেই লাফিয়ে উঠলেন ওঁরা।

ক্ষান্ত আশ্বস্ত হয়ে বলল—উঠব না? আমার বোনঝিকে এত সহজে খুঁজে পাব, ভাবতেই পারি নি!

নমিতা বিব্রত হয়ে বলল—কিন্তু বিশ্বাস করুন এখনও ঠিক আপনাদের চিনতে পারছি না।

ক্ষান্ত বলল—কেন, ফরাসপুরে তোমার বাপের বাড়ি, রায়বাবুরা আমাদেরও কুটুম।

—তাই তো, নাম-ধাম তো ঠিক বলছেন, নমিতার কণ্ঠে সংশয়।

নরেশ জেরা করল—ফরাসপুরের কথা তুই বলেছিস, সুজিত?

—তা বলেছি, ওঁরা খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিলেন যে।

ক্ষান্ত বিরক্ত হয়ে বলল—না, খোঁজখবর নেব না? হুট করে অচেনা বাড়িতে ঢুকে পড়ব, তেমন মেয়ে ক্ষান্তমণি নয়। যাও বাপু আর জেরা টেরা করো না।

নরেশ বলল—দেখ্ সুজিত, তুই যত নষ্টের গোড়া। যে পথ দিয়ে এদের এনেছিস সেই পথ দিয়ে এদের বিদেয় কর।

সুজিত বলল—বেশ নরেশদা, আমি মালপত্তর নামিয়ে দিচ্ছি।

সুজিত একটা বাক্স তুলতে গেল। তিড়িং করে তেড়ে এসে ক্ষান্ত ধমক দিল—খবরদার ছোকরা! মালে হাত দিয়েছ কি মজা দেখিয়েছি।

নরেশ সাবধান করে দিল—ভাল চান তো সরে পড়ুন, নইলে ট্রেসপাসের চার্জে থানায় খবর দেব।

সুজিত সভয়ে বলল—সর্বনাশ, আমায় আবার সাক্ষী মানবে! আমি মাইরি কাট্ মারি।

সুজিত সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়ল।

শুনুন, শুনুন, আপনার কাছে মাপ চাওয়া হয় নি, বলতে বলতে সুরমা তার পিছু নিল।

নরেশ ভয় দেখাল, যাচ্ছি আমি থানায় খবর দিতে।

হারাণ বিব্রত হয়ে বলল—এই মরেছে, শেষে থানা-পুলিস!

ক্ষান্ত তম্বি করে বলল—আসুক পুলিস, দেখি কত দূর ছোটলোক এরা।

নরেশ ধমক দিল—দেখুন যা তা গালমন্দ করবেন না। আমার শ্বশুরবাড়ির গুষ্টিটাই এমনি অভদ্র।

মন্তব্যটা নমিতাকে বিঁধল, সে প্রতিবাদ করল—দেখ, কথায় কথায় আমার বাপের বাড়ি তুলো না। ভাল হবে না বলছি! তোমার নিজের যদি আত্মীয় হ'ত, খোঁজখবর না নিয়ে কি ধূলো-পায়ে বিদেয় করতে পারতে?

নরেশ মন্তব্য করল—খোঁজ নিতেও তো পাঁচ ছ'দিন। তোমার বাপের বাড়ি কি এ মুল্লুকে? নিদেন একটা টেলিগ্রাফ অফিসও কাছাকাছি নেই, যে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে নিতে পারব। বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা।

—আমার বাপের বাড়ির খোঁটা না দিলে তো তোমার ভাত হজম হয় না। বিপদে না পড়লে কি কেউ পরের বাড়ি ওঠে? নমিতার কণ্ঠে সহানুভূতি।

আশ্বাস পেয়ে হারাণ ব্যগ্র হয়ে বলল—বল তো মা, বলো তো। জামাই কুটুম। পরের ছেলে। নেহাত বাড়িওয়ালা বেটা পুলিস দিয়ে উচ্ছেদ করালে—

ক্ষান্ত বাধা দিয়ে বলল—থাক্ তোমায় আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। বোনঝির বাড়ি আমাদের থাকবার এক্তার আছে।

নমিতা এবার অনুনয় করে বলল—মাসিমা, আমাদের এই একটি মোটে ঘর। দেখছেন তো আসবাবপত্রে ঠাসা। আমাদের দুটি প্রাণীরই ঠাঁই হয় না। আপনারা সবাই থাকবেন কি করে?

যুক্তিতর্ক শোনার পাত্রীই নয় ক্ষান্তমণি। একবার যখন ছুঁচ হয়ে ঢোকা গেছে, ফাল হয়ে বেরোতে হবে। এই ভেবে ক্ষান্ত টিপ্পনী কাটল, যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় বিশ জন।

হারাণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চোখ পড়তেই ক্ষান্ত হুকুম করল—ওগো ইদিকে এসো। মালপত্তর ডাঁই হয়ে পড়ে রইল। গুছিয়ে নি। এই একটা ঘরেই সবার কুলিয়ে যাবে।

ক্ষান্ত নিজেই বিছানা খুলল, একটা চাদর বার করতে করতে বলল—দেখি বিছানার চাদর। এই চাদরটা মাঝখানে টাঙিয়ে দিলে ঘর আড়াল হয়ে যাবে। হাজার হোক আমরা ভদ্দরলোক, একটা আব্রু তো চাই।

নরেশ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। ভদ্রমহিলা বলে এই উড়ো আপদকে সে অনেকক্ষণ বরদাস্ত করেছিল

কিন্তু এবার তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে ক্ষান্তর হাত থেকে চাদর ছিনিয়ে

নিয়ে গর্জন করে উঠল, রেখে দিন চাদর। পরের বাড়ি চড়াও হতে লজ্জা করে না?

ক্ষান্তও গলা চড়িয়ে ঝগড়া করতে লাগল, বলল—জামাইটা তো আচ্ছা ছোটলোক। হাঁরে, মা-মাসীর সম্মান রাখতে জানিস না? এই তোদের শিক্ষে! হ্যাঁ মা বঁচু, এই জামাইয়ের সঙ্গে ঘর করিস? আমি হলে দুদিনে টিট্‌ করতুম।

নরেশ ফস্‌ করে বলে বসল—সেটা আমার শ্বশুরবাড়ির সবায়ের অভ্যেস আছে।

নমিতা তর্জন করল—ফের বাপের বাড়ি তুলছ? তার পর ক্ষান্তকে শান্ত করার জন্যে সে বলল—না না, মাসিমা, ওঁর শরীরটা ভাল নেই।

নরেশ তখনও রাগে টগবগ করে ফুটছিল। নমিতা তাকে শান্ত করার জন্যে বলল—যাও, তুমি বরং সিনেমায় ঘুরে এসো। সাড়ে ছ'টা বাজে।

—বারোটা বাজে। বুঝলে, আমার বারোটা বাজে। আমি ওদের তাড়াবার ব্যবস্থা যদি না করি তো আমার নাম নরেশকুমার নয়।

নরেশ ক্রুদ্ধ হয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ রইল। নমিতা স্তব্ধতা ভেঙে সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করল—কিন্তু আপনাদের ব্যাপারখানা কি বলুন তো?

—সহজ ব্যাপার মা। বাড়িওয়ালা উচ্ছেদ করল। ভাবলুম সোয়ামী মেয়ে নিয়ে এই বিপদে কোথায় দাঁড়াই? অমনি মনে পড়ল বঁচু মার কথা। আহা কি বুঝদার লক্ষ্মী মা আমার! ভাবলুম আমাদের এই বিপদে সে-ই বুঝবে। তাই তো ঠিকানা খুঁজে তোর এখানে এসে উঠলুম।

—কিন্তু আমার তো ও নাম কোন জন্মে নয়। আপনারা নিশ্চয় ভুল করছেন।

—তুই অবাক করলি মা! জন্মে অবধি তো তোকে ঐ নামেই ডেকে এসেছি। এখনও মনে পড়ে বেলফুলের বিয়ের কথা—বেলফুল তোর মা—আমরা দুবোনে ঐ নাম পাতিয়েছিলুম। কি আনন্দ। তার পর কোল আলো করে তুই এলি—

হারাণের মনে হল গৃহিণী যেন বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। ওকে একটু সংযত করা দরকার। হারাণ একটু গলা খাঁকরি দিয়ে বলল—গিন্নী, আমার নস্যির কৌটোটা?

ক্ষান্ত খিঁচিয়ে উঠল—কৌটো কৌটো করো না বলছি। দেখ ফতুয়ার পকেটে আছে।

হারাণ ফতুয়ার পকেট থেকে কৌটো বার করে নস্যি নাকে দিল। কিন্তু তার বাধাটা সময়োপযোগী হল। আর কল্পনার রঙ না চড়িয়ে ক্ষান্ত নমিতাকে অনুনয় করে বলল—যাক্‌ গে, মা। দুটো দিন বই তো নয়। না হয় তোদের একটু কষ্ট হবে। কত্তা একটা ঘর খুঁজে পেলেই আমরা বিদেয় হবো। তা বলে মাসীকে তো আর ফুটপাতে বার করে দিতে পারবি না। তোর মা তা হলে আর মুখ দেখবে না—

নমিতা চিন্তিত হয়ে বলল—তা তো বুঝলুম, মাসিমা। কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটে একটি মোটে ঘর।

হারাণ ফস করে বলে ফেলল—আমরা না হয় এই খাটের তলাটায় শোব!

ক্ষান্ত জিভ কেটে বলল—মেয়ে-জামাই খাটের ওপরে শোবে, আর আমরা—। হেড পণ্ডিতি করে করে বেহেড হয়ে উঠেছ দেখছি।

ক্ষান্ত নমিতার হাত ধরে মিষ্টিগলায় বলল—তুই মা, একটুও ভাবিস নি। আমি এখনই গুছিয়ে নিচ্ছি, যাতে কারুর অসুবিধে না হয়। যা মা, আর পটের বিবি সেজে থাকিস নি। কাপড়টা বদলে আয়।

ক্ষান্ত এক রকম টানতে টানতেই নমিতাকে বাথরুমে পুরে দিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া নমিতা বাধা দিল না।

ক্ষান্ত উল্লাসে আস্ফালন করে বলল—দেখলে আমার বুদ্ধি! বৌটাকে একটু ভেজানো গেছে। আজকের মতো একটা আশ্রয় তো পাওয়া গেল। ফুটপাতে দাঁড়াতে হল না। এসব তোমার পণ্ডিতি বুদ্ধি তে হ'ত না। হেডপণ্ডিতি করে করে বুদ্ধি টা তোমার দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে।

হারাণ চিন্তিত হয়ে বলল—আমার কিন্তু ভয় করছে। চেনা নেই শোনা নেই, হুট করে মাসী-বোনঝি পাতিয়ে নিলে। ওদিকে কর্তা তো উচ্ছেদ করবার জন্যে বেরিয়ে গেল। মিথ্যে কথা সব ধরা পড়লে বে-ইজ্জত।

—আর ইজ্জত বাড়ত বুঝি ফুটপাতে আশ্রয় নিলে?

—কিন্তু এই ধাপ্পা দিয়ে ক'দিন চলবে?

—যে ক'টা দিন চলে। আবার অন্য কারুর সঙ্গে পিসি পাতিয়ে নেওয়া যাবে।

—কিন্তু তোমার পাতানো জামাই যে চটে আগুন। যদি থানা-পুলিশ করে?

—টেঁপি আমার তেমন মেয়ে নয়। বিপদ কাটাবার জন্যে ও ঠিক জামাইবাবুকে বশ করবে। দেখলে না বৌটার চেয়ে আমার মেয়ের কত রূপ?

—এই মরেছে! কি বলছ তুমি? শেষে দুজনে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

—তবু মেয়ের একটা হিল্লে হবে। তেমন তেমন হলে বিয়ে না করিয়ে কি আর ছাড়ছি?

—কি করে হবে? আইন পালটে গেছে। এক বৌ থাকতে, আর এক বৌ আনা যায় নাকি?

—আগের বৌ থাকবে কেন? তালাক দেবে, তালাক দেবে। ধাড়ি মেয়ের একটা বর জোটাতে পারলে না। মেয়েটা তো ফোঁস-ফোঁস করে মরছে। তবু যদি একটা ভাল বর জোটাতে পারে। হলই বা তালাকী বর, লোকটা তো স্বজাত।

—গিন্নী. তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ। সাবাস্। ধাপ্পা দিয়ে একটা ঘর জোটালে. আবার নি-খরচায় মেয়ের বর জোটাতে চাও। হরি. হরি!

ক্ষান্ত একগাল হেসে বলল—নাও. আর ঢং করতে হবে না। এসব গোছাও। আমি চুলোর ব্যবস্থা কি আছে দেখে আসি।

এই বলে সে রান্না ঘরে ঢুকল। হারাণ আপন মনে বলে উঠল—একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি। কি প্রলয় ঘটবে জানি না বাবা।

হারাণ বাক্স-পেঁটরা গোছাতে লাগল। একটু পরেই প্রবেশ করল প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক, কাঁচা-পাকা চুল তার, ভারিক্কী চেহারা। ঢুকেই আগন্তুক চিৎকার শুরু করল, নরেশবাবু বাড়ি আছেন, নরেশবাবু—

—আজ্ঞে না, মহাশয়ের প্রয়োজন?

—আপনিই বুঝি সব্‌টেনেণ্ট্? শুনলাম নরেশবাবু সব্‌টেনেণ্ট বসিয়েছেন মোটা দাঁও মেরে।

হারাণ মনে ভাবল আমিই বা কম যাই কেন? এবার আমার বুদ্ধি সবাইকে টেক্কা মারবে। সে বলল—ঠিক শুনেছেন মশায়। বেটা একেবারে চামার। এই তো ব্যাঙের আড়াই পা ঘর। কত টাকা ভাড়া আগাম নিয়েছে। আবার মোটা সেলামি। নিন না আমাদের টেনেণ্ট্ করে।

—নালিশ করব। উচ্ছেদ করাব। আমি শ্যামরঙ্গিণী ট্রাস্ট ইস্টেটের ম্যানেজার পাঁচকড়ি ঘোষাল। আমার চোখে ধুলো দিয়ে ঘর ভাড়ার ব্যবসা! নরেশবাবু, বলি, ও নরেশবাবু। কোথায় তাঁর গিন্নী?

চেঁচামেচি শুনে নমিতা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। সে পোশাকী শাড়ী ছেড়ে একটা আটপৌরে শাড়ী পরেছিল। সে বিরক্ত হয়ে বলল—ব্যাপার কি পাঁচকড়িবাবু? অত চিৎকার করছেন কেন? বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি?

পাঁচকড়ি গলার সুর চড়িয়ে বলল—চেঁচাব না? পাঁচকড়ি ম্যানেজারের চোখে ধুলো দিয়ে সব্‌টেনেণ্ট্ বসানো? নালিশ করব! উচ্ছেদ করাব! ঘর থেকে সব ক'টাকে বিদেয় করব!

—আপনি মিথ্যে রাগ করছেন পাঁচকড়িবাবু। ওঁরা সব্‌টেনেণ্ট্ নন। আমার—মানে—মানে—মাসী-মেসোমশায়। বিপদে পড়ে এখানে এসে উঠেছেন। দু'দিন বাদে চলে যাবেন।

—মাসী-মেসো! তবু ভাল. মাসতুতো ভাই বল নি। ওসব চলবে না. চলবে না বলে দিচ্ছি! বাড়ি থেকে সব্বাইকে দূর করে দেব।

রান্নাঘর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো ক্ষান্তমণি, কোমরে কাপড় জড়িয়ে

হাতে একটা হাতা নিয়ে সে আস্ফালন করে বলল—কার এত বড় বুকের পাটা আমার বঁচুমাকে উচ্ছেদ করে? হাতা পেটা করব, অনেক ঘাটের জল খাইয়ে দেবো, আমার নাম ক্ষান্তমণি।

—অমন ঢের ঢের দজ্জাল মাগীকে আমি টিট্ করেছি, আমি শ্যামরঙ্গিনী ট্রস্ট্ ইস্টেটের ম্যানেজার পাঁচকড়ি ঘোষাল। নালিশ করব, উচ্ছেদ করাব।

গোলমাল শুনে সুরমা ঘরে ফিরে এলো। সে এতক্ষণ মাপ চাইবার অজুহাতে সুজিতের সঙ্গে রসালাপে মত্ত ছিল। কিন্তু রস ভঙ্গ করে দিল পাঁচকড়ি-ক্ষান্তমণির সরব গর্জন। সে ছুটে এলো। হঠাৎ সুন্দরী তরুণীকে দেখে পাঁচকড়ির ভাবান্তর হল। সুরমার রূপযৌবনের মাধুর্যে পাঁচকড়ি গলে গেল। অল্প কিছুদিন হল তার দ্বিতীয়া পত্নী গত হয়েছে। যুবতী নারী দেখলেই পাঁচকড়ির মন হাঁকপাঁক করে। তার ওপর সুন্দরী তরুণী! পাঁচকড়ি লুব্ধদৃষ্টিতে সুরমার রূপসুধা পান করতে লাগল।

সুরমা ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে নমিতাকে প্রশ্ন করল, এ ভদ্রলোক কে দিদি? অমন ভাঁটার মতো চোখ করে আমার দিকে চেয়ে আছেন কেন?

ধরা পড়ে গিয়ে পাঁচকড়ি লজ্জিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তার সুর নরম হল, যেন সামারসল্ট খেয়ে সে আমতা আমতা করে বলল—আম্—আম্-আমি বলছিলুম কি—এটি বুঝি আপনাদের মেয়ে? আহা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা, ঘর আলো-করা মেয়ে। থাকুন না দিনকতক, আপনারা এখানেই থাকুন। আমি কর্তাদের কানে কথা উঠতেই দেবো না।

হারাণ এবার ভরসা পেয়ে কাজের কথা পাড়ল, মশায়, আমাদের একখানা ঘর ভাড়া দিতে পারেন? আমি হিঞ্চেডাঙ্গা হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত। আমরা তিনটি প্রাণী, ছোট সংসার। ভাড়া দেবো, ভাল ভাড়া। যে বাড়িতে ছিলুম, আহা, বাড়িওয়ালা পণ্ডিতমশায় বলতে অজ্ঞান। ছাড়তে কি আর চায়? নেহাৎ গিন্নীর ইচ্ছে হল, তাই চলে এলুম।

পাঁচকড়ি কিন্তু হয়ে বলল—ঘর কি আর খালি আছে স্যার? এক একটা ঘরে লোক গিজগিজ করছে। টেনেন্ট, সবটেনেণ্ট—তস্য—তস্য—আর বলবেন না, একেবারে মাচা বেঁধে আছে সব।

হারাণ টোপ গেলাতে গেল, বলল—সেলামী দেবো। রসিদ দিতে হবে না। পূজাপার্বণ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, ক্রিয়াকর্ম বিনা দক্ষিণায় সারব। সে সব আপনার উপরি।

কি যে বেফাঁস বলে, এই ভেবে ক্ষান্ত তাড়াতাড়ি স্বামীর কানে কানে বলল—তুমি থাম। ভাড়া দেবার মুরোদ নেই, আবার সেলামী আর উপরি।

পাঁচকড়ি সুরমাকে আপাদমস্তক লুব্ধদৃষ্টিতে দেখে প্রস্তাব করল, তা আমার ঘরে আপনারা উঠতে পারেন। আপনাদের ভাড়াও দিতে হবে না। আমার অতিথি হয়ে থাকবেন, আমি ঘরের একধারে পড়ে থাকব। আমার দ্বিতীয় পক্ষের বউ মারা গিয়ে অবধি একেবারে

একা।

—মরণ আর কি! সুরমা ঠোঁট উলটে বলল—একটা অচেনা অজানা বুড়োর ঘরে থাকতে আমার বয়ে গেছে। তার চেয়ে জামাইবাবুর ঘরই ভাল।

পাঁচকড়ি থতমত খেয়ে বলল, তাই ভাল, তাই ভাল। বেশ তো ক'দিন এখানেই থাকুন। আমি মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে আসব। অসুবিধে হলে না হয় আমার ঘরেই উঠবেন। আপনার জন্যে আমার দরজা হাট করে খোলা থাকবে।

হারাণ যেন এতক্ষণ পবে নিজের একটি সঙ্গী পেল। সে আবদার করল, বাবাজী, তোমার ওখানে তামাক-টামাক পাওয়া যাবে?

—নিশ্চ য়, নিশ্চ য়। আসুন, আমি নিজের হাতে সেজে দেবো।

ক্ষান্ত বলল—বেশী দেরী করো না কিন্তু।

পাঁচকড়ি খাতির করে হারাণকে নিয়ে চলে গেল।

ক্ষান্ত বলল—টেঁপি, তুই মা বিছানাটা পেতে দে। চানটা সেরে শুদ্দু হয়ে একটু গড়িয়ে নি। গা গতরে ব্যথা হয়েছে।

সুরমা বলল—আজকের খওয়া-দাওযা?

—আমি আর কিছু খাব না। রান্না মেলেচ্ছাচার। কাল সকালে একটা তোলা উনুন এনে ঘরের কোণে রাঁধব। আজ রাতটা কি আর বোঁচা তোদের দু'মুঠো খেতে দেবে না? অতিথ্—

নমিতা ইতস্তত করে বলল—তা না হয় দেবো মাসিমা। কিন্তু বার বার বোঁচা বোঁচা করবেন না। আমার ও নাম কক্খনো নয়। আমার ভাল নাম নমিতা, ডাক-নাম নমু।

—মা তোকে ক্ষেপাচ্ছে দিদি। যাও মা, যাও, চান-টান সেরে একটু মাথা ঠাণ্ডা করে এসো।

—তাই যাই মা। তোরা দু'বোনে ততক্ষণ ঘরদোর গুছিয়ে রাখ।

ক্ষান্ত এই বলে কাপড় গামছা আর গোবরজলের বোতল নিয়ে বুড়ো আঙুলে ভর করে স্নানের ঘরে ঢুকল, বিড় বিড় করে বলতে লাগল, নোংরা! চারিদিকে নোংরা!

সুরমা স্বীকার করল—মা-র ভারী ছুঁচীবাই! পরিষ্কার-পরিষ্কার বাতিক। আমি ততক্ষণে ঘরদোর গুছিয়ে নি। তুই, দিদি, রান্নাটা সেরে ফেল।

সুরমা বাক্সতোরঙ্গ দেওয়ালের পাশে রেখে মেঝেয় বিছানা পাতল।

নমিতা লজ্জিত হয়ে বলল—তাই তো মুশকিল! আজ যে হেঁসেল বন্ধ। আমরা তো দুটি প্রাণী। কথা ছিল সিনেমা দেখে কোনও হোটেলে খেয়ে ফিরব। উনি বুদ্ধি করে হোটেল থেকে খাবার নিয়ে এলেই বাঁচি

—ভোজটা আমরা মাটি করে দি‌্ং. ্তো। ে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍্স্থা. আমিই রেঁধে দিচ্ছি; ওসব আমার অভ্যেস আছে তুই কিচ্ছু ভাবিস নি।

—যাক, একটা ব্যবস্থা করা যাবেখ'ন। তোমরা ভাই ক'ভাইবোন?

—আমিই একা। বাবা আর মা, ছোট্ট সংসার। তোদের ভাই, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। তোর মা—মানে আমার ফুলমাসী কি ভালই না বাসত।

সুরমা অম্লানবদনে মিথ্যেকথা বলে উঠল। যার মা ক্ষুরধার বুদ্ধি ধরে, ধড়িবাজিতে তার মেয়েই বা পিছিয়ে যাবে কেন? কিন্তু নমিতার সন্দেহ এই সাক্ষ্যেও দূর হল না। সে বলল—কিছু মনে করো না। সত্যি বলছি, তোমাদের কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

সুরমা রঙ চড়িয়ে বলল—বলিস কি দিদি? ছেলেবেলা কত খেলা করেছি, এর মধ্যে ভুলে গেলি? আমি কিন্তু তোকে ভুলি নি। দেখ না এই যে একটা দাগ রয়েছে কপালে। তুই তো ফেলে দিয়েছিলি খাটের ওপর থেকে। মাটিতে পড়ে কেটে গিয়েছিল। ফুলমাসী তোকে কি মারটাই মারলে।

এত স্পষ্ট জোরালো সাক্ষ্যে নমিতা ঘাবড়ে গেল। সে ইতস্তত করে বলল—হবেও বা। আমার বাপের বাড়ির গুষ্টিটা বড়। আমার আবার ভারী ভুলো মন।

সুরমা এই একটা সুযোগ পেল। সে মনে মনে ভাবল 'দিদি'টিকে তোয়াজ করে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখলে 'জামাইবাবু'ও শায়েস্তা থাকবে। এই অবসরে 'দিদি'র সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমিয়ে ফেলতে হবে, এই ভেবে সে খোস গল্প ফেঁদে বসল কুৎসা রটনা করে। সে বানিয়ে বলল—সে আর বলিস নি, দিদি। যে বাড়িতে আগে আমরা ছিলুম সে বাড়ির একটি মেয়ে—লক্ষ্মীমণি—ভুলে ভাসুরের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তা নিয়ে কি ঘোঁট!

নমিতা উৎসুক হয়ে উঠল। শহরে এসে অবধি সে বড় একটা সঙ্গীসাথী পায় নি। ফ্ল্যাট-বাড়ি, যে যার তাল সামলাতে ব্যস্ত। গাঁয়ের পুকুরঘাটে নাইতে গিয়ে কত গল্পগুজব হ'ত, পরচর্চা, কেচ্ছা-কাহিনী শোনা যেত, শহরে এসব জোটে না। সমবয়সী সখীর অভাব নমিতা প্রায়ই বোধ করত। এই চটুল মেয়েটি যেন সে অভাব পূর্ণ করল। যদি সে হয়ই বা অনাত্মীয়া, কিন্তু কি সুন্দর মিষ্টি কথা বলে যেন অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মীয়ের চেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। নমিতা কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, তাই নাকি? তারপর—?

—তারপর কোনও রকমে কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়া গেল। আবার লক্ষ্মীর বরটিও তার ওপরে যান। কি বলব ভাই? একদিন তিনি ভুল করে আমাদের সবার সামনে নিজের পরিবারকে পেন্নাম করে বসলেন।

—তুই এত মজার মজার কথা জানিস, ভাই! আমার কি আর সঙ্গী আছে? উনি

আবার ওসব পছন্দ করেন না।' তোর সঙ্গে দু'দিন গল্প করে বাঁচব।

সুরমা যুৎ পেয়ে জাঁকিয়ে বসল, বলল, আমাদের আগের বাড়িটা ছিল যেন চিড়িয়াখানা। এক একটি যেন জানোয়ার। কেলেঙ্কারির কথা কি বলব ভাই. পানুর মা বলে একটা বৌ রোজ রাত্তিরে পাশের ঘরের সঙ্গে—

—মা গো, রীতি-নীতি আর রইল না! আমি ওসব একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না। তা তুই কি করে জানলি?

—ওমা, পাড়াসুদ্ধু সবাই জানত। সত্যি কথা বলছি, আমি এক-আধ দিন জানলার খড়খড়ি তুলে আড়ি পেতেছি।

—তাই নাকি? আয় বোন, আয়, তোর সঙ্গে দুটো গল্প করি।

—কত গল্প আর শুনবি? সব সত্যি। যাক, বিছানা হয়ে গেল। এখন রান্না।

—ওসব থাক, হরিশ ময়রার দোকান থেকে কিছু খাবার আনিয়ে আজ রাতটা চালিয়ে নেওয়া যাবে। কদ্দিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা! প্রাণভরে গল্প করা যাবে।

—আমি দিন-রাত্তির গল্প করতে পারি! কিন্তু জামাইবাবু কি আর ছাড়বে তোকে? রাগ করবে।

—ওর কথা রাখ। ওর রাগকে আমি গেরাজ্যি করি? আজ তোতে আমাতে খাটে শুয়ে শুয়ে অনেক রাত অবধি গল্প করব।

—কিন্তু জামাইবাবু কোথায় শোবে?

—পুরুষমানুষ। দু'চার রাত না হয় মাটিতেই শুলো। তোরা তো আর চিরকাল থাকবি না। তা পানুর মা-র কথা কি বলছিলি?

ক্ষান্ত স্নান সেরে ফিরে এলো। বলল, যাক বাবা, চান করে শুদ্দু হওয়া গেল। হাত-পা কামড়াচ্ছে। আজ দৌড়-ঝাঁপ কি কম হল! একটু গড়ানো যাক।

সুরমা বলল, ভিজে মাথায় ঘুমোবে কি? শেষে অসুখ বাধাবে?

—তুই থাম টেঁপি। আমি এখন ঘুমোব! একটু চোখ বোজা আর কি! দাঁড়া, বিছানাটা শুদ্দু করে নি।

ক্ষান্ত বিছানার ওপর গোবরজলের ছিটে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ল, বলল, আঃ, শয়নে পদ্মনাভঞ্চ।

নমিতা চুপি চুপি সুরমাকে প্রশ্ন করল, তারপর পানুর মা-র কি হল?

—সে আর কি বলব, ভাই। একদিন নিশুতি রাত। বাইরে খট করে আওয়াজ হতেই ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলুম চোর নাকি? চুপি চুপি উঠলুম। খড়খড়ি তুলে আবছা আলোয় দেখলুম, পানুর মা আর—

রসভঙ্গ করল ক্ষান্তর ঘোর নাসিকাগর্জন। সুরমা বলল, মা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুলে

আর চোখ মেলতে পারে না।

—আহা ঘুমোক। কিন্তু পানুর মা আর কে?

—আর পানু।

নমিতা ঈষৎ হতাশ হয়ে বলল—অ, মা আর ছেলে?

—শোন্ না। দুজনের তুমুল ঝগড়া।

—কেন? কেন?

—ছেলে বলে, তুই পাশের ঘরে—

কিন্তু কথায় বাধা পড়ল নরেশের প্রবেশে। তার হাতে মস্ত এক শিঙা।

নরেশ রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সে প্রথমে ভেবেছিল থানায় খবর দেয়। কিন্তু আগন্তুকেরা যে রকম জোর গলায় কুটুম্বিতা দাবী করছিল, তা যদি সত্যি হয়, তবে প্রথমেই থানা-পুলিস করলে অনর্থক ঝামেলা বাড়বে। তাছাড়া নমিতাও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছিল না। তাই রাগের মাথায় থানায় না গিয়ে সে সোজা পাড়ার শিবমন্দিরে হাজির হল। তখন ভিড় ছিল না। খানিকটা চুপ করে বসে মনটা একটু শান্ত হল। দেখতে দেখতে ভক্তদের সমাবেশ হল। কাঁসর ঘণ্টা বাজল। আরতি হল, সব শেষে শিঙা বাজল। শিঙার উৎকট আওয়াজ যেন কানে তালা ধরিয়ে দেয়। নরেশের মাথা আবার ঝনঝন করতে লাগল। মন্দিরে এসেও তার শান্তি নেই। হঠাৎ যেন শিবঠাকুর তার চোখ খুলে দিলেন। মাথায় বুদ্ধি র ঝলক খেলল, সে মনে ভাবল, ঘরে শিঙা-চর্চা করলে আগন্তুকের দল অস্থির হবে। ঘরে এই উৎকট সঙ্গীত-চর্চায় বিরক্ত হয়ে হয়ত সহজেই আপদগুলি বিদায় হবে। তাই আরতির শেষে ভিড় কমে গেলে নরেশ পূজারীর কাছ থেকে শিঙাটি এক রাত্রের জন্যে ধার চাইল। পূজারী তাকে ভাল করেই চেনে। শিবরাত্রি ও অন্যান্য পর্বের ছুতো করে তার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে। কিন্তু লোকটা তুখোড়। বিনা দক্ষিণায় শিঙা ছাড়তে সে নারাজ। একরাতের জন্যে সে করকরে এক টাকা শিঙা-ভাড়া আদায় করে নিল। নরেশ বীরদর্পে শিঙা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। আসার সময়ে সে আবার ফারুকী হোটেলে মুর্গি-মাটনের অর্ডার দিয়ে এলো।

সুরমা তাকে দেখে গল্প থামিয়ে দরদী গলায় বলল—আসুন আসুন, জামাইবাবু। হাতে ওটা কি?

নমিতা স্বামীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল—আঃ, বল না ভাই, পাশের ঘরে কি হল?

—রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে বলব। ওমা, ওটা কী বাজনা?

নরেশ রাগত কণ্ঠে বলল—আমার শবযাত্রার শিঙে।

সুরমা জিভ কেটে বলল—বালাই, ষাট্! ওসব অলুক্ষণে কথা মুখে আনে? তা

ওটা আবার কি জন্যে?

—ফুঁকব বলে।

নমিতার এতক্ষণে হুঁশ হল, বলল—ফের ওসব কথা? হঠাৎ ওটা কেন?

—বাজানো শিখছি!

সুরমা সভয়ে বলল—আর বাজনা পেলেন না? এখানে যেন বাজাবেন না। মা-র কাঁচা ঘুম ভাঙলে আর রক্ষে থাকবে না।

—বাজাব, বাজাব। আজ সারারাত ধরে বাজাব।

নরেশ প্রাণপণ শক্তি দিয়ে শিঙায় ফুঁ দিল। তার দারুণ শব্দে ঘরদোর কাঁপতে লাগল। নমিতা বিরক্ত হয়ে বলল—ও বাজাক, আয় টেঁপু, আমরা বারান্দায় গিয়ে গল্প করি। আচ্ছা, পানুর মা—

নমিতা সুরমাকে টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে গেল।

এদিকে শিঙার আওয়াজে ক্ষান্তর ঘুমে ব্যাঘাত হল। সে তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলল—উঃ, কি মশার ডাক! ও টেঁপি, কানের কাছে মশা পন্ পন্ করছে!

ক্ষান্ত পাশ ফিরে শুল।

নরেশ মনে মনে বলল—দাঁড়াও, তোমার শোয়া বার করছি। মশার ডাক না কামান গর্জন। এই ভেবে সে আরও জোরে শিঙা বাজাতে লাগল।

ক্ষান্ত আর ঘুমোতে পারল না, ধড়মড় করে উঠতে উঠতে বলল—নাঃ, এ তো মশা নয়, ডাকাত পড়ল নাকি?

সে চোখ মেলে চেয়ে দেখল গৃহস্বামীর দিকে। এবার আসল জিনিসটি দেখে সে কট্‌মট্ করে চেয়ে বলল—রামশিঙে। বলি বাছা, তোমার আক্কেলটা কি? বুড়োমানুষ একটু ঘুমোচ্ছে, তার কানের কাছে শিঙে ফুঁকছ?

নকল ভক্তির সঙ্গে নরেশ বলল—আপনারা মাননীয় অতিথি! আমার স্ত্রীর মাসীমা। মহা আনন্দে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। সারারাত্রি বাজাব।

সে মহোৎসাহে সজোরে শিঙায় ফুঁ দিতে লাগল। ক্ষান্তর কণ্ঠ শিঙার উৎকট আওয়াজে ডুবে গেল। কিন্তু বাদ সাধল প্রতিবেশীরা। তারা নরেশের প্ল্যান ভেস্তে দিল। শিঙার বিশ্রী আওয়াজে বিরক্ত হয়ে তারা সোরগোল তুলল। জনতিনেক তেরিয়া হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে চীৎকার করতে লাগল।

—বলি ব্যাপারখানা কি? ডাকাত পড়ল নাকি?

—মশায়, কাচ্চাবাচ্চারা শুতে যাচ্ছে, আর আপনি কানের কাছে বিকট আওয়াজ করছেন?

—এ কোন দেশী ইয়ার্কি? ভাবলুম-পাশের ঘরে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল।

নরেশ গম্ভীর হয়ে বলল—আমার কিঞ্চিৎ শিঙা সাধনার ইচ্ছা হইয়াছে। শিঙা অতীব পবিত্র বাদ্যযন্ত্র, সন্ন্যাসীর সম্বল, ভক্তিমার্গের ভরসা। এর গুরুগম্ভীর আওয়াজে ধরায় ধর্মের সাগর উথলিয়া উঠিবে। গৃহে গৃহে এই কারণে শিঙা-সাধনার আশু প্রয়োজন।

বক্তৃতার ভঙ্গীতে এই কথা বলে সে আবার শিঙা বাজাল।

এক প্রতিবেশী তেড়ে বলল—আবার! শিঙে ফুঁকতে হয় তো নিমতলায় যাও। এখানে কেন বাপধন?

ক্ষান্ত নাকিসুরে অভিযোগ করল, বলল—বাবা, বল তো। আমি বুড়ো মানুষ! আমায় একটু ঘুমোতে দেবে না, এই মতলব।

নরেশ আস্ফালন করে বলল—বেশ করব। আমার ঘরে আমি শিঙে ফুঁকব, তাতে কার কি?

জনৈক প্রতিবেশী তেড়ে উঠল, এ কি মগের মুলুক?

অপরজন বলল—আমার বউ চমকে উঠে ভিরমি যায় আর কি! ইয়ার্কি পেয়েছ?

তৃতীয় প্রতিবেশী টিপ্পনী কাটল, পাবলিক নুইসেন্স!

ক্ষান্তর নাকে কাঁদুনি থামে নি। সুযোগ বুঝে সে প্যান-প্যান করতে লাগল, আমি ভালমানুষের মেয়ে, একটু স্বস্তি পাবার জন্যে শুয়েছি, আর হতচ্ছাড়া কি না কানের কাছে ভোঁপর ভোঁ ভোঁপর ভোঁ আরম্ভ করেছে!

নরেশ শাসাল, দেখুন, গালমন্দ করবেন না বলছি। শালার মাসী বলে আর খাতির করতে পারব না। বেশ করব, বাজাব।

সে দ্বিগুন উৎসাহে শিঙা বাজাতে লাগল। সেই বিকট আওয়াজে ছোট ঘরে কান ফাটে আর কি। একজন প্রতিবেশী প্রতিবাদ করল, রেখে দাও শিঙে, নইলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে।

নরেশ বলল—কক্‌খনো না।

সে আবার যেই শিঙা বাজাতে গেছে, অমনি প্রতিবেশীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিঙা নিয়ে ধ্বস্তাধস্তি শুরু করল। ঠিক সেই সময়ে যুযুধানদের মধ্যে আবির্ভূত হল ফারুকী হোটেলের খানসামা মুর্গি-মাটন মোগলাই খানা নিয়ে।

কথা ছিল নমিতা-নরেশ বাইরে খানা সেরে ফিরবে সিনেমার শেষে। কিন্তু পাকেচক্রে পড়ে তো সিনেমায় যাওয়াই হল না। তাই নরেশ শিঙা নিয়ে ফেরবার সময় সামনের ফারুকী হোটেলে দুজনের মতো মোগলাই খানার অর্ডার দিয়ে এসেছিল। হোটেলের মালিক নরেশকে খাতির করে। সে বিনা দ্বিধায় রাস্তা পেরিয়ে নরেশের ফ্ল্যাটে খাবার পৌঁছে দিতে রাজী হয়ে গেল। এরকম আগেও হয়েছে। নরেশ ভেবেছিল, আহার ও ঔষধ দুই-ই হবে। ঘরে বসে মুর্গি-মাটন ওড়ানো যাবে। আর ঐ সব 'মেলেচ্ছ'-খাদ্য

দেখলে শুচিবায়ুগ্রস্তা আগন্তুক মহিলা বিরক্ত হয়ে হয়ত স্থানত্যাগ করতে পারে। তাই মোগলাই খানা নিয়ে যখন খানসামা 'হুজৌর—খানা—' বলে জানান দিল, ক্ষান্ত চোখ কপালে তুলে বিরক্ত হয়ে বলল, ও হরি, এ মেলেচ্ছ আবার কে?

খানার গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছিল। একজন প্রতিবেশী লড়াই থামিয়ে অবাক হয়ে বলল, আরে, আরে, এ যে সামনের ফারকী হোটেলের খানসামা। ও চাচা, খানা-টানা আছে নাকি?

—জী হাঁ। সাব্‌নে আর্ডার দে চুকা। হোম্ ডেলিভারি। সাব্‌নে কহ্যা ঘরমে খানা লাও।

অপর এক প্রতিবেশী বলে উঠল, টুরুস্, টুরুস্। আঃ, গন্ধেই বাজিমাৎ।

—কি দাদু, একা একাই খানা হবে নাকি? আর একজনের লোলুপ প্রশ্ন।

নরেশ দেখল এবার আগন্তুক মহিলাকে কোণ-ঠাসা করার সুযোগ এসেছে। প্রতিবেশীদের খাইয়ে-দাইয়ে হাত করতে পারলে আপদ বিদায় করা সহজ হবে. তাই সে বলল—দি আইডিয়া! আসুন, আমরা সবাই মিলে খাই। মাসীমার নিশ্চয় আপত্তি হবে না। সামসের, মেজ লাগাও।

খানসামা একটা টেবিলে ভোজ্যদ্রব্য রাখল। প্রতিবেশীদের জিভ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তারা তারিফ করে বলল, মুর্গিকারি। মটন চপ! শিক্‌কাবাব!

ক্ষান্ত তড়াক কবে পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠল, ও বাবা! কি মেলেচ্ছাচার! আমার সর্বনাশ হল গো। জাতজন্ম আর কিছু রইল না। বাছারা, এসব মুর্গিমাটন এখানে খেয়ে সব একাকার করিস নে, বাপধনেরা।

নরেশ স্ফূর্তির সঙ্গে বলল, হেঁ হেঁ বাবা। সবার ওপর হ্যাম্ স্যাণ্ডউইচ—শুয়োরের মাংস!

ক্ষান্ত আর্তকণ্ঠে বলল—ছি, ছি, ছি, হিঁদুয়ানী গেল। ও কত্তা, ও টেঁপি, কোথায় তোরা? এসব মেলেচ্ছের বাড়ি কেন এসে উঠেছিলুম গো! আগে জানলে কি এ বাড়ি-মুখো হতুম।

খুশী হয়ে উঠল নরেশ। সে ভাবল, এবার ওষুধ ধরছে। সে প্রতিবেশীদের বলল—নিন মশায়, খান।

প্রতিবেশীরা তারিফ করে খেতে শুরু করল। ক্ষান্ত নাকে কাপড় দিয়ে খোনা গলায় বলল—গঁন্ধ গঁন্ধ! ওঁরে ওঁ টেঁপি, ওঁ কত্তা—

—গন্ধে গন্ধে ঠিক এসেছি, এই বলে উৎসুক হয়ে হারাণ ঘরে ঢুকল।

—আমার মাঁথা কিঁনেছ! এঁদিকে যেঁ জাঁত-জঁন্ম গেঁল, সেঁদিকে হুঁশ আঁছে?

—এই মরেছে! ওরা মুর্গি-মাটন ওড়াচ্ছে! হারাণ বিস্ময় প্রকাশ করল।

নরেশ খেতে খেতে বলল—হ্যাম—শুয়োবের মাংস।

সে ইচ্ছে করে একটুকরো মাংস ক্ষান্তর দিকে ছুঁড়ে ফেলে নকল গলায় বলল—ঐ যাঃ মাসীমা, ছিটকে পড়ে গেল একটা!

আর ছিটকে বেরিয়ে গেল ক্ষান্ত, যেতে যেতে বলল, বাবা রে, গেলুম রে, এ মেলেচ্ছদের মধ্যে আর একদণ্ডও নয়। রাম, রাম, রাম।

প্রতিবেশীরা খুশী মনে বলল, যাক আপদ গেছে।

নরেশ হারাণকে বলল—এবার আপনিও পথ দেখুন। আর এখানে মায়া বাড়াচ্ছেন কেন? ঘরের ছেলে ঘরে যান।

—এই মরেছে। শ্বশুরের সঙ্গে ঠাট্টা! খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। পাঁচুবাবুর তামাক খেয়ে কি পেট ভরে?

প্রতিবেশীরা ডাকল—চলে আসুন, দাদু, ছিটেফোঁটা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন।

হারাণের লোভ লেগে গেল। সে দরজা দিয়ে মাথা বার করে দেখল ক্ষান্ত কাছাকাছি আছে কি না। তাকে না দেখতে পেয়ে সে আশ্বস্ত হয়ে খানায় যোগ দিল।

হারাণ একটুকরো মুর্গির ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বলল—গিন্নী নেই, এই সুযোগ! আঃ, বেড়ে রেঁধেছে! বাঃ—

প্রতিবেশীরা বলল—তা যা বলেছেন মাইরি। গ্র্যাণ্ড!

নরেশ এবার হতাশ হল। আগন্তুক ভদ্রলোক তো বিদায় হলই না, বরং খাবারে ভাগ বসাতে লাগল। নরেশ মনে মনে বলল—যাঃ, তাহলে আমার এই প্ল্যানটাও ভেস্তে গেল! তাহলে এখন করি কি?

প্রতিবেশীরা বলল—ভাবছেন কি? চলে আসুন দাদু, এখনও একটা গদা আছে। ওড়ান। ভাবনা কি?

এমন সময় গাছকোমর বেঁধে ঘরে ঢুকল ক্ষান্ত। সে কোথা থেকে এক বালতি গোবর জল নিয়ে এসেছিল, তাকে দেখে বিষম খেয়ে হারাণ দৌড়ে বাথরুমে ঢুকল। স্বামীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ক্ষান্ত গজগজ করে উঠল—যত্তসব মেলেচ্ছাচার আমি বরদাস্ত করব! ক্ষান্তমণি থাকতে ওসব নোংরামি চলবে না! রাস্তা থেকে এক তাল টাটকা গোবর জলে গুলে এনেছি। গোবরজলে সব নোংরা ধুয়ে যাবে। ক্ষান্ত দৃঢ়ভঙ্গিতে গোবরজল ছেটাতে লাগল। প্রতিবেশীরা ঘৃণাভরে বলল—এ্যাঁ, গোবরজল!

নরেশ বাধা দিয়ে বলল—করেন কি, করেন কি? ঘরদোর কাদায় কাদা! খাবারে নোংরা জল পড়ছে!

—তা বলে নোংরামি আমি সইব? এই বলে দ্বিগুন উৎসাহে ক্ষান্ত প্রতিবেশীদের মাথায় গোবর জল ছিটোতে লাগল। তারা বেগতিক দেখে বলল—ওহে, ব্যাপার সুবিধের নয়। কোথাকার কি নোংরা জল খাবারে পড়ছে। চল, চল, এই বেলা কাট্ মারি।

ওরা চলে গেল। সামসের খানসামা এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিন্দুদের কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। সে-ও দেখল অবস্থা জটিল হচ্ছে। সে বিনীতভাবে নরেশকে বলল—সাব, মেরা পয়সা।

—বেরো বেটা এখান থেকে। এই বলে ক্ষান্ত জলের বালতি নিয়ে আস্ফালন করতে সামসের চোঁ চা দৌড় মারল। এবার ক্ষান্ত নরেশের মুখোমুখি দাঁড়াল। তাকে একা পেয়ে ক্ষান্ত তার আপাদমস্তক দেখল, বলল—বাবাজীই যত নষ্টের মূল। নোংরার ডিপো! তোমার তো বাছা, গোবরজলের ছিটেয় হবে না। এই বালতি শুদ্দু ঢেলে নাইয়ে নিই।

বলতে বলতে হুড় হুড় করে সে নরেশের মাথায় গোবরজল ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার আপাদমস্তক ভিজে গেল। নোংরাজল নাকে-মুখে চোখে ঢুকে যেতে সে হাঁস-ফাঁস করে উঠল। খুশী হয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গিমায় ক্ষান্ত বলল—শুদ্দি, শুদ্দি, শুদ্দি।

নরেশ বিষম খেয়ে চীৎকার করল—নমিতা, নমু—নমু!

তার আর্তকণ্ঠ শুনে নমিতা ও সুরমা বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকল। নরেশ অভিযোগ করে বলল—নমু, দেখ তোমার গুণবতী মাসীর কাণ্ড!

নমিতা স্বামীর দুর্দশায় ভ্রূক্ষেপ না করে বলল—আঃ, কি বিরক্ত করো! দেখছ বোনটির সঙ্গে কত দিন বাদে দু'দণ্ড গল্প করছি! তাও সইছে না?

—এ্যাঁ, শেষে তুমিও ঐ দলে? থাক তোমার মাসী আর বোনটিকে নিয়ে। আমি চললাম। হাটে মাঠে যেখানে হয় রাত কাটাব।

হারাণ এতক্ষণ বাথরুম থেকে উঁকি মারছিল। নরেশের দুরবস্থা দেখে তার অনুকম্পা হল। সে দরজা দিয়ে মুখ বার করে নরেশকে পরামর্শ দিল, বাবাজী, পাঁচকড়ির তক্তাপোষে অনেক জায়গা আছে। আমার নাম করে বোল। আজকের রাতটা সে শুতে দেবে তার পাশে।

নরেশ হারাণের দিকে কটমট করে চেয়ে হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

নরেশ চেষ্টা করেও আগন্তুক পরিবারটিকে উচ্ছেদ করতে পারল না। তার সবচেয়ে রাগ হল এই কারণে যে, নমিতাও ওদের দলে ভিড়ে গেল। নরেশকে যেভাবে গোবরজলে চুবিয়ে দেওয়া হল, নমিতা সে ব্যাপার লক্ষ্যই করল না, বরং গল্প করার নেশায় ব্যাপারটিকে তাচ্ছিল্য করল। নরেশ বিরক্ত হয়ে দোকানঘরে মশার কামড় খেয়ে রাত কাটাল। মনে মনে প্যাঁচ কষতে লাগল কি ফিকিরে আপদগুলিকে বিদায় করা যায়। নরেশ দেখল যে দজ্জাল মেয়েছেলেটি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও একবার মাত্র পশ্চাদপসরণ করেছিল, সে

হল যখন প্রতিবেশীদের নিয়ে নরেশ মুর্গি-মাটন ওড়াল। ঐ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। ঐ প্রতিবেশীদের সাহায্যেই ওদের বিদায় করতে হবে। তাই নরেশ ঠিক করল আপাতত প্রতিবেশীদের নিয়ে নিজের ঘরে ক্লাব বসাবে, তাস-দাবা চলবে, সিগারেট-চুরুটের ধোঁয়ায় অন্ধকার নেমে আসবে, মায়-হুইস্কি সোডাও বাদ যাবে না। বেশ কিছু অর্থদণ্ড হবে। তা হোক, কোর্ট-কাছারি করতে গেলেও ত অনেক গুনগার দিতে হ'ত। প্রতিবেশীদের হুল্লোড় চলতে থাকলে ঐ জাঁহাবাজ মেয়েছেলে কতক্ষণই বা ঘরে টিকতে পারবে? যা হোক একটা উপায় মাথায় আসায় নরেশ কিছুটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফ্ল্যাটে ফিরে দেখে অদ্ভুত কাণ্ড। আসবাবপত্র বিপর্যস্ত। আলমারি দেরাজ ড্রেসিংটেবিল আর দেওয়ালের পাশে নেই, সেগুলিকে টেনে ঘরের মাঝে এনে একটা চলনসই পার্টিশান খাড়া করা হয়েছে। ঐ বড় ঘরটা ভাগ করে একটা অংশ রাখা হয়েছে নরেশদের জন্যে, অন্যটা আগন্তুকদের জন্যে। বাথরুম কমন, কিন্তু ভোর না হতেই কোথা থেকে একটি তোলা উনুন জোগাড় করে হারাণ ভট্টাচার্য ঘরের মধ্যেই রান্না শুরু করেছে। মেয়েরা কেউ বাড়ি নেই। এমন কি নমিতাও ওদের সঙ্গে কোথায় বেরিয়েছে।

নরেশ আর মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারবে না। এর মধ্যেই আপদগুলো জাঁকিয়ে বসেছে। তেড়ে ধরতে না পারলে ওদের শায়েস্তা করা যাবে না। নরেশ গোঁজ হয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে বেশ কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্লাবের জন্যে তাস-দাবা কিনতে, সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট চুরুট হুইস্কি সোডা পর্যন্ত।

প্রতিবেশীদের কাছে প্রস্তাবটা পাড়তে তো তারা হামলে পড়ল। নরেশবাবুর মত দিল্‌দরিয়া লোক হয় না। গত রাত্রে খানা খাইয়েছেন, আজ আবার জুয়োর আড্ডা বসবে। আপিস কামাই করে অনেকেই নরেশের ঘরে জুটে গেল। বেকার যুবকদের তো কথাই নেই। নরেশের খাটের ওপর আড্ডা জমে উঠল। তাস দাবার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট-চুরুটের শ্রাদ্ধ চলতে লাগল, এর ওপরে হুইস্কি-সোডা। তারা অল্প সময়ের মধ্যে হুল্লোড়বাজি জমিয়ে তুলল, মাঝে মাঝে উল্লাসে চীৎকার করতে লাগল, আর হিন্দী ফিল্মের সর্বাধুনিক গান বেসুরো গলায় গাইতে শুরু করল।

হারাণ ভট্টাচার্যও একা নয়। তার সঙ্গে যোগ দিল পাঁচকড়ি। ভোর না হতেই সে হারাণকে তোয়াজ করতে শুরু করেছিল, যদি কোনও রকমে সুন্দরী তরুণীটিকে নিজের ঘরে তোলা যায়। থাক না তার মা-বাপ সঙ্গে, তাতে লোকনিন্দা বন্ধ রাখা যাবে।

হারাণ বিরক্ত হয়ে বলল—একেবারে বেলেল্লাপনা! জামাইটা যে এমন দুশ্চরিত্র, তা জানা ছিল না। দেখছি মদের ফোয়ারা ছুটিয়েছে!

পাঁচকড়ি আগ্রহের সঙ্গে বলল—তাই তো বলছি আপনাকে, বাবাঠাকুর. এ সব

অসৎ সংসর্গ আপনারা ত্যাগ করুন। আসুন আমার ঘরে। আমি একা। এক-ধারেই পড়ে থাকব। আপনার ছোট্ট পরিবার আরামেই থাকবে। দ্বিতীয় পক্ষটি মরে গিয়ে অবধি আমি একেবারে একা।

—গৃহং তু গৃহিণীহীনম্ অরণ্যসদৃশং মতম্। বাবাজী, আমার কি আর অসাধ? কিন্তু মেয়েটাই যে বেঁকে বসেছে। বলে বুড়োর ঘরে উঠব না।

—আপনার অনুমতি হলেই—

—মেয়েটাকে শাসন করতে পারি না। আমার গৃহিণীকে জানো তো, তিনি একটু দৃঢ়চেত্রি।

—বলেন তো মা-ঠাকরুণকেই ধরি। কিন্তু তিনিও তো আমায় আমল দেন না। খালি সুজিত আর সুজিত। আরে, আমারই মালিকের ভাড়াটে! বেটা চাল-চুলোহীন বেকার। ভাড়া বাকী রাখে। না হয় জোয়ান বয়েস, তাই বলে আমার সঙ্গে টেক্কা দেবে? আপনি কিন্তু ওদের আস্কারা দেবেন না, বাবাঠাকুর। ছোট জাতের ছোকরা, আকাট মুখ্যু। আমি সদ্-ব্রাহ্মণ—আপনাদের স্বজাত। কিন্তু ওরা এখনও ফিরল না কেন?

—দক্ষিণেশ্বর গেছে। ফিরতে দেরী হবে। আমায় বলেছেন রেঁধে রাখতে।

—আহা, আপনার বড় কষ্ট। আমার যদি ছোট বউটাও বেঁচে থাকত, আপনাদের রেঁধে দিতে পারত। দিন না, আমি একটু হাত লাগাই।

—থাক, থাক। আমার ও সব অভ্যাস আছে। স্বাবলম্বী হও। বুঝলে, বাবাজী, স্বাবলম্বী হও। আমার নস্যের কৌটো—আমার নস্যের কৌটো—

হারাণ হাতা রেখে হাতড়াতে লাগল। কিন্তু সে নস্যের কৌটো আর খুঁজে পেল না, তাই হতাশ হয়ে বলল—গিন্নী না হলে কেউ আমার নস্যের কৌটো সামলাতে পারে না। আঃ—কোথায় গেল?

—আপনার জন্যে এক কৌটো পরিমল নস্যি এনেছি, বাবাঠাকুর।

গদগদ হয়ে পাঁচকড়ি হারাণের নেশার জিনিস যোগান দিল। সে হারাণকে হাতে রাখবার জন্যে পয়সা খরচ করে নস্যি কিনে এনেছিল, পকেট থেকে তা বার করে দিল। হারাণ খুশি হয়ে বলল—তাই নাকি? দাও, দাও, বাবাজী।

হারাণ মৌজ করে নাকে নস্যি গুঁজে তৃপ্তির সঙ্গে বলে উঠল—আঃ!

—তাই বলছিলাম, আমার ঘরে গিয়ে উঠলে, আপনাদের কোন কষ্ট হ'ত না, বাবাঠাকুর। আপনি ওদের বুঝিয়ে বলুন।

—দেখি মেয়েটা যদি রাজী হয়।

ঘরের ওপাশে নরেশের অতিথিদের হুল্লোড়বাজি চরমে উঠেছিল, এবার হারাণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সে বিরক্ত হয়ে বলল—আর বেলেল্লাপনা সইতে পারছি না। কি সব

গিলছে। যেমন গন্ধ! উঃ—

পাঁচকড়ি শুঁকে বলল—পোড়া পোড়া গন্ধ—বোধহয় ডালটা—

—ঐ যাঃ, ধরে গেছে।

তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নামিয়ে সভয়ে হারাণ বলল—কি হবে বাবাজী? ডালটা ধরে গেল। একবার চেখে দেখ তো।

হাতায় করে গরম ডাল পাঁচকড়িকে চাখতে দিল হারাণ। একে গরম, তার ওপর ধরা ডাল। পাঁচকড়ি ফেলতেও পারে না, গিলতেও পারে না, সে চোখ-মুখ বিকৃত করে ডালটুকু গিলে ফেলল। তারপর একটু বিষম খেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে কোনক্রমে হেসে সে বলল—না না, একদম ধরে নি। আঃ, কি তার হয়েছে!

—সত্যি তোমার ভাল লেগেছে? আমার হাতের রান্না গিন্নীর একদম পছন্দ হয় না।

হারাণ আবার অন্য পদ রান্নায় মন দিল। পাঁচকড়ি বিড় বিড় করে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে চলল।

ঘরের ওধারে নরেশ এক অতিথিকে পেগ্ এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল—চলবে নাকি আর এক পেগ্?

—না না, আর না।

কিন্তু মদের গ্লাস টেনে গলায় ঢেলে জড়িত কণ্ঠে লোকটি বলল—এই নিয়ে কুল্লে একডজন হল। কিন্তু আমি কি টলছি? অমন বিশডজন খেলেও আমি টলি না।

সে ভীষণ টলতে লাগল। নরেশ তাকে ধরে বসিয়ে দিল।

দ্বিতীয় অতিথি বলল—মাইরি, শালা, দিল্। যেন মালের মেয়াসাগর, আমরা সব্বাই হাবুডুবু খাচ্ছি, উঠছি, পড়ছি, আর হাবুডুবু খাচ্ছি।

লোকটি খুশী হয়ে সশব্দে নরেশের গালে চুমু খেয়ে বলল—তুমি ভায়া, সোনার চাঁদ ছেলে। বেঁচে থাক, জন্ম-ত্রয়োস্ত্রী হও।

তৃতীয় জন বলল—তুমিও একটু খাও না, ভায়া। লজ্জা কি? মদ খেলে বদ বলে যত বেটা নচ্ছার।

শেষের বাক্যটি সে বেসুরো কণ্ঠে গেয়ে উঠল। নরেশ বিনীত কণ্ঠে বলল—আপনাদের খাইয়েই আনন্দ। নিন, আর এক পেগ্।

দ্বিতীয় লোকটি নরেশের দাড়ি ধরে বলল—আমাদের নিয়েই দুঃখু ভোল ভায়া। তুমি এখন বিরহী যক্ষ।

সে নরেশের দুঃখে কেঁদে ফেলল। নরেশ বলল—তার চেয়েও অধম। বউ থেকেও নেই। দেখুন না অদৃষ্ট! কাল রাত্তিরে ব্রহ্মচারি বনে গেছি।

তৃতীয় ব্যক্তি সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করল—বৌমাটি ইলোপ কবল নাকি?

নরেশ বিরক্ত হয়ে ফেটে পড়ল, সেই কোন প্রাতঃকালে বেরিয়েছে কোথাকার কোন মাসীর সঙ্গে। শুনছি নাকি দক্ষিণেশ্বর বেলুড়মঠে টো টো করছে। বেলা যায়, এখনও দেখা নেই।

তৃতীয় জন বলল—আমারও কিন্তু ভায়া কান্না পাচ্ছে। আয় মোণ্ডা, আমরা দুজনে গলা জড়িয়ে কাঁদি।

সে মোণ্ডা নামক দ্বিতীয় সঙ্গীটির গলা জড়িয়ে কণ্ঠ মিলিয়ে সুর করে মড়াকান্না কাঁদতে লাগল—ওগো, বৌমা গো, তুমি কোথায় গেলে গো—

প্রথমজন আশ্বাস দিয়ে বলল—কাঁদিস নে ভাই, কাঁদিস নে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল—কাঁদব না? কোথাকার কোন মাসী এসে আমাদের বৌমাটিকে ইলোপ করল। ওগো বৌমা গো—তুমি কোথায় ইলোপ কবলে গো—

প্রথম জন রেগে বললে—ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়!

ঘরের এধারে পাঁচকড়িও বলছিল, ভারী অন্যায়, এ ভারী অন্যায়! ঐ সুজিত ছোকরাদের সঙ্গে মেয়েদের পাঠানো, ভারী অন্যায়! বাবাঠাকুর, টেঁপুরাণীকে অমন করে ছেড়ে দেবেন না। কোথাও লটিঘটি হবে শেষে—

—শাসন করব। খুব শাসন করব।

—সুজিত ছোঁড়াটাকে ধমকে দেবেন। কিন্তু দেখবেন টেঁপুরাণীকে কিছু বলবেন না। আহা, ছেলেমানুষ, মনে কষ্ট পাবে। আমায় একবার বললেন না কেন? আমি মা-ঠাকরুণদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে আনতে পারতুম। বাবাঠাকুর, মেয়ের এবার বিয়ে দিয়ে দিন।

—ইচ্ছে তো আছে, বাবাজী। কিন্তু সুবিধে মতো জোটাতে পারছি কই? আজকালকার ছেলেছোকরা বিবাহ-বিমুখ। পণ গ্রহণ না করে তারা পাণিগ্রহণ করে না, যদি না প্রেমে পতন হয়। গিন্নী তো ঐ জন্যে মেয়েটাকে চরতে ছেড়ে দিয়েছে, যদি বিনাপণে পাত্র জুটিয়ে আনতে পারে। কিন্তু পাত্র কই?

পাঁচকড়ি গদগদ হয়ে বলল, এই তো আপনার সামনে। কোনও পণ চাই না, জীবনপণ করতে রাজী আছি বাবাঠাকুর।

পাঁচকড়ি হুমড়ি খেয়ে হারাণের পায়ে পড়ল। হারাণ তাকে ধরে তুলল, বলল—আমার তো অমত নেই, বাবাজী। কিন্তু দেখলে না, মেয়ে যে নারাজ।

—ঐ সুজিত ছোকরাই আস্কারা পেয়ে টেঁপুরাণীর মন বিগড়ে দিয়েছে। কেন, পাত্তর হিসেবে আমি মন্দ কি? একবার দু'হাত এক করে দিন, আপনাকে সোনার

নস্যিদানী ভেট দেবো।

হারাণের মনে পড়ে গেল নস্যির কথা। সে বলে উঠল, এই মরেছে—আমার নস্যির কৌটো! সে কৌটো খুঁজতে লাগল, হাতের কাছে পেল না, উঠে পড়ল। পাঁচকড়ি দেখল হারাণের বসার জায়গায় নস্যির কৌটো। হারাণ সেটাকে চেপে বসেছিল। পাঁচকড়ি তাড়াতাড়ি বলল, আজ্ঞে এই তো চেপে বসেছিলেন।

হারাণ নস্যি টেনে খুশি হয়ে বলল—শতং জীব। তোমার প্রস্তাবটি ভেবে দেখব, বাবাজী।

অপরাহ্নে সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েদের দল ফিরে এলো। ক্ষান্ত আর নমিতার সিঁথেয় গদগদে সিঁদুর। সুরমার কপালে সিঁদুরের বড় ফোঁটা। ওদের হাতে জবাফুলের মালা, পূজোর প্রসাদ ভরা শালপাতার ঠোঙা। সুজিত ওদের সাময়িক গার্জেন হতে পেরে খুশীতে ডগমগ। সে বলল—কেমন? বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি তো? এখন তাহলে চলি?

সুরমা বলল, এর মধ্যে যাবে, সুজি? কিছু খেয়ে যাও।

—খাবারটা এখন তোলা থাক।

—বেশ, একটু রাত করে এসো, আজ আমাদের এখানে তোমার নেমন্তন্ন রইল, লক্ষ্মীটি।

—বহুৎ আচ্ছা।

নবীন প্রেমিকের গভীর দৃষ্টি দিয়ে সুজিত যেন সুরমাকে গ্রাস করতে চাইল। এত অল্প সময়ে এতটা ঢলাঢলি পাঁচকড়ি বরদাস্ত করতে পারল না। সে কটমট করে চেয়ে যেন সুজিতকে ভস্ম করতে চাইল।

নরেশের অংশে হুল্লোড় সমানে চলছিল। ক্ষান্ত নাক সিঁটকে বলল—ইস, ব্যাপার কি? এখানে মেছোহাটা বসেছে নাকি?

হারাণ হতাশ হয়ে অভিযোগ করল, একেবারে বেলেল্লাপনা!

নমিতা বলল, ওসব ওঁরই দুষ্টুবুদ্ধি মাসী। হোক-না হোক তোমাদের বিরক্ত করা। দাঁড়াও শায়েস্তা করছি।

সে গটমট করে নরেশের অংশে গিয়ে ঝংকার দিয়ে স্বামীকে বলল, এসব কি হচ্ছে, এ্যাঁ? আমার বাপের বাড়ির লোকেদের তাড়াতে না পারলে বুঝি স্বস্তি নেই?

নরেশ মাতালের অভিনয় করে স্বেচ্ছাকৃত জড়িত কণ্ঠে বলল, একটু ফুর্তি করছি, প্রেয়সী। তোমার হাত থেকে সারাদিন নিষ্কৃতি পেয়ে ভারী আনন্দ হচ্ছে, তাই বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীদের নিয়ে উল্লাস করছি।

—তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে। মদ খেয়েছ?

—একটু খাবে নাকি? (সুর করে) মদ খেলে বদ বলে যত শালা নচ্ছার। হি হি হি হি।

—ছি ছি ছি ছি, তোমার লজ্জা-সরম নেই? বিদেয় কর, বিদেয় কর এসব।

কিন্তু নরেশ স্ত্রীর অনুরোধে কান দিল না। সাময়িক বন্ধুরা হুল্লোড় চালাতে লাগল। তাদের চীৎকারে স্বামী-স্ত্রীর বচসা চাপা পড়ে গেল।

সুজিত চলে যেতেই পাঁচকড়ি গদগদ হয়ে সুরমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, যেন একটু ছোঁয়া লাগানোর জন্যে সে ব্যাকুল। সুরমা তার ভাব-গতিক দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, পাঁচুবাবু, আপনি আমার গায়ে পড়বেন নাকি?

—তোমারই টানে, টেঁপুরাণী।

—আবার ঐ নাম ধরে ডাকছেন? বারণ করেছি না?

—সে বারণ আমি শুনব না, টেঁপু। তোমার জন্যে আমার ঘর আঁধার হয়ে আছে। 'আমার আঁধার ঘরের আলো, সখি জ্বালো, সখি জ্বালো।'

ক্ষান্ত ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হারাণকে ধমক দিল, মুখপোড়া, ডালটা পুড়িয়েছ তো?

হারাণ সাফাই গাইল—পাঁচু বললে পোড়ে নি, খেতে বেশ হয়েছে।

—শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। রাখো তোমার পেঁচো।

নিজের বিকৃত নামটা কানে যেতেই পাঁচকড়ি সভয়ে প্রেমনিবেদনে বিরত হয়ে বলল—আজ্ঞে, মা-ঠাকরুণ?

কিন্তু নরেশের অংশ থেকে এত চীৎকার উঠল যে ওদের কথা আর শোনা গেল না।

নমিতাকে লক্ষ্য করে জনৈক প্রমত্ত প্রতিবেশী সুর করে গাইল, শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলাল ঘরে—

অপর একজন বলল—ওয়েলকাম্ হোম, মাইডিয়ার বধূমাতা।

তৃতীয় জন চিৎকার করল, থ্রি চিয়ার্স ফর নরেশ-নমিতা!

আর সকলে বলল—হিপ্ হিপ্ হুররে! হিপ্ হিপ্ হুররে!

নরেশ উৎসাহ দিল, এন্‌কোর, এন্‌কোর, থামবেন না। দোহাই আপনাদের। জোরসে বলুন হিপ্ হিপ্ হুররে!

মাতালদের চিৎকারে ঘর ফাটাবার উপক্রম। নরেশ খুশী হল। সে ভাবল এই নারকীয় উল্লাস সহ্য করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হবে না। তার ধারণা ঠিক।

এবার ক্ষান্ত আর ধৈর্য ধরতে পারল না। সে তেড়ে বলল, তবে রে মুখপোড়া জামাই? তোর পেটে পেটে এই ছিল? আমার ওপর মাতাল লেলিয়ে দিবি? ক্ষান্তমণি

হার মানবার পাত্রী নয়। আজ লঙ্কাকাণ্ড করে ছাড়ব।

পাঁচকড়ি সভয়ে বলল, ঘরদোরে আগুন দেবেন না যেন, মা-ঠাকরুণ। মনিব তাহলে আমায় আস্ত রাখবে না।

—মুয়ে আগুন! আমি কি সেই লঙ্কাকাণ্ড বলেছি? দেখ আমার লঙ্কাকাণ্ড। কোথায় গেল আমার লঙ্কার কৌটো?

হারাণ তাড়াতাড়ি স্ত্রীর হাতে লঙ্কার কৌটো তুলে দিল। লঙ্কা বার করে ক্ষান্ত বলল—এই আস্ত আস্ত লঙ্কা উনুনে ঢেলে দিই—দেখি হতভাগারা আর কত জাম্বুবানের মতো চেঁচাতে পারে।

এই বলে সে মুঠো মুঠো লঙ্কা উনুনে ঢালল, তারপর মেয়েকে টেনে নিয়ে বারান্দায় আশ্রয় নিল গ্যাসের ঝাঁঝ থেকে বাঁচতে, হারাণও তড়াং করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তারা সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। লঙ্কার ঝাঁঝালো গ্যাসে ঘর ভরে গেল। কেসে কেসে সবাই প্রায় কুপোকাৎ।

মাতালদের নেশা ছুটে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল, আর এখানে একদণ্ড নয়। কি গ্যাস ছেড়েছে, বাবা। কাফিং গ্যাস। কেসে কেসে নেশা ছুটে গেল।

কেবল কাসির ধমক, কাসি, কাসি, আরও কাসি। নমিতা ছুটে গিয়ে বাথরুমে আশ্রয় নিল।

কাসতে কাসতে জনৈক প্রতিবেশী বলল—মাসীমাতা তোমার মনে এই ছিল?

অপর জন ক্ষোভ প্রকাশ করল, পরের পয়সায় হুইস্কি টানছিলুম, তাই সইল না? লঙ্কার ঝাঁঝে নেশা ছুটে গেল যে!

—চল ভায়া, আমরা তোমার ঘরে ঘিয়ে মৌতাত করি।

—বোতলটা নিতে ভুলো না ব্রাদার, গুডবাই মাসীমাতা। গুডবাই বধূমাতা।

ওরা কাসতে কাসতে মদের বোতল গুছিয়ে চম্পট দিল।

কিছুক্ষণ কেসে বেদম হয়ে নরেশ পাঁচকড়ির দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইল। তারও হাল খারাপ। নরেশ হতাশ হয়ে বলল—থার্ড টাইম আন্‌সাকসেসফুল! শালারা আমার রোজগারের টাকায় বোতল উড়িয়ে পালাল, কিন্তু কাজ হাসিল হল না।

পাঁচকড়ি বিমর্ষ হয়ে বলল, আমারও হাসিল হল না। এখন আমি করি কি?

বিরক্ত হয়ে নরেশ বলল, যান, যান, এখন আমার বুদ্ধি দেবার সময় নেই। স্ত্রী-বুদ্ধি র কাছে হার মানছি। এখন এই আপদগুলোকে বিদেয় করি কি করে? বউ তো মাসী বলতে অজ্ঞান। সঙ্গী পেয়েছে পরচর্চা করবার, আর কথাই নেই। হটর হটর করে এখানে সেখানে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমি শালা ব্রহ্মচারী বনে গেলুম, সেদিকে হুঁশ নেই। পাঁচুবাবু সত্যি বলছি, এবার লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে যাব! আদরের মাসীরা

থাকুন—আমি যাই।

—বলেন কি দাদা? এই কি আপনার সন্ন্যেসের বয়েস? সব সমিস্যের সমাধান হয় যদি মা-ঠাকরুণ আর তাঁর মেয়েটিকে আমার ঘরে তোলাতে পারেন।

আপনার তো ভারী দুঃসাহস! দুটোকেই ঘরণী করতে চান নাকি?

পাঁচকড়ি লম্বা জিভ কেটে কান মলে বলল, কি যে ঠাট্টা করেন? ঠাকরুণের মতো ঘরণী হলে আমায় ঘরের বাইরেই থাকতে হ'ত। কিন্তু ওঁর মেয়ে—আহা, সে যদি ঘরণী হয়, দাদা, আমি আর ঘরের বার হবো না, দিনরাত তাঁর আঁচল ধরে বসে আগলে থাকব।

—তবে তো ভাড়াটেদের মহা সুবিধে! ম্যানেজারবাবু আর ভাড়ার তাগাদায় বার হবেন না।

—একবার এই সতীলক্ষ্মীর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি কি আর এ পোড়ার চাকরি করব? বুঝলে দাদা, একেবারে দেশে। তোমাদেরই টাকায় কিছু জমিজমা করেছি। বৌ নিয়ে সেখেনেই পালাব। শহরের ছোঁড়াগুলো যা হ্যাংলা। টেঁপুরাণীকে টপ করে গিলে ফেলবে!

—আপনি বুঝি এর মধ্যেই মেয়েটির প্রেমে মজে গেছেন?

—তোমার কাছে গোপন করব না দাদা, ওকে দেখে অবধি সারারাত ঘুমোতে পারি নি। ওর কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে ধক ধক ধক ধক করে।

—তা হলে আপনিই পারবেন।

—কি পারব?

—টেঁপুরাণীকে বিয়ে করতে।

—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক দাদা। বাবাঠাকুর তো রাজী, কিন্তু মেয়েটা বেঁকে বসেছে। ঐ যে বেজাতের সুজিত ছোঁড়া, ওর ওপর দেখি বেশ টান। বেটার লজ্জা নেই। এরই মধ্যে টেঁপু ডাকে সুজি, ও বেটা ডাকে, চিনি, চিনি। লে হালুয়া!

—সুন্দরী বীরভোগ্যা। আপনি বুকে বল আনুন, সাহস দেখান। বক্সিং লড়তে পারেন? এক ঘুঁষিতে সুজিতকে নক আউট করতে পারেন? জানি পারেন না। কিন্তু বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। একটু বুদ্ধি খরচ করুন।

—খরচা করে ফতুর হবার যোগাড়। বাবাঠাকুরকে আজ নস্যির কৌটো কিনে দিতে গিয়ে না হোক পাঁচ-পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। তবু কার্যসিদ্ধি হল না।

—নিখরচায় কার্যসিদ্ধি হবে আর শ্রীমতী টেঁপুরাণীকে ঘরে তুলবেন, যদি আমার পরামর্শ শোনেন।

—সত্যি? তুমি বল দাদা, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।

—পাঁচকড়িবাবু, এই ঘরে ভূত নামাতে হবে।

—বল কি? কিন্তু ফরমাশ মতো ভূত এখন পাই কোথা?

—আরে মশায়, আমি কি সত্যি সত্যি ভূত নামাতে বলছি?

—তবে?

—শুনুন, কানে কানে বলি, দেওয়ালেরও কান আছে। পাঁচ কান হলে সব ভেস্তে যাবে।

নরেশ পাঁচকড়ির কানে কানে পরামর্শ দিতে সে উল্লাসে লাফিয়ে উঠল। চট করে নরেশের পাযের ধুলো নিয়ে সে বলল—পায়ের ধুলো দাও দাদা। আর মুহূর্ত দেরী না করে আমি ফাকুকী হোটেলে যাচ্ছি।

পাঁচকড়ি ধড়ফড় করে বেরিয়ে গেল। নরেশ আপন মনে বলে উঠল, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য! ভূতের পেঁচোকে দিয়ে এই কিম্ভূতদের বিদেয় করব। দেখি কি হয়। নমু, নমু—ওগো—রাণি—

নমিতা বাথরুম থেকে ঘরে এলো। অভিমানভরে সে বলল—যাও, আর সোহাগ দেখাতে হবে না।

—বড্ড রাগ করেছ আমার ওপর—না? সত্যি আমি মদ খাই নি।

—মিথ্যে কথা। তুমিও বয়ে গেছ।

—সত্যি বলছি, আমার মুখের গন্ধ শুঁকে দেখ।

সে নমিতার মুখের কাছে মুখ এনে হাঃ হাঃ করতে লাগল।

নমিতা নাক সিঁটকে বলল—উঃ, বিচ্ছিরি! কি রকম সিগারেট সিগারেট গন্ধ!

—ওই হল। হুইস্কির গন্ধ নয় তো?

—তবে ঐ রকম মাতলামি করছিলে কেন?

—তোমায় দেখেই মাতাল হয়ে গিয়েছিলুম, প্রিয়ে। কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে!

—যাও, আর ঢঙ করতে হবে না। তুমি কিন্তু আমার বাপের বাড়ির লোকদের একেবারেই দেখতে পার না। মাসীমারা এলো, কোথায় তাদের একটু খাতির যত্ন করবে, তা নয়, গোড়া থেকেই ওদের উত্যক্ত করছ।

—ঘাট হয়েছে প্রিয়ে, আমায় কি শাস্তি দেবে বল?

—দেবোই তো শাস্তি। ওঁরা রাগ করে তখন থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁদের খাতির করে ডেকে নিয়ে এসো।

—তাতে তোমার মন পাবো তো?

—নিশ্চয়। আজকে টেঁপু মাসীদের দিকেই শোবে। তুমি এই ঘরে খাটের ওপর শুতে পারো।

—মার দিস কেল্লা। শ্যালিকা আড়ি-টাড়ি পাতবে না তো?

—যাও ! তোমার যেমন কথা। ডাক মাসীমাদের। শেষে ওঁরা হিম লাগিয়ে অসুখ বাধাবেন ?

—তথাস্তু প্রিয়ে।

নরেশ বারান্দার কাছে গিয়ে গদগদ কণ্ঠে ডাকল, মাসীমা, মাসীমা, টেঁপু, টেঁপুরাণী—

দরজায় এসে দাঁড়াল ক্ষান্তমণি।

ক্ষান্ত গৃহস্বামীর অভাবনীয় পরিবর্তনে অবাক হয়ে বলল—কেন, এত সোহাগ কিসের ? জুতো মেরে গরু দান। না হয় আমাদের ঘর-দোর নেই। তাই বলে এত হেনস্তা ? মাতাল লেলিয়ে অপমান ? আমি কাঁদব, আমি মড়াকান্না কেঁদে বাড়ি মাথায় করব। পাড়ার লোক জানুক, কত বড় লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে আমরা মেয়ে দিয়েছি। ওগো আমার কি হল গো—

ক্ষান্ত সত্যি সত্যি মড়াকান্না শুরু করল।

নরেশ বিব্রত হয়ে বলল—দোহাই মাসীমা, পায়ে পড়ি মাসীমা। আর চোখের জল বাজে খরচ করবেন না। আমি তো হার মানছি। থাকুন না, যতদিন খুশি থাকুন।

—সত্যি বলছ ? হ্যাঁ মা বঁচু, জামায়ের মত বদলেছে ?

—হ্যাঁ, মাসীমা। তোমার জামাই কি তোমায় হেনস্তা করতে পারে ?

—এ মা তোমারই বশীকরণ। টেঁপু—ওরে টেঁপু—বারান্দা থেকে কার সঙ্গে কথা বলছিস ?

সুরমা বাইরে থেকে বলল—কোথায় কথা বললুম ? ও কিছু না। মালাই বরফ যাচ্ছে, দর জিজ্ঞেস করছি।

—আর এই ঠাণ্ডায় মালাই বরফ খায় না। ইদিকে আয়।

নরেশ মোলায়েম করে ডাকল, টেঁপু, টেঁপুরাণি—এসো, ঘরে এসো।

—আয় মা টেঁপু। দ্যাখ দেখি জামাইবাবু তোকে কত ভালবাসে। কত আদর করে ডাকছে।

নমিতা ভালবাসার কথা শুনে বিরক্ত হল। সে বলল—ও কি কথা মাসীমা। সুরমা, ঘরে এসো। ঠাণ্ডা লাগবে।

খুশীতে ডগমগ হয়ে সুরমা ঘরে ঢুকল। সে মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজেছিল। সে বলল—কি মা ? বড্ড মাথা ধরেছে। তাই বারান্দায় হাওয়া খাচ্ছিলুম। দিদি তোর বারান্দাটা বেশ। তার ওপর ফুলগাছের টব। আমি কিন্তু লোভ সামলাতে পারি নি। কটা ফুল তুলে খোঁপায় পরেছি।

নরেশ তারিফ করে বলল—গ্রাণ্ড্ ! কি সুন্দর মানিয়েছে !

নমিতা হিংসায় জ্বলে উঠে বলল—আহা, ন্যাকামি করো না। এমন আর কি

মানিয়েছে?

ক্ষান্ত আশ্বস্ত হয়ে মেয়েকে বলল—তোর জামাইবাবুর আর অমত নেই। এখানেই থাকতে সাধাসাধি করছে। কিন্তু মেয়ে যেন কি? জামাইবাবুর সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করবি, তা নয়!

সুরমা রঙ্গ করে বলল—জামাইবাবু তো নয়, যেন দুর্বাসা মুনি!

ক্ষান্ত বলল—মুনিদেরও তপস্যা ভাঙে। পুরুষমানুষের একটু রাগ হওয়া ভাল। তা না হলে কি ওর বাপের মতো হবে? সাত চড়েও রা বেরোয় না।

নরেশ সরস কণ্ঠে বলল—শ্রীমতী টেঁপু আমায় হাজার চড় মারলেও আমি গাল পেতে দেবো। শ্যালিকা—প্রাণ-পালিকা—হৃদি-নালিকা—রক্ষাকালিকা—

সুরমা বলল—ধেৎ, আপনি ভারী অসভ্য! আমি বুঝি রক্ষেকালী?

ক্ষান্ত খুশী হয়ে বলল—নাও শালী-ভগ্নীপোতে মস্করা করো, আমি একটু শুদ্দু হয়ে আসি। ঐ মাতালগুলোর বেলেল্লাপনায় রাস্তার কাপড় ছাড়তে পারি নি। গা ঘিন ঘিন করছে। আমার বোতল—আমার বোতল—

নরেশ নিজেই খুঁজে বার করে ক্ষান্তর হাতে বোতল তুলে দিল—এই যে মাসীমা।

—আহা দাও, আমার গোবরজলের বোতল দাও। একটু ছিটিয়ে দিই। কি সব যা-তা গিলেছ! শুদ্দু হও।

নরেশ নাক টিপে গোবরজলের ছিটে নিয়ে বলল—দিন মাসীমা। আপনার পবিত্র গোবরজলের কৃপায় আমার সব পাপ ধুয়ে যাক।

ক্ষান্ত আবদার করল—বাবা, একটা কাজ করতে হবে। আমার গোবরজল খতম। কোথাও থেকে ভর্তি করে আন।

এই বলে সে নরেশের হাতে গোবরজলের বোতল ধরিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে কলের ঘরে ঢুকল।

নরেশ আর থাকতে পারল না, বিরক্ত হয়ে বলল—হোপলেস!

সুরমা বলল, এর মধ্যেই হোপলেস! তবু তো মা এখনো আপনাকে গোবরজল খাওয়ায় নি।

—এ্যাঁ, সেও অদৃষ্টে আছে নাকি?

নমিতা বলল, টেঁপু তোমার সঙ্গে রসিকতা করল—যাও, এই বেলা অন্ধকার আছে, রাস্তা থেকে খানিকটা গোবর যোগাড় করে জলে গুলে নিয়ে এসো, নইলে মাসীমার ঘুম হবে না।

নরেশ চীৎকার করে উঠল—বিষ আনব, বুঝলে বিষ আনব। নইলে আমি নিষ্কৃতি পাব না।

সে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

সুরমা চোখ কপালে তুলে বলল—জামাইবাবু যেন কি? এই সোহাগ এই রাগ।

—আর বলিস নি ভাই। এই মানুষকে নিয়ে ঘর করতে হয়।

—তোর কিন্তু বেশ কাটে, দিদি। মোটেই একঘেয়ে লাগে না।

—বিয়ে না করে সবাই অমন কথা বলে। বিয়ে করার পর দু'চার বছর যেতে না যেতে ভারী একঘেয়ে মনে হয়।

—তা যাই বলিস, বিয়ে যদি করতে হয় তো জামাইবাবুর মতো লোককেই করা উচিত।

নমিতা বিরক্ত হল, সে বাধা দিয়ে বলল—ওসব আবার কি কথা? কেন তোর সুজিত মন্দ কিসে? দেখিস হুড়মুড় করে বেশীদূর এগোস নি। শেষে বেজাতের ছেলেব সঙ্গে একটা—

—ধেৎ! দিদি যেন কি: সত্যি সুজি এত দুষ্টু! এতক্ষণ কি করছিল জানিস? একতলা থেকে হাঁ করে আমার দিকে চেয়েছিল। ভারী অসভ্য। আমি পট করে একটা ফুল তুলে টুপ করে ওর মুখের ভেতর ফেলে দিলুম। তখন ও ইশারায় ঝগড়া শুরু করে দিল আমার সঙ্গে। তাইতেই বারান্দা ছেড়ে আসতে দেরী হল!

—ওমা, তুই কি মিথ্যুক, ভাই। বললি মালাই বরফের দর করছি! তোদের ইযে এর মধ্যে এতটা জমেছে!

—ধেৎ!

এমন সময় নরেশ ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রবেশ করল। সে ব্যগ্র হয়ে বলল—হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার!

—কি হল? ব্যাপার কি? মেয়েরা বলল।

—আর এ বাড়িতে বেশী দিন নয়।

নমিতা জিজ্ঞাসা করল—কেন, কেন?

নরেশ যেন সভয়ে বলল—বিধুবাবুর বউ একেবারে অজ্ঞান। ডাক্তার-বদ্যি হার মানল। হঠাৎ জ্ঞান হয়ে হাত-পা খেঁচা, দাঁত কিড়মিড়ি। নিজের চোখে দেখে এলুম মাথায় ঝাঁটা বেঁধে গলায় জুতো ঝুলিয়ে নৃত্য করছে। আর নাকিসুরে গান ধরেছে, পুঁটিকে বলিস খেঁদি পুড়ে মরেছে।

—তার মানে? নিশ্চ য় পাগল হয়েছে, বলল সুরমা।

নরেশ বিজ্ঞের মতো বলল—তার তো চিকিৎসা আছে। কিন্তু এ রোগের চিকিৎসা কই? বিধুবাবুর মা বলছে—বৌকে ভূতে পেয়েছে। কলকাতা শহরে ডাক্তার মেলে। কিন্তু রোজা পাওয়া যায় কোথায়?

সুরমা ভয় পেয়ে নমিতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল—ধেৎ, যত্ত সব বাজে কথা!

নরেশ বলল—বাজে কথা? শুনলুম খেঁদি বলে কোন মেয়ে পাঁচবছর আগে ঐ ঘরে শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরেছিল। চল না সব, একবার বিধুবাবুর বৌকে দেখে আসবে। ঐ তো আমাদেরই ওপর তলায়।

নমিতা ভীত হয়ে বলল—হুঁ, আমার দায় পড়েছে।

সুরমা নমিতাকে জড়িয়ে ধরে বলল—জামাইবাবু আর কথা পেলেন না? এই রাত্তিরে যত ভূতের গল্প?

—বিশ্বাস না হয়, দেখেই এসো নিজে।

—হুঁ, আমার বয়ে গেছে। সুরমা ঝংকার দিয়ে উঠল

নরেশ বলল—হরিবাবুও বললেন ওঁর ঘরেও নাকি রাত্তিরে দুমদাম আওয়াজ হয়। কিসের একটা নাকিসুরের কান্না—

সুরমা নমিতার আরও কাছে গিয়ে সভয়ে বলল—আমিও, দিদি, কাল রাত্তিরে যেন ঐরকম একটা শুনেছিলুম। তাই তো ভয় পেয়ে তোকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

নমিতা বলল—আমাদের শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা উচিত।

নরেশ বলল—তুমি ভয় পাবে তাই এতদিন বলিনি। ক'রাত্তির ঘুম ভাঙতেই দেখি ঘোমটা দেওয়া একটা মূর্তি সাঁৎ করে জানলা দিয়ে সরে গেল।

নমিতা সুরমাকে জড়িয়ে ধরে বলল—কি সর্বনাশ! তুমি এই কথা লুকিয়ে রেখেছ?

—হুঁ, এ আবার একটা জাহির করার মতো কথা! আমি ওসব ভূত-টুত বিশ্বাস করি না।

—রাম, রাম! ওসব বলবেন না জামাইবাবু। ওঁরা হাওয়ায় ভর করে আনাচে কানাচে কখন ঘুরে বেড়ান তার ঠিক নেই। সত্যি দিদি, মা একদিন ভরসন্ধ্যেবেলা পুরনো বাড়িতে ওঁদের একজনের দর্শন পেয়েছিল। জিগ্যেস কর মাকে। ইয়া চওড়া লালপাড়, মাথায় টকটকে সিঁদুর, কিন্তু গালের এক দিকটা পুড়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। মা তো হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। মুখে গোঁ গোঁ আওয়াজ হতে লাগল। পরে জানলুম যিনি দেখা দিয়েছিলেন তিনিও আগুনে পুড়ে অপঘাতে গত হয়েছেন।

নরেশ গম্ভীর হয়ে বলল—লোকে বলে ওঁরা নাকি আসবার আগে জানান দেন। ইট পাটকেল, হাড়মাস ওঁদের আসার পথে ঠিকরে পড়ে।

নমিতা কম্পিত কণ্ঠে সাহস দেবার চেষ্টা করে বলল—যাক্‌গে ওসব কথা। মা কালী ভরসা। ওসব অপদেবতা কিছু করতে পারবে না।

সুরমা ত্রস্ত হয়ে অনুরোধ করল—জামাইবাবু, বড় হিম আসছে। ঠাণ্ডা লাগবে। বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিন না।

—না, খোলা থাক। বেশ হাওয়া আসছে।

নমিতাও ভীতকণ্ঠে হুকুম করল, দাও না বন্ধ করে। ছোট শালী একটা আবদার করছে, সেটা রাখতেও আপত্তি? দাও বন্ধ করে।

—আমি পারব না, তোমরা বন্ধ করো।

—নমিতা বলল—ভাবছ আমরা ভয় পেয়েছি? মোটেই না। যা তো টেপি, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয় তো।

—আমার ভারী সর্দি হয়েছে। হিমের রাতে ঠাণ্ডা লাগবে। তুই বন্ধ করে দে ভাই!

নমিতা—বেশ। আয়, দুজনে একসঙ্গে যাই।

সে সুরমাকে টানতে টানতে বারান্দার দিকে যেতেই সেখানে ঠকাস করে কি একটা পড়ল। ওরা সভয়ে পিছিয়ে এল চিৎকার করে, ওরে মা-রে।

নরেশ বলল—বোধহয় ওঁরা জানান দিচ্ছেন। দেখ না কি পড়ল?

নমিতা বলল—আমার দায় পড়েছে। দাও না দরজা বন্ধ করে।

নরেশ বলল, দেখি কি পড়ল?

সে বারান্দায় গিয়ে একটা কাগজ মোড়া ঢিল তুলে আনল, কাগজটা খুলে নিয়ে পড়তে পড়তে বলল—চিঠি। আমার প্রাণের চিনি, মন-ভোমরা, মোহনভোগ—

সুরমা লাফিয়ে গিয়ে নরেশের হাত থেকে চিঠি কেড়ে নিয়ে বলল—ও আমার চিঠি। খবরদার পড়বেন না।

নমিতা কৌতূহলের সঙ্গে বলল, নিশ্চয় সুজিতের প্রেমপত্র! দে আমি পড়ি।

সুরমা বলল—এদিকে আয়, আমরা দুই বোনে পড়ি—নইলে জামাইবাবু শুনে ফেলবে।

সে নমিতাকে টানতে টানতে হারাণের অংশে এসে চিঠি পড়তে শুরু করল। সে সময় নরেশ রাগে নিজের চুল টানতে লাগল।

সুরমা পড়তে লাগল—আমার প্রাণের চিনি, মন-ভোমরা-মোহনভোগ। তুমি বারান্দা থেকে চলে যাওয়া অবধি আমার মন হাঁকুপাঁকু করছে, আবার বারান্দায় এসো, নইলে—উঁ উঁ উঁ।

নমিতা সাগ্রহে বলল—নইলে, পড় না।

—উঁ উঁ উঁ উঁ। না, আমি আর পড়তে পারব না। সুজিটা কি দুষ্টু! এসব কথা চিঠিতে লেখে?

—কি লিখেছে, সবটা পড় বলছি। দে আমায়, আমি পড়ি।

বারান্দায় আবার সজোরে ঠকাস করে আওয়াজ হল। সুরমা বলল, নিশ্চয় আবার একটা চিঠি। দিদি, তুই এটা পড়। আমি ওটা নিয়ে আসি।

নমিতার হাতে চিঠিটা গুঁজে দিয়ে পড়ি মরি করে ছুটে গেল সুরমা। বারান্দায় পা দিয়ে কি একটা কুড়িয়ে নিয়ে ঠক করে সেটা ফেলে সভয়ে চীৎকার করে সে ছুটে ফিরে এসে নমিতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল।

নমিতা প্রশ্ন করল—কি হল টেপু? ভয় পেলি কেন?

সুরমা ত্রস্ত কণ্ঠে বলল—পাঁ-পাঁ-পাঁঠার হাড়।

নরেশ এবার আশ্বস্ত হয়ে বলল—কই দেখি?

সে বারান্দা থেকে কুড়িয়ে আনল বেশ বড় আকারের একটা হাড়। সে বলল—ওঁরা নিশ্চয় জানান দিচ্ছেন। ওঁরা আসবার আগে ঐ সব অঘটন ঘটে।

নমিতা চীৎকার করে বলল—ফেলে দাও, ফেলে দাও ওটা।

নরেশ পাঁঠার হাড়টা ছুঁড়ে বারান্দায় ফেলে দিল। নমিতা সভয়ে বলতে লাগল, রাম, রাম, রাম, রাম—

সুরমা ভীত কণ্ঠে বলল—দিদি, কি হবে? কেন মরতে এই ভুতুড়ে বাড়িতে এসেছিলুম বাবা। মাকে ডাকি—মা—মা—

নমিতা বলল—জোরে জোরে রাম নাম কর।

ওরা দুজনে মিলে রাম-রাম করতে লাগল। ক্ষান্ত স্নান সেরে ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল, হ্যাঁ রে টেঁপি, তুই অমন চীৎকার করে উঠলি কেন?

নমিতা আর সুরমা তখনও রাম-রাম করতে লাগল। ক্ষান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে নরেশকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি, বাছা, ওরা রাম-রাম করছে কেন?

—ও কিছু না, মাসীমা। বারান্দায় একটা পাঁঠার হাড় পড়েছে।

নমিতা গর্জন করে উঠল—কিছু না কিছু না করো না বলছি। কালই পুরুত ডেকে একটা স্বস্ত্যেন করাতে হবে।

সুরমা বলল—রাম-রাম-রাম-রাম।

ক্ষান্ত এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে বলল—পাঁঠার হাড়! কি ঘেন্না, কি ঘেন্না! চান করে একটু শুদ্দু হয়েছি। আর ঐ সব নোংরা হাওয়া লেগে শরীর অশুদ্দু হল। যাই আবার চান করে আসি।

সুরমা মা-র হাত ধরে বাধা দিল, বলল—যেও না, মা। ভারী ভয় করছে। ওঁরা আসার আগে জানান দেন।

ক্ষান্ত প্রশ্ন করল, কারা? হ্যাঁ রে, কারা?

সুরমা জড়িত কণ্ঠে বলল ভূ-ভূ-ভূ-ভূত—

ক্ষান্ত কাছে সরে এসে চাপা ভয়ের সঙ্গে বলল—যাঃ, যত সব অলক্ষুণে কথা! নিশ্চয় কাক চিল ফেলেছে।

সুরমা সভয়ে প্রতিবাদ করল, ইয়া বড় হাড়—এই রাত্তিরে কাক চিল আসবে কোথা থেকে? রাম-রাম-রাম—

ক্ষান্ত আরও কাছে সরে এসে বলল—তোদের সব মিথ্যে ভয়।

এমন সময় দপ্ করে আলো নিবে গেল। বাইরের আধো-অন্ধকার বারান্দার দিকটাকে অস্পষ্ট করে রাখল। ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার।

মেয়েরা ভয় পেয়ে চীৎকার করল, এ কি! কে আলো নেবালে? দেখ না কে আলো নেবালে?

নরেশ এবার শুরু করল, রাম-রাম-রাম-রাম।

হঠাৎ ওপর থেকে বারান্দার দরজায় নেমে এলো একটা ছায়ামূর্তি, মাথায় লম্বা ঘোমটা। নরেশ চীৎকার করে উঠল, ঐ, ঐ সেই ঘোমটা দেওয়া—

মেয়েরা ততক্ষণ আতঙ্কে চেঁচাতে লাগল, আঁ—আঁ—আঁ—

সমস্ত ঘর বিভীষিকায় স্তব্ধ। হঠাৎ বারান্দার তলা থেকে সুজিতের কণ্ঠ শোনা গেল, চোর—চোর—চোর—চোর—

বলতে বলতে বুঝি নল বেয়ে সুজিত বারান্দার ধারে উঠে এলো, রেলিং টপকে লাফিয়ে নামল। ছায়ামূর্তি সরে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সুজিত ততক্ষণে ছায়ামূর্তিকে জাপটে ধরে ফেলেছে। ছায়ামূর্তি সভয়ে চেঁচাল, ছাড়, ছাড়, বলছি।

—এই যে ছাড়ছি, ঘুষি-রদ্দা ঝাড়ছি, বলে সুজিত দমাদ্দম মারতে লাগল তাকে।

লোকটা মার খেয়ে কঁকিয়ে উঠল—আমি চোর নই। মেরো না বাবা, দোহাই বাবা।

সুজিত দুটো থাপ্পড় মেরে বলল—কে তুই সোনারচাঁদ? বল শালা, তুই কে?

লোকটি ঘোমটা খুলে বলল—আমি পাঁ—পাঁ—পাঁচকড়ি।

নরেশ ছাড়া আর সকলে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, এ্যাঁ—পাঁচকড়ি?

শুধু নরেশ বিড় বিড় করে বলল—মার্ডার! ম্যাসাকার! আবার আনসাকসেসফুল!

সুজিত লজ্জিত হয়ে বলল—ইস, পাঁচুবাবু! কি করছেন আপনি এখানে?

নমিতা অবাক হয়ে বলল—এ বেশে কেন? সাদা থান পরেছেন, ঘোমটা দিয়েছেন—?

সুরমা ধমক দিল, এমনি করে ভয় দেখায়? আমি তো পেত্নী বলে ভুল করেছিলুম।

ক্ষান্ত গর্জন করল, পেঁচো, তোর মনে এই ছিল?

পাঁচকড়ি আমতা আমতা করতে লাগল।

সুজিত বাহাদুরি নেবার জন্যে বলল, নিচের থেকে দেখি সুরমাদেবীর বারান্দায় কে যেন সুড়ুৎ করে নেমে এলো। অমনি সন্দেহ হল। দিন কাল ভাল নয়। ভাবলুম,

আলবৎ চোর। নল বেয়ে উঠে এলুম বারান্দায়, রেলিং টপকে দেখি, এই বাছাধন। এখন বলুন পাঁচুবাবু, কি মতলবে এখানে?

ক্ষান্ত শাসাল, বল শীগগির, নইলে পুলিস ডাকব। ভদ্দরলোকের বাড়ি চড়াও হয়েছে। মেয়েদের ওপর—

পাঁচু কাতর কণ্ঠে বলল— দোহাই মা-ঠাকরুণ। এই ছোকরার হাতে চোরের মার খেয়েছি, আর পুলিসের হাতে পেটন নয়।

নমিতা তীব্র স্বরে বলল, তবে কেন এসেছেন, বলুন, বলুন?

পাঁচকড়ি আত্মরক্ষার জন্যে বলল—আপনার কত্তাকে জিজ্ঞেস করুন। আমার চেয়ে উনি ভাল জানেন।

নবেশ আমতা আমতা করে বলল—বা রে, আমি—আমি কি জানি?

পাঁচকড়ি বলল—কি নরেশবাবু, আমায় বেকায়দায় পেয়ে মিছে কথা বলছেন? আপনিই না আমায় ফন্দী দিলেন 'পাঁচুবাবু, মেন সুইচ নিবিয়ে দিন, অন্ধকারে ভূত সেজে বারান্দায় নেমে আসুন।' ঐ ছোকরার হাতে পড়ে সত্যি সত্যি ভূত হতে যাচ্ছিলুম আর কি!

সুজিত তেড়ে উঠল—ভূতেরও রোজা আছে। দাঁড়ান আজ ভূত ছাড়াব। আগে চট করে মেন সুইচটা অন করে দিয়ে আসি।

সে ঘরের দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ক্ষান্ত নরেশের দিকে কটমট করে চেয়ে বলল—ও, জামাই বাবাজীর মনে এত প্যাঁচ!

নরেশ অস্বীকার করে বলল—সব মিছে কথা, আমি কিছুই জানি না।

পাঁচকড়ি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল—আমায় বললেন, ভয় দেখালে ওঁরা আমার ঘর ছেড়ে চলে যাবেন—'

—আর আপনার ঘরণী হবেন! বাকীটুকু বলুন। বিয়ে-পাগলা বুড়ো! ওকে নিয়ে একটু মজা করছিলুম, মাসীমা। নরেশ সাফাই গাইল।

এর মধ্যে আলো জ্বলে উঠল। ক্ষান্ত পাঁচকড়ির আপাদমস্তক দেখে বলল—এর নাম মজা? দেখ, দেখ, একবার পেঁচোর চেহারাটা দেখ! আমি তো হার্টফেল করেছিলুম আর কি! কি বে-আক্কেলে কাণ্ড!

আস্তিন গুটিয়ে সুজিত ফিরে এলো, মুখে বাহাদুরির হাসি! সুরমা তাকে দেখে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল—ভাগ্যে সুজি এলো! নইলে আমরাই ভূত হয়ে যাচ্ছিলুম আর কি!

সুজিত আস্ফালন করে বলল—হুঁ হুঁ, কেমন? আমি ছিলুম তাই তো?— আমায়

কি দেবে বল?

সুরমা সলজ্জ হেসে বলল—ধেৎ, সব সময় তোমার ইয়ার্কি। দেখ, পাঁচুবাবুকে কেমন মানিয়েছে। আহা, আঁধার ঘরের কালোমাণিক!

সুজিত পাঁচকড়ির দাড়ি ধরে বলল—দেখি, চাঁদমুখ দেখি।

পাঁচকড়ি বলল—এ পোড়ামুখ আর দেখাব না। আমার প্যাঁজ-পয়জার দুটোই হল। একে হয়রানি—

—আর তার ওপর বেইজ্জত। সুজিত কথা কেড়ে নিয়ে বলল—বুড়ো বয়সে সুরমা দেবীর ওপর নজর! চল্ চল্, তোকে এই বেশে পাড়া ঘুরিয়ে আনি। চল্।

সুজিত পাঁচকড়ির ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতে লাগল, পাঁচকড়ি বিরক্ত হয়ে বলল—ছাড়, ছাড় বলছি। মাইরি মরে যাব।

—চল্ চল্, একবার বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি পাড়ার সবাইকে দেখিয়ে আনি। সুজিত আবার ঘাড়ে ধাক্কা দিতে লাগল।

সুরমা বলল—ভারী মজা। আমিও তোমার সঙ্গে যাই সুজি।

সুজিত পাঁচকড়িকে ঘাড়-ধাক্কা দিতে দিতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। খুশীতে উচ্ছল হয়ে সুরমাও ওদের পিছু পিছু চঞ্চল পদে যেতে লাগল। ওরা চলে যেতে নরেশের অপরাধী মুখের দিকে চেয়ে নমিতা বলল—তুমি এমন হাঁদামার্কার মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ক্ষান্ত নরেশের আপাদমস্তক দেখে তীব্র স্বরে বলল—কি! জামাইবাবাজীর পেটে পেটে এত শয়তানী! মাতাল-মেলেচ্ছ দিয়ে হল না, আবার ভূত নামানো।

—সর্বরক্ষে! নমিতা বলল—আমি তো ভয়েই আধমরা হয়ে গিয়েছিলুম। বলি তোমার মতলবটা কি? তুমি কি চাও মাসী-বোনের সঙ্গে আমিও পটল তুলি? আমার আত্মীয়েরা আসা অবধি তুমি ওঁদের পিছনে লেগেছ। পেয়েছ কি?

ক্ষান্ত সায় দিয়ে বলল—ও মা বঁচু, তোর বর তুই সামলা। আমি বললেই মন্দ হবে। জামাই না তো একটা কাদাখোঁচা, হাড়গিলে, কেলেগোলার বাচ্চা—

নরেশ রাগে ফেটে পড়ল—কি, বাপ তোলা? ঢের সয়েছি আর সইব না। যা মুখে আসবে তাই বলবেন? এ আমার ঘর, আমি এর ভাড়া গুঁজি। আমি এর মালিক।

নমিতাও গলা চড়িয়ে বলল—কি মাসীমার মুখে মুখে চোপা! লজ্জা-সরম ভদ্রতার বালাই সব গেছে? সাপের পাঁচ পা দেখেছ? অসভ্য, অভদ্র কোথাকার! ঝকমারি হয়েছে তোমার মতো ইতরের হাতে পড়ে। আমি আজই বাপের বাড়ি চলে যাব।

ক্ষান্ত প্রমাদ গণল। নমিতা যদি সত্যি স্বামীর ঘর ছেড়ে যায়, তবে ক্ষান্তদেরও পথে বসতে হবে। নমিতাকে কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না। তাই ক্ষান্ত আশ্বাস দিয়ে বলল—

কেন যাবি মা? তোর নিজের ঘরদোর ছেড়ে কোথায় যাবি তুই? ওই হতভাগা যে চুলোয় যাক্। আমরা আছি তোকে আগলে রাখব।

নরেশ চীৎকার করল—নমিতা, এই শেষ বারের মতো বলছি, এই পাড়াকুঁদুলী, কোলাব্যাঙ মেয়েছেলেকে আমাদের ঘর থেকে দূর করে দাও, নইলে—

—দেখ্ মা দেখ্। তোর দিকে টেনে কথা বলছি বলে, আমাকে যা নয় তাই বলে গালমন্দ পাড়ছে। আমি পাড়াকুঁদুলী? তুই—তুই একটা বিশ্ববকাটে, পাঁড়মাতাল, টেঁসকুমড়ো!

—ফের ঐ সব বলছেন?

—বলব না? আমি কোলাব্যাঙ? তুই একটা কালসাপ, রামছুঁচো, বাস্তুঘুঘু, গন্ধগোকুল।

নমিতাও যোগ দিয়ে বলল—বদমেজাজী বিতিকিচ্ছি, হিংসুক! আমার আত্মীয়-স্বজনদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না। নমিতা চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল।

নরেশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—থাক তোমার আত্মীয় নিয়ে। মনের সুখে ঘরকন্না করো। আমি লোটা-কম্বল নেব, কপনি পরব, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব। সে রাগ করে দ্রুতপদে চলে গেল।

—তাই যাক। আমার বঁচুমার হাড়ে বাতাস লাগুক। তুমি কিছু ভেবো না মা। আমরা আছি। ক্ষান্ত ভড়ং করে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

তৃতীয় পর্ব

নরেশের চলে যাবার পর কিছুদিন গত হয়ে গেল। তার কোন সংবাদ না পাওয়ায় নমিতা উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু ক্ষান্তমণি তাকে আশ্বাস দিল, কোথায় আর যাবে? রাগ হয়েছে, দু'দিন বাদে রাগ পড়ে গেলে সুড়সুড় করে চলে আসবে।

অবশ্য নরেশের দোকান বন্ধ থাকে নি। বিশ্বস্ত কর্মচারী দোকান খুলছিল আর হিসাব-নিকাশ মনিবের অবর্তমানে মনিব-পত্নীর কাছে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এতে সংসারের বিশেষ অসুবিধা হয় নি। কিন্তু সপরিবারে ক্ষান্তমণি নমিতার সংসারে জাঁকিয়ে বসার দরুন খরচ হঠাৎ বেড়ে গেল। দোকানের আয়ে চলে না। নমিতা বাধ্য হয়ে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার করতে শুরু করল। ক্ষান্তই যেন সংসারের গিন্নী। সুরমা আর ক্ষান্তর মাঝখানে পড়ে নমিতার উচিত-অনুচিত বোধশক্তি যেন স্তিমিত হয়ে গেল।

ক্ষান্ত ঘরের পার্টিশান তুলে দিল। আসবাবপত্র পুরাতন জায়গায় আশ্রয় পেল। দুই সংসার যেন সাময়িকভাবে এক হয়ে গেল। সুজিত ঐ ঘরে যতক্ষণ পারে আস্তানা

গাড়ল। সুরমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আবও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

এমনি একদিন নমিতার পোশাকী শাড়ী পরে নমিতারই সরঞ্জাম নিয়ে সুরমা প্রসাধনে ব্যস্ত ছিল। তাকে দেখাচ্ছিল ভাল। সুজিত একটা তালিমারা পাঞ্জাবি পরে সুরমার প্রসাধন-পর্ব লক্ষ্য করছিল। সে যেন চোখ দিয়ে প্রেমিকাকে গিলে ফেলছিল। তখন বেলা হয়েছে। দুজনে একত্র বার হবে বিশেষ উদ্দেশ্যে।

সুরমার প্রসাধন শেষ হল। সে প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সুজিতের দিকে দেখল। কিন্তু পরক্ষণেই সুজিতের ছেঁড়া পাঞ্জাবির দিকে নজর পড়তে সুরমা বলল—বাঃ, আমি এত সাজগোজ করলুম, আর তুমি ঐ বেশে যাবে? সুজি, তোমার কি টেস্ট! সাধে কি তোমায় চাকর বলে ভুল করেছিলুম?

সুজিত কিন্তু কিন্তু হয়ে বলল—মাইরি বলছি, এই ছেঁড়া পাঞ্জাবি ছাড়া আর আমার ভাল পোশাক নেই। তোমার হুকুম মানতে গেলে আমায় পোশাক ভাড়া করতে হবে।

সুরমা বলল—যাও, তা কেন? ধার করো। আমি যেমন দিদির শাড়ী না বলে ধার করেছি, তুমিও জামাইবাবুর সিল্কের পাঞ্জাবি নিয়ে নাও।

—না বলে তার পাঞ্জাবি পরব? যদি ধরা পড়ি?

—আহা, ধরবে কে? জামাইবাবু তো ক'দিন বাড়ি-মুখো হন নি। মা-র পরামর্শ শুনে দিদি বললে—ও থাকুক না ক'দিন গোঁসা করে, শেষে সুড়সুড় করে সুবোধ বালকের মতো বাড়ি এসে ঢুকবে। এখন আমরা আছি বেশ। ক'দিন কোন ঝঞ্ঝাট নেই। মা-ও পার্টিশান তুলে দিয়েছে!

—তবে দাও পরের ধনে পোদ্দারি করি। অমন গুরুজনেরা যখন পথ দেখাচ্ছেন, তখন আর আপত্তি কি?

সুরমা আলমারি খুলে নরেশের ভাল পাঞ্জাবী বার করে সুজিতের হাতে দিয়ে বলল—নাও, এই সিল্কের পাঞ্জাবিটা পরো। কলঘরে গিয়ে মুখে সাবান দিয়ে এসো। আমি তোমার গায়ে একটু সেণ্ট ঢেলে দিই।

—তথাস্তু। আমি এখনই আসছি। তুমি কিন্তু তৈরী হয়ে থেকো। এদিকে তোমার বাবা-মা এসে পড়লে আমাদের প্ল্যানে বাধা পড়বে।

—সেজন্যে ভাবতে হবে না। আমিই না দিদির সঙ্গে ওদের গঙ্গা নাইতে পাঠালুম। গঙ্গা নেয়ে মন্দিরে পুজো দিয়ে ওদের আসতে আসতে অনেক বেলা হবে। আমি তো মাথা ধরেছে বলে রয়ে গেলুম। আমি ততক্ষণ একটা ছোট্ট চিঠি লিখে রাখি। বাড়ি ফিরে ওরা আমায় না দেখে শেষে ভাবনা শুরু করবে।

—সেই ভাল। বলে সুজিত কলঘরে ঢুকল।

সুরমা বাইরের দরজা দিয়ে পিছন ফিরে একাগ্রমনে চিঠি লিখতে বসল। কাজেই

সেই অবসরে কখন নরেশ ঘরে ঢুকল, সুরমা জানতেই পারল না।

নরেশের পরনে সন্ন্যাসীর গেরুয়া আলখাল্লা। নমিতাকে বিব্রত করার জন্যে সে ওটা ভাড়া করে এনেছিল। নরেশ চুপি চুপি ঘরে ঢুকে ভাবল নমিতা একা বসে বসে চিঠি লিখছে। আসলে নমিতার চেনা শাড়ীটাই তার ভ্রমের কারণ। সে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে শাড়ী-ধারিণীর চোখ টিপে ধরল।

সুরমা চমকে উঠে বলল—কে? কে?

সে তাড়াতাড়ি নরেশের হাত সরিয়ে দিল।

নরেশ আসল ব্যাপার জানতে পেরে বলল—ও, তুমি তো নমিতা নও—সেই মেয়েটা!

—আপনার লজ্জা করে না, একলা ঘরে মেয়েমানুষের চোখ টিপতে? আবার গেরুয়া পরেছেন?

—চিনব কি করে? তুমি যে নমিতার শাড়ি বাগিয়েছ।

সুরমা এতক্ষণে ছদ্মবেশের আড়ালে নরেশকে চিনতে পারল। ঈষৎ লজ্জার সঙ্গে সে বলল—ওমা, জামাইবাবু! গেরুয়া পরে আপনি কোত্থেকে?

—বিবাগী হয়ে গেছলুম শ্বশুরবাড়ি। শাশুড়ী ঠাকরুণ আবার সংসারী হতে বললেন।

—ঐ বেশে আবার কেউ শ্বশুরবাড়ি যায় নাকি?

—শ্বশুরবাড়ি তো ছার, যে কোনও বেশে আমি জাহান্নমেও যেতে রাজী। নমিতা কই?

—দিদি বাবা-মায়ের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে গেছে।

—অ্যাঁ, একটুও দুঃখ নেই আমি চলে গেছি বলে! হটর্ হটর্ করে গঙ্গা নাইতে যাওয়া।

—কেন? আমি তো রয়েছি। শ্যালিকা—প্রাণ-পালিকা—

—গুল্-মারিকা! আর গুল মারবার জায়গা পাও নি, তোমাদের সব ব্যাপার ধরা পড়েছে। উঃ কি চক্রান্ত!

—ব্যাপারখানা কি?

—আকাশ থেকে পড়লে যে! আর নয়। আজই একটা হেস্তনেস্ত করব। আগে এই পোশাকের ভড়ংটা বদলে আসি কলঘর থেকে।

নরেশ কলঘরের দিকে যেতে গেল। সুরমা তিড়িং করে লাফিয়ে নরেশের সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বলল—না, না, যাবেন না, যাবেন না।

—কি, আমার নিজের ঘরদোরেও এক্তার নেই?

—সে জন্যে নয়। কি জানতে পেরেছেন আগে বলুন।

—বলব বলেই তো এসেছি। তোমরা একটা জোচ্চর, জাঁহাবাজ। শ্বশুর বাড়ি স্বয়ং গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলুম, ওঁদের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

—ওঃ, এই জেনেছেন? স্রেফ ধাপ্পা! দিদিকে বলুন না আপনার কথা, সে বিশ্বাসই করবে না।

—হুঁ, হুঁ, বাবা, বিশ্বাস করবার ব্যবস্থা করিয়েছি। পাথুরে প্রমাণ! খোদ শাশুড়ী ঠাকরুণ চিঠি দিয়েছেন। তিনি নিজেই আসতেন। জামাইয়ের সন্ন্যাস কি আর চোখে দেখতে পারেন? নেহাত বাতে পঙ্গু, তাই চিঠি পাঠিয়ে দিলেন।

—বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা।

—বিশ্বাস হচ্ছে না? নরেশ চিঠি বার করে পড়তে লাগল, কল্যাণীয়া নমু, ক্ষান্ত বলে আমার কোন বোন নেই, হাবাণ ভটচায্যির নামও শুনিনি। তুমি—

—মিথ্যে কথা, দেখি চিঠি। এই বলে সুষমা খপ্ করে নরেশের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল, বলল—এই ছেঁড়া টুকরোগুলো নর্দমার জলে ঢেইয়ে দিই।

এই বলে সে চকিতে কলের ঘরে ঢুকে পড়ল, যেখানে ছিল সুজিত।

নরেশ হকচকিয়ে গিয়ে বলল—উঃ কি বদ্ মেয়ে! আমার শাশুড়ীর চিঠিটা বেমালুম লোপাট করে দিলে? এখন আমি করি কি? ফরাসপুরে গিয়ে আর একখানা চিঠি আনতেও তো অনেক সময় লাগবে। নমিতাকে সত্যি কথা বোঝাই কি করে?

এমন সময় ঢুকল প্রতিবেশীরা। প্রথম জন বলল—এই যে, নরেশবাবু, ঘরমুখো হয়েছেন দেখছি। আমার টাকাটা এবার ফেলে দিন।

অপর দুজনেরও একই দাবী—আমারটাও!

নরেশ অবাক হয়ে বলল—কিসের টাকা মশায়?

প্রথম জন বলল—সেটাও বলে দিতে হবে? ধারের টাকা, বুঝলেন, ধারের টাকা।

নরেশ রেগে বলল—আমি মশায় কারও কানাকড়ি ধারি না।

দ্বিতীয় জন জানাল, কিন্তু আপনার পরিবার ধারে।

তৃতীয় জন সায় দিল, আর ধারবে না-ই বা কেন? কর্তা রাগ করে বিবাগী হয়ে গেলেন। সতীলক্ষ্মীর কোন ব্যবস্থা করলেন না। সেই-বা কি করে? বাধ্য হয়ে আমার কাছে পঁচিশ টাকা ধার নিয়েছে ঐ টেবিলটা বাঁধা রেখে।

—আমার কাছে একশো, ঐ আলমারিটা বাঁধা রেখে, দাবী জানাল দ্বিতীয় জন।

প্রথম জন বলল—আমার কাছে পালংকটা বাঁধা রেখে দেড়শো টাকা ধারেন।

—মিথ্যে কথা, নরেশ প্রতিবাদ করল—ক'দিন মোটে ঘর ছাড়া, এর মধ্যে এত খরচ হতেই পারে না।

প্রথম জন বলল—সেটা মশায় আমাদের জানবার কথা নয়। পরিবারের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। এখন সুবোধ বালকের মতো আমার টাকাটা ফেলে দিন।

—আর দেরী নয় চাঁদ। আমার টাকাটা সুড়-সুড় করে উগরে ফেল, বলল দ্বিতীয় ব্যক্তি।

তৃতীয় প্রতিবেশী বলল—আমি ছা-পোষা মানুষ। আমার কি তেজারতির কারবার! আর দেরী নয় বাপধন, শুনলুম ব্যাঙ্কে তোমার অনেক টাকা। চেক সই না হলে টাকা উঠবে না। এদিকে বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না।

নরেশ ওদের এড়াবার জন্যে বলল—মশায়, সন্ন্যাসী হয়ে গেছি, তাতেও নিষ্কৃতি নেই! সত্যি বলছি, আপনাদের পাওনার কথা আমি কিছু জানি না। উনি আসুন জিজ্ঞেস করি। তখন একটা না হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

প্রতিবেশীরা এই কথা শুনে ক্ষেপে উঠল। একজন গর্জে বলল, কি. আমাদের অবিশ্বাস!

অপরজন বলল. আমরা যেন ভোগা দিয়ে নিতে এসেছি!

তৃতীয় ব্যক্তি শাসাল, ফেলে দিন টাকা, নইলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। শ্বশুরালয়ের কুটুমদের নিয়ে ফূর্তি করবেন উনি, আর আমরা তার রসদ জোগাব?

—এক পয়সাও দেবো না, নরেশ রেগে বলল, আমায় না জানিয়ে টাকার নয় ছয়! বেরিয়ে যান সব আমার ঘর থেকে।

প্রতিবেশীরা হন্যে হয়ে হৈ -চৈ শুরু করল, চালাকির জায়গা পাওনি পরিবারের দেনা শোধ করবে কি না? টাকা নিয়ে গাফ! ভেবেছ মগের মুল্লুক! ভদ্দরলোক বলে ছেড়ে কথা বলব না। টাকা দেবে কি না?

—দেবো না, দেবো না, এক পয়সাও দেবো না, নরেশ হাঁকল।

প্রতিবেশীরা বলল, আমার বন্ধকী মাল আছে। পালাবে কোথা চাঁদু! চল চল কুলি ডেকে পুরনো ফার্নিচারের দোকানে ওগুলো ঝেড়ে দিয়ে আসি।

ওরা জটলা করে বেরিয়ে গেল।

নরেশ দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরে বলল—এরা আমায় পাগল করে মারবে। আমি এবার ডিরেক্ট একশান করব।

সে কলের ঘরের বন্ধ দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা মেরে বলল—শুনছ, ভাল চাও তো বেরোও বলছি।

সুরমা সুড়ৎ করে বেরিয়ে এসে ঝট করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইল, পাছে নরেশ কলের ঘরে ঢুকে সুজিতকে দেখে ফেলে।

নরেশ তেড়ে বলল, এই আমার শেষ কথা। তোমরা এখান থেকে যাবে কি না?

সুরমা কাতর স্বরে বলল, আমাদের তাড়াতে পারলেই তো বাঁচেন। এতই মন্দ আমরা? না হয় আপনার শালী নাই হলুম। তাই বলে আমায় একটুও দেখতে পারেন না? এমন কি অপরাধ করেছি আপনার কাছে? ঘর-ভুঁই-ছাড়া, দু'দিন যদি আপনার আশ্রয়ে উঠি, তাই বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবেন?

সুরমা কাঁদতে লাগল। স্ত্রীলোকের ব্রহ্মাস্ত্রে আহত হয়ে নরেশ বলল—ও কি, তুমি কাঁদছ কেন?

—কাঁদব না? না হয় আপনার শালী নই। তাই বলে এত হেনস্তা এত অনাদর! সুরমা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

নরেশ বিব্রত হয়ে বলল—আহা কান্নাকাটির কি আছে? আমি আবার ওসব সইতে পারি না। তোমার দোষ কি? তোমার মা-বাবাই যত নষ্টের মূল!

—আবার বাপ-মা তোলা! জানি না, আর কত অপমান বরাতে আছে। এর চেয়ে আমার ফুটপাথই ভাল ছিল।

আরও কান্না। নরেশ ব্যস্ত হয়ে বলল—কি মুশকিল! সত্যি তোমার দোষ নেই। লক্ষ্মীটি, তুমি কেঁদো না। মুখ তোল।

নরেশ নিজের হাতে সুরমার মুখ তুলল। তার রোদনসিক্ত আনন দেখে দরদভরে নরেশ বলল, নাও, চোখ মোছ, আচ্ছা, আমিই মুছিয়ে দিচ্ছি।

নরেশ রুমাল দিয়ে নিজে সুরমার চোখ মুছিয়ে দিল। এত কাছ থেকে কান্নাভরা সুন্দর মুখ দেখে নরেশ বিগলিত হয়ে বলল, বাঃ, তোমায় তো বেশ দেখতে! একেবারে 'মার দিস কেল্লা' ফিলিমটার হিরোইনের মতো!

সুরমা ফিক করে হেসে বলল, যান, আপনি ভারী দুষ্টু! আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবেন না। এই তো বললেন আমি আপনার শালী নই।

—বলেছিই তো। আমার বৌয়ের শাড়ীটা পরে ঠিক তোমাকে আমার বৌ বৌ দেখাচ্ছে।

—কেবল দুষ্টুমি! মিষ্টি হেসে কটাক্ষ হেনে সুরমা বলল, দিদি শুনলে কি বলবে? আমাদের দুজনকেই আর আস্ত রাখবে না।

আর আস্ত রাখবে না—কথাটা নরেশের কানে কড়াৎ করে লাগল। হঠাৎ সে ভাবল, মেয়েটির কথায় সে সব মুশকিল-আসানের হদিস পেয়ে গেছে। সে তুড়ি মেরে উল্লাসে বলল, ইউরেকা, ইউরেকা! এমন একটা সহজ ব্যাপার আমার মাথায় আসে নি?

সুরমা প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার?

নরেশ বলল, তোমায় আমি ভালবাসি।

—কি বলছেন জামাইবাবু?

—আবার বলছি, তোমায় আমি ভালবাসি। তোমার এত রূপ আমি নজর করিনি! আমার আর তর সইছে না। ডাইরেক্ট একশান। আমি তোমায় বিয়ে করব।

—কি বলছেন! এক স্ত্রী থাকতে বিয়ে? দুটো বিয়ে? এই আপনার সন্ন্যাস?

—আমি ফেলে দিচ্ছি এ বেশ। একেবারে বরবেশে তোমার সামনে হাজির হবো। কোথায় আমার সিল্কের পাঞ্জাবি?

নরেশ ব্যস্ত হয়ে আলমারি খুলে সিল্কের পাঞ্জাবি খুঁজতে লাগল। এই সুযোগে সুজিত কলঘর থেকে বেরিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করল।

সুরমা তাকে বাধা দিয়ে চুপি চুপি বলল, করছ কি, সুজি? পাঞ্জাবি সুদ্ধু ধরা পড়ে যাবে যে!

—ধরা পড়ি পড়ব, হাঁফিয়ে উঠেছি, এতক্ষণ বন্ধ কলঘরে থেকে হাঁফিয়ে উঠেছি।

—সব ফাঁস হয়ে যাবে, লক্ষ্মীটি একটু সবুর করো।

সুজিত সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করল, তুমি কি সত্যি সত্যি নরেশদাকে বিয়ে করছ?

—ওসব কথা পরে হবে, এখন ঢোক তো কলঘরে।

সুরমা সুজিতকে জোর করে আবার কলঘরে ঢুকিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল।

নরেশ আলমারি হাতড়ে সিল্কের পাঞ্জাবি না পেয়ে বলল—নাঃ, পাঞ্জাবিটা পাচ্ছি না।

সুরমা কাঁচুমাচু মুখে বলল, বোধহয় ধোপার বাড়ি কাচতে গেছে।

—হবেও বা, তবে এই গরদটাই পরি। কেমন, আমায় মানাবে তো? তোমার পছন্দ হবে তো? যাই কলের ঘর থেকে পোশাক বদলে আসি।

সে কলঘরের দিকে পা বাড়াতেই সুরমা পথ আগলে বলল—না না—যাবেন না, যাবেন না!

—কেন? তোমার আপত্তি কিসের? আমি এখনই পোশাক বদলে আসছি।

—আচ্ছা, আপনি কি ক্ষেপেছেন?

—হ্যাঁ। ক্ষেপেছি। একদম উন্মাদ হয়ে গেছি। তোমায় পাবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছি। আমি তোমায় আলবৎ বিয়ে করব—নয়তো হার্টফেল করব।

—সত্যি বলছি, আমি আপনার শালী নই। আমার সঙ্গে অমন রসিকতা করবেন না।

—রসিকতা! আমার জীবন-মরণ সমস্যা! আর তুমি বলছ রসিকতা?

—আপনার মতলবটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি সত্যি বলছেন, না অভিনয় করছেন?

—আমার কথা শুনে কি অভিনয় বলে মনে হয়? বল কিসে তোমার সন্দেহ ঘুচবে। বেশ, আমি তোমার পায়ে পড়ছি।

নরেশ সুরমার পদতলে পড়ে বলে উঠল, দেহি পদপল্লবমুদারম!

সুজিত আর বন্দী থাকতে পারল না। সে কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে হতাশ হয়ে প্রশ্ন করল, নরেশদা, তোমার মনে শেষে এই ছিল?

নরেশ মাটিতে বসে বসেই বলল—আরে সুজিত, তুই কলঘরে কি করছিলি?

—নিশ্চয় জলের কল মেরামত করছিলুম না এই সিল্কের পাঞ্জাবি পরে?

—আরে, ঐ তো আমার পাঞ্জাবি, এইটাকেই তো এতক্ষণ খুঁজছিলুম। ওটা তোর গায়ে উঠল কি করে? তুই কি ধোপার কাজ নিয়েছিস নাকি?

—আর ঠাট্টায় কাজ নেই। সুরমা, বল কি তোমার মনের কথা? সুজিত কাতরকণ্ঠে দাবী করল।

নরেশ বলল—আরে, তুইও ওর মনের কথা জানতে চাস নাকি? বল, রমু, তুমি আমায় বিয়ে করবে?

নরেশ সুরমার পা খামচাতে লাগল।

সুরমা বিব্রত হয়ে বলল—আহা করেন কি, সুড়সুড়ি লাগছে। উঠুন, উঠুন।

—না উঠব না, নরেশ আবেগের সঙ্গে বলল—হত্যে দেবো, হাঙ্গার স্ট্রাইক করব, হার্টফেল করে মরব। বল।

নরেশ হুমড়ি খেয়ে সুরমার পা জড়িয়ে ধরল।

সেই সংকট-মুহূর্তে ঘরে ঢুকল নমিতা ক্ষান্ত আর হারাণ ভটচাজ। ওরা গঙ্গাস্নান সেরে কপালে তিলক কেটেছিল। ওদের হাতে ভিজে কাপড় পাকানো।

ক্ষান্ত বিস্মিত হয়ে বলল—ও কি, সন্ন্যেসী মাটিতে হামা টানছে কেন?

নমিতা পলকেই স্বামীকে চিনতে পারল, বলল—ওমা, তুমি! সন্ন্যেসীবেশে তুমি ওখানে কি করছ?

নরেশ গম্ভীর হয়ে স্পষ্ট বলল—প্রেম নিবেদন করছি।

সুজিত অভিযোগ করল, একেবারে কাঙালের মতো পায়ে ধরে সাধাসাধি করছে, বৌদি!

নমিতা বিরক্ত হয়ে বলল—ঢঙ দেখে আর বাঁচি না! এ আবার কি নতুন খেলা?

সুজিত কাতর হয়ে বলল—খেলা নয় বৌদি! সত্যি? দাদা আবার বিয়ে করবার জন্যে পাগল।

নমিতা চোখ কপালে তুলে বলল—বল কি, ঠাকুরপো? শালীকে বিয়ে? ঠাট্টার একটা সীমা আছে।

নরেশ বলল—কে বললে শালী? কোন জন্মেও শালী নয়, আমি তোমার বাপের বাড়ি থেকে এই মাত্তর খবর নিয়ে আসছি, এদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই।

নমিতা কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল—তাই তুমি বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছ?

ক্ষান্ত দারুণ খুশী হয়ে বলল—ক্ষেপবে না? আমার টেঁপু কি যেমন-তেমন মেয়ে? তোমাব চেয়ে ওকে দেখতে অনেক ভাল।

তারপর সে হারাণকে বলল—কি গো, তোমায় বলিনি, টেঁপু ঠিক বশ করবে।

হারাণ সভয়ে বলল—এই মরেছে! শেষে দোজবরে? তালাক দেবার ঝঞ্ঝাট!

ক্ষান্ত ধমক দিল—দোজবর তো হয়েছে কি? একটা পাত্তর জোটাবার মুরোদ নেই, আবার নিজের মেয়ের বিয়েতে ভাংচি দেওয়া!

নরেশ সুরমাকে আবার প্রশ্ন করল—কি, চুপ করে রইলে যে? বল রমু, আমায় বিয়ে করবে কি না?

ক্ষান্ত ওপর-পড়া হয়ে বলল—ও আবার কি বলবে? অমন সোনারচাঁদ রোজগেরে জামাই! করবে—ও নিশ্চয় বিয়ে করবে। ওগো, যাও না, পাঁজিটা দেখ, কবে বিয়ের শুভদিন।

এবাব নমিতা বাগে ফেটে পড়ল। সে চীৎকার করে বলল—থামুন আপনারা। আমার ঘর জুড়ে বসেছেন। আবার বরটিকেও বেহাত করার মতলব। আপনারা পেয়েছেন কি? বিদেয় হোন, এক্ষণি বিদেয় হোন এখান থেকে।

ক্ষান্ত এবার নরেশকে বলল—দেখ বাবা দেখ। তোমার ঘর থেকে ও আমাদের বেরিয়ে যেতে বলছে। (নমিতাকে) ওরে মুখপুড়ি, তোকে যে এই ঘর থেকে বিদেয় হতে হবে। আমার টেঁপু যখন এই ঘরের ঘরণী হবে, তখন কি আর তোকে ঠাঁই দেবে? (হারাণকে) ও মুখপোড়া, হাঁ করে কথা গিলছ কি? যাও না, বিয়ের একটা উয্যুগ করো না।

হারাণ বিব্রত হয়ে বলল—এই মরেছে! দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের আবার উয্যুগ কি? নম-নম করে সারলেই হবে।

—এই যে সারাচ্ছি! নমিতা বলল—আপনার জন সেজে ঘর-ভাঙানো? আমি থাকতে ও কি না বিয়ে করবে একটা থ্যাবড়ানাকী, বেরালচোকি, গায়ে-ঢলানিকে?

সুরমা রেগে বলল—খুব যে গালমন্দ পাড়ছ? নিজে তো ভারী ডানা-কাটা পরী! ধুমসো, বেঢপ, বেয়াড়া। বরকে আটকাবার মুরোদ নেই, আবার তড়পানি। চোখ চেয়ে দেখ, তোমারই স্বামী আমার পায়ে ধরে সাধাসাধি করছে।

ক্ষান্ত গদগদ হয়ে বলল—করবেই তো। কত লোক আমার মেয়ের জন্যে পাগল! আমার টেঁপু কি যেমন-তেমন মেয়ে?

নমিতা ভেংচি কেটে বলল—আ-মরি-মরি! সাধাসাধি করছে! বার করছি সাধাসাধি! এবার সে নরেশকে হুকুম করল—ওঠ, ওঠ বলছি! নইলে তোমারই একদিন কি

আমারই একদিন।

সে নরেশের এক হাত ধরে টানাটানি করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

ক্ষান্ত চকিতে নরেশের আরেক হাত ধরে তাকে বসিয়ে রাখার চেষ্টা করে বলল—খবরদার উঠো না, খবরদার উঠো না।

নরেশ তারস্বরে বলল—বাপ রে বাপ! আমি কি টাগ্-অফ-ওয়ারের কাছি? তার চেয়ে আমাকে তোমরা দু-আধখানা করে কেটে ফেল। একটা ভাগ থাকুক নমুর কাছে, আরেকটা রমুর কাছে।

নমিতা ব্যঙ্গ করে বলল—আদর আর ধরে না! আমার চোখের সামনে তুমি ঐ হ্যাংলা, আদেখলে শুঁটকিটার পা চাটতে যাবে, আর আমি প্রাণ থাকতে তা দেখব? ওঠ, ওঠ বলছি—নইলে আমি এই চটি-পেটা করব।

এই বলে নমিতা পায়ের চটি খুলতে গেল। নরেশ তড়াক করে লাফিয়ে নাগালের বাইরে চলে গেল।

সুরমা বলল—আমি হ্যাংলা? আমি আদেখলে? বয়ে গেছে তোমার বরের দিকে নজর দিতে। ও-ই তো আমার পায়ে ধরে সাধাসাধি করছিল। আমি ওকে এঁটোকাঁটার মতো আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে চাই। জানো, আমায় পাবার জন্যে আরেকজন পাগল হয়েছে? বল সুজি, বল, তুমিও আমায় বিয়ে করতে চাচ্ছ?

সুজিত গদগদ হয়ে বলল—আমি এঁর পাণিপ্রার্থী।

সুরমা বলল—আবার বল, ঐ হিংসুটে মেয়েছেলেটাকে শুনিয়ে আবার বল। আপদটা এসে না পড়লে আমাদের রেজিস্ট্রি অফিসে এতক্ষণে বিয়ে হয়ে যেত।

হারাণ বলল—এই মরেছে! ছোকরা যে বেজাত!

সুজিত বিজ্ঞের মতো বলল— রেজিস্ট্রি বিয়ে। আমি হবো রেজিস্টার্ড স্বামী আর উনি রেজিস্টার্ড স্ত্রী। ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে আছে।

নরেশ যেন হতাশ হয়ে বলল—সুজিত, ভাই, তুমি ওকে বিয়ে করবে?

নমিতা জোর সমর্থন জানিয়ে বলল—আলবৎ। তোমার তাতে কি? যাও, কলঘর থেকে পোশাক বদলে এসো।

নমিতা ঠেলতে ঠেলতে স্বামীকে কলের ঘরে পুরে দিল।

সুজিত তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—পায়ের ধুলো দাও, বৌদি। সত্যি বলছি, তুমি বাঁচালে। তুমি না হলে নরেশদা আমার হবু পরিবারকে বেহাত করে ফেলেছিল আর কি!

ক্ষান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—ওরে ছোকরা, তুই আমাদের জাত মারবি? এ বিয়ে কক্‌খনো হবে না। আমি পুলিস ডাকব। ভালমানুষের মেয়ে পেয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে

নিয়ে যাচ্ছ ?

সুরমা বাধা দিয়ে বলল—মিথ্যে কথা। আমি সুজিকে ভালবাসি। বিয়েতে আমি স্বেচ্ছায় মত দিয়েছি। সুজি, তুমি এই সব আপদের হাত থেকে আমায় বাঁচাও।

—ভয় কি চিনি, সুজিত আশ্বাস দিল, বিয়েতে মত দেবার বয়স হয়েছে তোমার। কে আটকাবে আমাদের বিয়ে ?

নমিতা তাড়াতাড়ি বলল, নিশ্চ য়, টাকার জন্যে ভেবো না, ভাই। এই নাও পঞ্চাশ টাকা। বৌদির আশীর্বাদ।

নমিতা বাক্স খুলে টাকা বার করে দিল। সুজিত তুড়ি মেরে বলল—মার দিস কেল্লা ! নিখরচায় বিয়ে। ফারুকী হোটেলে আজ বিয়ের ভোজ দেবো। রাতে তোমার নেমন্তন্ন রইল বৌদি। চল চিনি।

সুরমা বলল—চল সুজি। নেমন্তন্নে এসো বৌদি।

ক্ষান্ত হতাশ হয়ে বলল—এ্যাঁ, শেষে আমার মেয়েও বিগড়ে গেল একটা বেজাতের ছোকরার সঙ্গে ! (হারাণকে) হাঁ করে দেখছ কি ? বাপ হয়ে শাসন করতে পারছ না ? মেয়ে শায়েস্তা করতে পারছ না ?

—ইস্ ! মারলেই হল ! সুরমা জবাব দিল, একবার দেখ না গায়ে হাত তুলে ? এখন আর সে যুগ আছে ? নালিশ ঠুকে জেলে পাঠাব। বাপ-মা বলে ছেড়ে কথা কইব না।

হারাণ অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে বলল—এই মরেছে ! আবার মারপিট কেন ? মুখ থাকতে হাতাহাতির দরকার কি ? বলি, বাবাজী, বিয়ে করার সাধ হয়েছে, কাজকম্ম করা হয় ?

—আজ্ঞে না। নিছক বেকার। চাকরির চেষ্টা করে গোড়ালি ক্ষয়ে গেছে, একটাও জোটাতে পারি নি।

—ব্যবসা ?

—মূলধন নেই—না টাকার—না জোচ্চুরির।

—তবে চলে কি করে ?

—ধার করে। বন্ধুবান্ধবের কাছে টাকাটা সিকিটা ধার করি, তাতেই চলে যায়। ধার করার দোষ নেই, বাবা। স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট পর্যন্ত ধার করে।

—বউকে পুষবে কি করে ?

—বউই আমায় পুষবে স্যার। একটু চেষ্টা করতেই আপিসে একটা কেরানীগিরি জুটিয়ে নিয়েছে আপনার মেয়ে।

—থাকবে কোথায় ?

—আমাব ঘরে। দাদা ট্রান্স্‌ফার হয়ে সুবিধে হয়েছে। দুজনে থাকতুম। এখন ঘাবে আমি—আর আপনার মেয়ে।

—ভালই হবে বাবাজী। আমরাও সে ঘরে উঠব।

সুরমা বাধা দিয়ে বলল—মাথা খাবাপ? ঐ একটি মোটে ছোট ঘর। আমাদের নতুন বিয়ে। সেখানে তোমরা কোথায় যাবে? তোমরা এখানেই থাক।

নমিতা শাসিয়ে বলল—থাকা বার করছি। বেরোও বলছি। বেরোও সব।

এদিকে বেশ বদলে গেরুয়া আলখাল্লা হাতে নরেশ কলঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

নমিতার কথা কানে যেতে সে বললে—আহা নমু, ওরা থাক। তবু তো রমুকে দু'দণ্ড দেখতে পাব।

—চোখ গেলে দেবো, নমিতা তর্জন করল, আমায় তেমন মেয়ে পাও নি। পরস্ত্রীর দিকে হ্যাংলার মতো ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ করে চেয়ে থাকবে, আর আমি প্রশ্রয় দেবো?

নমিতা ক্ষান্ত-গোষ্ঠীকে বলল—বিদেয় হও, এখনই সব বিদেয় হও।

গোলমাল শুনে পাঁচকড়ি তেরিযা হয়ে ঘরে ঢুকল। সে আস্ফালন করে বলল—তোমাদের এখানে মেছোহাটা বসেছে নাকি? চলবে না, এসব চলবে না। নালিশ করব, উচ্ছেদ করব।

হারাণ যেন অকূলে কূলের সন্ধান পেল। সে মিনতি করে বলল—এই যে পাঁচু। আমরা তোমার ঘরেই যাব ঠিক করেছি। শেষ পর্যন্ত তোমার ঘরেই আমাদের গতি।

পাঁচকড়ি যেন হাতে স্বর্গ পেল, সে গদগদ হয়ে বলল—সত্যি বাবাঠাকুর? কবে? কখন? আপনাদের জন্যে আমার দুয়োর খোলা আছে। আহা, কবে সে সৌভাগ্য হবে?

হারাণ ব্যস্ত হয়ে বলল—এখনই। ওগো, বাক্স-বিছানা সব এখনই তোলা যাক।

হারাণ নিজেই একটা বাক্স তুলল। পাঁচকড়ি ব্যগ্র হয়ে বলল—দিন, দিন, আমিই বয়ে নিয়ে যাই।

সে হারাণের কাছ থেকে বাক্স কেড়ে নিল।

সুজিত বলল—চল, বেলা বাড়ছে, আমরা এই বেলা যাই।

সুরমা ব্যস্ত হয়ে বলল—তাই চল, এ নরককুণ্ডে আর একদণ্ড নয়।

ওদের প্রস্থানোদ্যত দেখে পাঁচকড়ি সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, উনি কোথায় যাচ্ছেন?

সুজিত গর্বের সঙ্গে বলল—আমায় বিয়ে করতে রেজিস্ট্রি আপিসে।

পাঁচকড়ি বাক্সটা দড়াম করে ফেলে দিয়ে চিৎকার করল—শেষে এই ষড়যন্ত্র! বেজাতের ছেলের সঙ্গে বিয়ে! আমি ম্যানেজার থাকতে এই বাড়িতে ওসব বেলেল্লাপনা হতে দেবো না। দেখ সুজিত, তোমার নামে নালিশ করব, উচ্ছেদ করাব।

—পারলে তো? হুঁ হুঁ বাবা. এখন ভাড়াটেদের রাজ্য! সুজিত বিদ্রূপ করে সুরমার হাত ধরে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ক্ষান্ত বিব্রত হয়ে বলল—ওকে আমি ত্যাজ্যকন্যে করছি পাঁচু। তুমি দুঃখ করো না। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার একটা টুকটুকে বউ এনে দেবো। এখন আমরা তোমার ঘরে গিয়েই উঠি।

ক্ষান্ত বাক্সটা তুলল। পাঁচকড়ি ব্যঙ্গ করে বলল—থাক, আর আবদারে কাজ নেই। আমার ঘরটা পিঁজরাপোল নয় যে দুই বুড়োবুড়িকে নিয়ে পুরব। আমার ঘরে পা দিয়েছেন কি ঠ্যাং খোঁড়া করেছি। মেয়েমানুষ বলে পাঁচকড়ি ঘোষাল ভয় করে না। যাই বাবা, ঘর সামলাই। আবার যদি আমার ঘরে হামলা করে!

সে সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। ক্ষান্ত হতাশ হয়ে বাক্স নামিয়ে মেঝেয় বসে পড়ল। তার মুখ চিন্তাকুল।

হারাণ অবসন্ন হয়ে বলল—আমি তখনই বলেছিলুম, কাজ নেই পরের বাড়ি গিয়ে।

ক্ষান্ত মুখঝামটা দিল, নিজের ক'টা বাড়ি আছে শুনি? পরের বাড়ি এসে না উঠলে এ ক'টা দিন কাটত কি করে?

নমিতা ঝংকার দিয়ে বলল—ঢের হয়েছে। এবার মালপত্তর নিয়ে পথ দেখুন।

হারাণ বলল—তাই যাই মা। কিন্তু কোথায় যাই?

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। ক্ষান্ত এতক্ষণ কি মতলব ভাঁজছিল। হঠাৎ সে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বলল—ঠিক হয়েছে। মাথায় একটা মতলব এসেছে।

—গিন্নী, আবার মতলব? হারাণ বিব্রত হয়ে বলল—ভাগ্যি ভাল যে এরা পুলিসে ধরিয়ে দেয় নি। এবারের মতলবে তো নির্ঘাৎ শ্রীঘর।

ক্ষান্ত বলল—তুমি থাম, এবার যা মতলব, একদম রাজভবন পর্যন্ত। দেখ না।

সে নরেশকে বলল—দেখি বাছা তোমার গেরুয়া আলখাল্লাটা।

এই বলে সে নরেশের হাত থেকে চট করে আলখাল্লা ছিনিয়ে নিয়ে কলঘরে ঢুকে গেল।

হারাণ বলল—জানি না, এবার অদৃষ্টে কি আছে!

সে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে তুলতে লাগল।

নরেশ আর নমিতা কলঘরের দরজার দিকে চেয়ে রইল। একটু পরে চুল এলো করে গেরুয়া আলখাল্লা পরে সন্ন্যাসিনী বেশে ঘরে ঢুকল ক্ষান্তমণি।

সে নরেশকে বলল—বাবা নরেশ, একটা কথা রাখবে বাবা?

নরেশ সাগ্রহে বলল—ঘরের ভেকেন্ট পজেশন দেন তো যা বলবেন তাই করতে

রাজী আছি।

ক্ষান্ত বলল—আমি এখানে জাঁকিয়ে বসছি। তোমার বন্ধু মহলে এখনই খবর দাও বাবা, সন্ন্যাসিনী ত্রিকালদর্শিনী মাতা কুণ্ডলিনী দেবীর শুভ আবির্ভাব হয়েছে। একটু শেষবারের মতো মা মা বলে আমায় ডেকো, বাবা। তারপর যা হয় আমি সামলে নিচ্ছি।

ক্ষান্ত গম্ভীরভাবে খাটে বসে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে সাধনার ভান করল। নরেশ দণ্ডবৎ হয়ে বলল—পেন্নাম হই মা-ঠাকরুণ।

নমিতা বিরক্ত হয়ে বলল—যা ভাল বোঝ করো। আমি এসব জোচ্চুরির মধ্যে নেই। দেখি, দুজনের রান্নার ব্যবস্থা করি।

সে রন্ধনশালায় প্রস্থান করল। নরেশ উঠে উচৈস্বরে চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল, ও সতীশ, ও হরিবাবু,—ও মশায় শুনছেন?

হারাণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষান্ত তাকে হুকুম করল—নাও, বসো।

হারাণ খাটের ওপর বসতে গেল। ক্ষান্ত ধমক দিল—খাটে নয়, মাটিতে পায়ের কাছে বসো।

হারাণ বসল।

—গলায় কাপড় দাও।

হারাণ হুকুম তামিল করল।

ক্ষান্ত বলল—সংস্কৃত মন্ত্র-তন্ত্র যা জানো, জোরে জোরে আওড়াও।

হারাণ সুর করে বলতে লাগল, বিদ্বত্তঞ্চ নৃপতঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।

এর মধ্যে প্রতিবেশীদের নিয়ে নরেশ ঘরে ফিরে এলো। সে পরিচয় করিয়ে দিল, ইনিই সহস্রশ্রী ত্রিকালদর্শিনী মাতা কুণ্ডলিনী দেবী।

জনৈক প্রতিবেশী বলল—আরে এ যে মাসীমা!

ক্ষান্ত গম্ভীর হয়ে বলল—মাসীমাতার ছদ্মরূপ ধরে বাবাজীকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। তোর সিদ্ধি লাভ হয়েছে, বেটা। কালই কারবারে মোটা মুনাফা লুটবি।

নরেশ গদগদ হয়ে বলল—মা, মা, আপনার দয়ায় পরম শান্তি ফিরে পেয়েছি মা, আমার সব আপদ কেটে গেছে, কারবারে নির্ঘাৎ লাভ। এবার নিদেন আমায় একটা সরকারী কনট্রাক্ট পাইয়ে দিন মা। মা—মা—মা—

—ছি বেটা, ছোট নজর! ক্ষান্ত আশ্বাস দিয়ে বলল—সরকারী কনট্রাক্ট কেন বাবা, তোকে একেবারে উপমন্ত্রী বানিয়ে দিচ্ছি, দু'দিনে ফুলে ফেঁপে উঠবি। মা বেটীকে জানান দিয়েছি। বোম্ কালী, বোম্, বোম্ বোম্ বোম্।

একজন প্রতিবেশী বলল—নরেশবাবু আপনি একাই মাকে মনোপলি করে

রাখবেন? এবার আমরা চান্স নিই।

এবার প্রতিবেশীরা যে যার দুঃখ জানাতে ব্যস্ত হল। একজন বলল—ছেলেটা পর হয়ে যাচ্ছে, মা। অপর জন জানাল, বড়সায়েব বড় রেগে আছে, মা। তৃতীয় ব্যক্তি বলল—ইনকাম ট্যাক্স বড় পিছনে লেগেছে, মা।

সকলে ধড়াস করে পড়ে দণ্ডবৎ হয়ে বলল—আমাকে বাঁচান মা।

ক্ষান্ত ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলল—এখন আর সময় নেই, বাবাসকল। নেপাল থেকে আদ্যাশক্তি মহামায়া আহ্বান দিয়েছে। আদেশ হয়েছে সেখান থেকে জগজ্জয়ে যেতে হবে। সোজা রাশিয়ায়। ওরা পাষণ্ড হয়েছে, বাবাসকল। মা বেটীর হুকুম আগে ওদের উদ্ধার করতে হবে। আজই আমরা রওনা হচ্ছি। বোম্ কালী, বোম্, বোম্, বোম্—

প্রতিবেশীরা বলল—তা হয় না, এই দুঃখী অধমদের উদ্ধার না করে আপনি বিদেশ যেতে পারবেন না মা। আগে আমাদের ঘরে ঘরে পায়ের ধূলো দিন। কিছুদিন সেবা করবার সুযোগ দিন।

—তা কি পারবে বাছারা? ঘরে কি আর রাখতে পারবে? ক্ষান্ত প্রশ্ন করল। কত ভক্তরা আসবে, মায়ের নাম সংকীর্তন হবে, পেসাদ পড়বে। অনেক খরচ পড়বে যে বাবাসকল।

ওরা সবাই সাগ্রহে বলল—চাঁদা দেবো, চাঁদা তুলব, নগর সংকীর্তন বার করব। প্রেস কনফারেন্স বসাব, কাগজে কাগজে ছবি ছাপাব। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী কুণ্ডলিনী মাতার নাম তামাম দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবো।

ক্ষান্ত আশীর্বাদ করে বলল—বাবাজীবনরা, তোমরাই আসল ভক্ত, তোমরাই পারবে বাবা। মা বেটীকে জানিয়েছি, বেটী আদেশ দিয়েছেন আগে এই অধম দেশকে উদ্ধার করি। বোম্ কালী—বোম্—বোম্—বোম্—বোম্।

প্রতিবেশীরা উল্লসিত হয়ে হাঁক পাড়ল, মার দিস কেল্লা! জয় কুণ্ডলিনী মায়িকী জয়! চলুন আমাদের এক এক জনের ঘরে।

ওরা আগ্রহের সঙ্গে বাক্স বিছানা তুলতে লাগল। হারাণ ব্যাকুল হয়ে বলল—আমায় একটা মাথা গোঁজবার জায়গা দিস বাপধনেরা। আমি ওঁর ভৈরব।

ক্ষান্ত আশ্বাস দিয়ে বলল, নিশ্চয়, পুরুষ ছাড়া কি প্রকৃতি থাকতে পারে! চল! সবাই চল।

ওরা মালপত্তর নিয়ে 'জয় কুণ্ডলিনী মায়িকী জয়' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। হারাণও ওদের সঙ্গী। সবার পিছনে সন্ন্যাসিনীরূপিণী ক্ষান্ত দরজা অবধি এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ কি মনে পড়ায় ফিরে দাঁড়াল। সে চুপি চুপি নরেশকে বলল—বাবা, আমার বোতল, গোবরজলের বোতল?

নরেশ চট করে খুঁজে সেটা ক্ষান্তর হাতে দিল। ক্ষান্ত সেটাকে তৎক্ষণাৎ আলখাল্লার মধ্যে পুরে ফেলল।

নরেশ এবার আন্তরিকভাবে বলল—সত্যি গুরুমা। যাবার আগে আপনাকে আর একবার পেন্নাম করি। সত্যি, তুমিই তোমার মাত্র তুলনা কেবল!

ক্ষান্ত গোবরজলের বোতল খুলে ছিটে দিতে দিতে বলল—শুদ্দি, শুদ্দি, শুদ্দি, কল্যাণ হোক। ক্ষান্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রস্থান করল।

নরেশ যেন এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। খালি ঘরের দিকে সে একবার গভীর ভাবে দেখল। তারপর ছুটে রান্নাঘরের দ্বারের কাছে গিয়ে ডাকল নমিতা—নমু—আমার রাণী—

নমিতা গোমড়ামুখ করে ঘরে ঢুকল।

নরেশ বলল—এত দিনে ঘর আর ঘরণীর ভেকেণ্ট পজিশন পেলুম।

নমিতা বলল—যাও। কি মিথ্যে কথাই বলতে পারো! আচ্ছা, তুমি সত্যিই ঐ আদেখ্‌লে গায়ে-ঢলানে মেয়েটাকে ভালবেসেছ?

নরেশ তাড়াতাড়ি বলল—ওসব কথা থাক। চল ফারুকী হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে দুজনে ম্যাটিনী শোতে মুনশাইনে সেই ফিল্মটা দেখে আসি।

নরেশ নমিতার কোমর জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।